তিন মহাকাব্যের তিন মহামানবী

হেলেন সীতা দ্রৌপদী

শেখর সেনগুপ্ত

তিন মহাকাব্যের তিন মহামানবী

হেলেন সীতা দ্রৌপদী

শেখর সেনগুপ্ত

মডার্ন কলাম
মডার্ন কলাম
১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

TIN MAHAKABYER TIN MAHANABI

HELEN SITA DRUPADI

By *Sekhar Sengupta*

প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৪১৮। জানুয়ারি ২০১৩।
প্রকাশিকা : লতিকা সাহা। মডার্ন কলাম। ১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৯
বর্ণ সংস্থাপন : অক্ষর লেজার। ২, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা-৬
মুদ্রাকর : স্পেকট্রাম অফ্‌সেট। ৫বি, কুণ্ডু লেন, কলকাতা-৩৭
প্রচ্ছদ : গৌতম বসাক।

একশো তিরিশ টাকা মাত্র

দীপ্তি সেনগুপ্ত

সুচরিতাসু

আমাদের প্রকাশনায় এই লেখকের অন্যান্য বই

দেশ ও দশের গল্প

একই বৃত্তে ক'জন

এই আমি মাতাহারি

মুখবন্ধ

এই গ্রন্থ রচনার প্রেরণা লাভ অবশ্যই আমার সুহৃদ সহদেব সাহার কাছ থেকে। আবার সহদেবই গ্রন্থটির প্রকাশক।

তবে নারীশক্তি নিয়ে আমার মধ্যে মন্থন চলছিল কয়েক বছর ধরেই। উৎস তথা প্রাবল্য সৃষ্টির পশ্চাতে সক্রিয় তিনটি ঘটনা। প্রথমত, আমি যেন অনিবার্যভাবেই লেক কালীবাড়ির কর্ণধার নিতাই চন্দ্র বসুর সংস্পর্শে আমি এবং তিনিই আমাকে নিয়ে যান দক্ষিণ কলকাতার লেক কালীমন্দিরে—যেখানে গিয়ে আমি ক্রমশই এক পরিবর্তিত মানুষ হয়ে উঠি। মাতৃতত্ত্বের মধ্যে ডুব দিয়ে এই দেশের ও বিদেশের পুরাণাদি, মহাকাব্য ইত্যাদির কয়েকটি নারী চরিত্রকে যেন তুলে আনতে চাই স্বকীয় চর্চার বিষয়রূপে।

দ্বিতীয়ত, উক্ত কালচক্রে অবস্থানকালেই আমি ও শ্রীযুক্ত নিতাইচন্দ্র বসু যুগ্মভাবে রচনা করি লেক কালীমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা পরম অধিপুরুষ শ্রী শ্রী হরিপদ চক্রবর্তীর আশ্চর্য [কিন্তু এ যাবৎ অপরিজ্ঞাত] জীবনী—যে বৃহৎ গ্রন্থটিও বিপুল অভিনন্দনের সঙ্গে প্রকাশিত।

তৃতীয়ত, পুরাণ মহাকাব্য ও ইতিহাসের মহানায়িকাদের নিয়ে চর্চা করতে করতে আবিষ্ট হই রাসমণির প্রতি। ব্রতী হতে হয় জানবাজার থেকে দক্ষিণেশ্বর অবধি একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনায়—সেটিও আত্মপ্রকাশ করেছে অতি সম্প্রতি।

এই তিনের সাহায্যে যখন আমার ছেঁড়া ফাটা লেখক জীবনটাকে একটা পোক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করাবার কথা ভাবছি বা হামাগুড়ি দিয়ে এগুতে চাইছি, সহদেব সাহা এলেন। মোটামুটি তিরিশ বছরের অদর্শনের পর পুনরায় মিলন। সহদেবেরই প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে এই গ্রন্থরচনার প্রয়াস। এখানেও সেই আদ্যাশক্তি—যার স্ফূরণ তিনটি রমনী চরিত্রের মধ্যে দিয়ে। সীতা, দ্রৌপদী এবং হেলেন। প্রথম দু'জন ভারতীয়, তৃতীয়জনকে পাই গ্রীসের মহাকাব্যে। তিন মহাকাব্যিক মহিয়সী। ঘটনার সর্পিল অগ্রগতির মধ্যে তিনজনের ভূমিকায় বিলক্ষণ সাদৃশ্য। বৈসাদৃশ্যও প্রচুর। কিন্তু ভাগ্য দৈব তথা গ্রীক সাহিত্যের নেমেসিস তাঁদের তিনজনকে চালিত করেছে। ঘটনানিচয় আবর্তিত হয়েছে তাঁদের তিনজনকে কেন্দ্র করে। আবর্তনের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়েছে তিন রমনীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি।

ঘটনা যে দিক থেকে যা-ই ঘটুক, আমার অনুভবে তা আদ্যাশক্তিরই বিকাশ। ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ এই আদ্যাশক্তি সম্পর্কে কী ভাবতেন, কথামৃত গ্রন্থে তার ব্যাখ্যা রয়েছে ঃ

'যিনি ব্রহ্ম তিনিই কালী (মা আদ্যাশক্তি)। যখন নিষ্ক্রিয় তখন ব্রহ্ম বলে কই। যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় এই সব কাজ করেন তাকে শক্তি ব'লে কই। স্থির জলে

ব্রহ্মের উপমা। জল হেল্‌চে দুল্‌চে শক্তি বা কালীর উপমা। কালী! কি না—যিনি মহাকালের [ব্রহ্মের] সহিত রমণ করেন।

কালী 'সাকার আকার নিরাকার'। তোমাদের যদি নিরাকার বলে বিশ্বাস কালীকে সেই রূপে চিন্তা ক'রবে। একটা দৃঢ় করে চিন্তা করলে তিনিই জানিয়ে দেবেন, তিনি কেমন। শ্যামপুকুরে পৌঁছিলে তেলীপাড়াও জানতে পারবে। যখন জানতে পারবে যে, তিনি শুধু আছেন (অস্তিমাত্রম্) তা নয়। তিনি তোমার কাছে এসে কথা কবেন—আমি যেমন তোমার সঙ্গে কথা কচ্ছি। বিশ্বাস করো সব হ'য়ে যাবে। আর একটি কথা, তোমার নিরাকার বলে যদি বিশ্বাস, দৃঢ় করে তাই বিশ্বাস করো। কিন্তু মাতুয়া বুদ্ধি (Dogmatism) কোরো না। তাঁর সম্বন্ধে এমন কথা জোর করে বলো না যে তিনি এই হ'তে পারেন। আর এই হ'তে পারেন না। ব'লো আমার বিশ্বাস তিনি নিরাকার, আর কত কি হতে পারেন তিনি জানেন। আমি জানি না। বুঝতে পারি না। মানুষের এক ছটাক বুদ্ধিতে ঈশ্বরের স্বরূপ কি বোঝা যায়? এক সের ঘটিতে কি চার সের দুধ ধরে? তিনি যদি কৃপা ক'রে কখনও দর্শন দেন, আর বুঝিয়ে দেন, তবে বুঝা যায়, নচেৎ নয়।

যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি, তিনিই মা।'

যে কোনও নারী চরিত্রকে বিশ্লেষণ করতে গেলে আদ্যাশক্তিরই আশ্রয় নেওয়া উচিত বলে মনে করি। ভোগ বা লালসাপূর্তির উপকরণরূপে যে জাতি নারীদের কথা ভেবেছে, সেই জতির অবক্ষয় ও সর্বনাশ কে আটকাতে পারে?

যৌনতা অবশ্যই থাকবে। কিন্তু তা যেন কখনও প্রেম ও শ্রদ্ধাকে দূরে সরিয়ে না দেয়। যারা পুরুষের উৎপত্তির কারণ, কোনও পুরুষ কী পারে তাকে অমর্যাদা করতে? যে করবে, তাঁর বিনাশ অনিবার্য। জলভরা চোখে অগ্নিরস্ফুলিঙ্গও থাকে।

সীতা দ্রৌপদী হেলেনকে নিয়ে লেখার আগে ইতিহাস ও পুরাণের বহুধা অন্দরমহলে বাইট নিতে হয়েছে স্ত্রী শক্তির ব্যপ্তিকে তলিয়ে দেখতে। এত বৈচিত্র্য যে কহতব্য নয়। প্রতিটি খিলান শক্ত-পোক্ত কড়ি-বরগায় গঠিত। বিপরীতমুখী অভিঘাতে চৌচির হবার নয়। কখনও বিষয় এত কঠিন ও কষা যে পরিশ্রান্ত মনে হয় নিজেকে। তবে তা ক্ষণিকের। উৎসাহ জোগান আদ্যাশক্তিই।

রমণীশক্তির বিবিধ রূপের সন্ধান করতে করতে পৌঁছে গিয়েছিলাম পূর্বভারতের সমুদ্র উপকূলে—যেখানে আমি ছুঁয়ে যাই সমুদ্রদেবী ওরুসন্দিয়মাকে। বহু মৎস্যজীবী পূজো করেন এই সমুদ্রদেবীকে। ঘুরে ফিরে লতিয়ে লতিয়ে সেই বিশ্বাস আজও অটুট। তেলচিটে রঙ ফিকে নিবাসে বসবাসকারী এক ওড়িয়া জেলে আমাকে বলেছিলেন, সমুদ্রদেবী ওরুসন্দিয়মা আসলে মা সীতা। তিনি ভূগর্ভে অবস্থান করেও আমাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হতে দিচ্ছেন না। সমুদ্র যখন রুক্ষ মেজাজে, তখনও যে আমরা মাঝ সাগরে বিসর্জিত হই না, তার পিছনে রয়েছে ওই দেবীর করুণা। নয় শত নিরানব্বুইটি নদীর জল এসে পড়েছে সমুদ্রে। জেলেরা ওই মহাশক্তিকে তুষ্ট করবার জন্য সমুদ্রে তেল ও ঘি ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। ঢালে দুধ, চিনি ও কারণ।

সীতা, দ্রৌপদী, হেলেন—এই তিন রমণী চরিত্রের মধ্যে সীতার ওপর নানাভাবে যে দেবত্বকে আরোপ করা হয়েছে, অন্য দুই নারীর ক্ষেত্রে আমরা তা দেখি না। হেলেনের বেলায় তো নয়-ই। কিন্তু অন্যবিধ গুরুত্বে-বৈচিত্র্যে তাঁরা এতটাই অনন্যা যে তাঁদের সম্পর্কে লেখার জন্য কলমের আশ্রয় নিতে গেলেই যেন আস্তাবল থেকে সবচেয়ে তেজি ঘোড়াটা বেরিয়ে আনতে চায়।

কিন্তু দ্রৌপদীর আখ্যানে যতই সমারোহ থাক, সেখানে কিন্তু জটিলতার বিলক্ষণ বুনোট। কিছু বোধ ও ধারণা যেন সিস-পেনসিলে লেখা প্রায় অস্পষ্ট। মনের মধ্যে যে আভাসিত ভাবনা ও যুক্তি, তাকে সাহসিকতার সঙ্গে প্রকাশিত করতে হয়।

তুলনায় হেলেন খুব স্পষ্ট—যে স্পষ্টতাকে আধুনিকতার শর্ত বলা চলে। সীতা ও দ্রৌপদীর চৌহদ্দিতে হেলেনকে আনা হল কেন?

এ প্রশ্নের উত্তর সম্ভবত একটাই—সীতা ও দ্রৌপদীর ন্যায় হেলেনও এক মদগর্বী অপরাধপ্রবণ পুরুষপ্রাধান্যকে চূর্ণ করবার পশ্চাতে চালিকাশক্তির ভূমিকা পালন করেছেন।

সীতার নিষ্ঠা, কষ্টসহিষ্ণুতা, স্বামীর প্রতি অনুরাগ, সন্তানের প্রতি মমত্ব তাঁকে যেমন সহজেই দেবীর আসনে প্রতিষ্ঠা দেয়, দ্রৌপদী ও হেলেনের বেলায় তদ্রূপ চেতনা আসে না। কারণ শান্তি পর্ব ও মুষলপর্বের মাঝে তাঁদের যে ভূমিকাই থাক, আমাদের চিরায়ত মূল্যবোধের নিরিখে তা কদাপি আহামরি গোছের নয়।

দ্রৌপদী ও হেলেনকে নিয়ে একজন শৌখিন ফুলবাবু যা ভাবতে পারেন, সীতা সম্পর্কে তাঁর ভাবনা সেই পথে যাবার অবকাশ পায় না। সীতার জীবনেও যে খাপছাড়া ভ্রান্তি ও জটিল সন্দেহ আসেনি, এ কথা বলা যাবে না। বনবাসকালে তিনি একজন সাধারণ আত্মসচেতন রমণীর ন্যায়ও আচরণ করেছেন। লক্ষণের প্রতি তাঁর যে অমূলক ও অন্যায় সন্দেহ, একজন পেশাদারি বিশ্লেষক তা অনুধাবন করে নিশ্চয় এক নাগাড়ে সীতার স্তুতিতে ব্রতী হতে পারেন না। হয়তো ভক্তের মনোবাঞ্ছা এখানে পূর্ণ হয় না। মহাকাব্যের ধর্মীয় মহিমা যতই জবরদস্ত হোক না কেন, মহাকবি বাল্মীকি মানবমনের জাঁতাকলে পিষ্ট সীতাকে বাস্তবের পটভূমিতেই এনে দাঁড় করিয়েছেন। তথাপি সীতার দেবীপ্রতিম মহিমা সুউচ্চে স্থাপিত।

নারীর প্রভাব ও শক্তিকে অন্বেষণ করতে গেলে অনেক দূর পিছিয়ে যেতে হবে। মহাকাব্যের যুগকে পিছনে ফেলে প্রবেশ বৈদিক যুগে। সেখানে দেবী ইলার দেখা মেলে। তিনি ঋগ্বেদের দেবী। ইল শব্দটিই হচ্ছে দেবত্বের আধার। আবার ভারতবর্ষের বৈদিক নাম ইলাবর্ত। অর্থাৎ দেবস্থান। এই দেবস্থানে প্রথমে দেবীদেরই প্রাধান্য। ইলার পুত্র যে অগ্নি, ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের ২৯ নং সুক্তে তার উল্লেখ পাই। ইলাকে পরে করা হয়েছে সরস্বতী। এখন ইলা যদি অগ্নির মাতা হন, তা হলে কার সঙ্গে ইলার রমণের ফলে অগ্নির জন্ম? তিনি হলেন দেবতা বরুণ।

অর্থাৎ আদিতে দেবীর প্রাধান্য নিরঙ্কুশ থাকলেও আদ্যাশক্তিকে পূর্ণতা দেবার জন্য দরকার ছিল পুরুষশক্তিরও।

পুরাণে কিন্তু ক্রমশ পুরুষের প্রাধান্য আমরা প্রতিষ্ঠিত হতে দেখি। সেখানে ইলা কোনও দেবী নন ; তিনি মনুর জ্যেষ্ঠপুত্র। পুরুষ হলেও ক্রমে তিনি স্ত্রীশক্তিতে রূপান্তরিত হন। এটা খুব বড় তাৎপর্যের বিষয়। পুরুষের মধ্যে যে আসলে একটি রমণীই বাস করে, এটা কী তারই ইঙ্গিত ?

অথবা পুরুষ ও রমণীর রয়েছে পরস্পরের প্রতি সাংঘাতিক আকর্ষণ। সেই আকর্ষণের প্রাবল্যে যদি ন্যায়-নীতি সৃষ্টি-স্থিতি টালমাটাল হয়ে পড়ে, সেটাই হবে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া।

সীতাকে অঙ্কশায়িনী করবার বাসনা ও প্রয়াস রাবণের মধ্যে প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল বলে লঙ্কা ধ্বংস হয়।

হেলেন স্বয়ং আকৃষ্ট হন যুবরাজ প্যারিসের প্রতি। প্যারিস তাঁকে অপহরণ করে নিয়ে যান বা স্বয়ং হেলেনই প্যারিসের সঙ্গে পলায়ন করেন। ফলত একটি অবৈধ সম্পর্ক পরিপুষ্টি লাভ করে—যার অনিবার্য পরিণতি ট্রয়ের ধ্বংসে।

অন্যদিকে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের চেষ্টা করা হয়েছিল বলেই যে কৌরবরা ধ্বংস হয়েছিল এরকম সিদ্ধান্তকে অক্লেশে স্বীকৃতি দেওয়া যায় না। দ্রৌপদীকে স্ত্রীরূপে লাভ করতে না পারায় দুর্যোধনের যে গ্লানি, তা হৃদয়ঙ্গমে অপারগ নই। আবার এক রমণী কীভাবে পঞ্চ স্বামীর রমণ চরিতার্থতা অপূর্ব রাখেন না—এরকম স্থূল ভাবনাও গিঁটে গিঁটে কৌতূহলকে বিস্তারিত করে।

মৈত্রেয় ঋষি অবশ্য বার বার ধৃতরাষ্ট্রকে হুশিয়ার করে দিয়েছিলেন, তোমার পুত্ররা মহা ভুল করেছে প্রকাশ্য রাজসভায় পাঞ্চালির কেশাকর্ষণে ও তাঁকে বিবস্ত্র করবার চেষ্টায়। ওই ঘটনায় সবচেয়ে ক্ষিপ্ত হয়েছেন ভীম। কারণ পঞ্চস্বামীর মধ্যে ভীমই ছিলেন দ্রৌপদীর প্রতি সর্বাধিক দায়বদ্ধ। সুতরাং ক্ষিপ্ত ভীমই যদি শেষাবধি দুর্যোধন ও দুঃশাসনকে চরম শাস্তি দেন, আমি বিস্মিত হব না।

মহাকাব্য পুরাণ ও সাহিত্যের কাঠামোকে আশ্রয় করে আদ্যাশক্তির এই ত্রিবিধ প্রকাশকে উন্মোচন করবার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে এই পরিণত বয়সে। বৃত্তটিকে ক্রমোত্তর আকর্ষণীয় রাখাটাও বৃহৎ কর্ম। একক অনুভূতিকে তীক্ষ্ণ রেখে পরিণতির পথে অগ্রগতি তথা পাঠকের কৌতুহল অথবা আগ্রহকে উদ্দীপন জোগানো—কঠিন কর্ম নিঃসন্দেহে।

পুত্র সৈকত সেনগুপ্ত নানাভাবে সাহায্য করেছে। তাকে ও বন্ধু সহদেব সাহাকে প্রথাসিদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ছোট করতে চাই না।

পাঠক যদি ঐশ্বর্যরূপে এ লেখাকে গ্রহণ করেন, আমার প্রাপ্তি হবে অমেয়।

শঙ্খ ঘোষ

কলকাতা
০১.০১.২০১২

তিন কন্যার আবির্ভাব

সৃষ্টির সর্বান্তঃকরণ মহিমার নিহিত তাৎপর্য নিয়ে সীতার জন্ম। জন্মলগ্নেই মনে হয়, তিনি মৃত্তিকার কর্ত্রী হয়েও করুণা-বঞ্চিত। নচেৎ কর্ষণ করতে গিয়ে লাঙলের ফলায় কেন প্রথম আবিষ্কৃত হবে একটি শিশু? সে কী পরিত্যক্তা? আমাদের এই সময়ে এটা কোনও ব্যতিক্রমী ঘটনারূপে চিহ্নিত হত না নিশ্চয়। মাঠে, ঝোঁপের মধ্যে, ডাস্টবিনে ক্ষণজন্মা মানবশিশু প্রায়শ আবিষ্কৃত হয়। সঙ্গে সঙ্গে নর-নারীর মিলনজনিত সৃষ্টিতত্ত্বের গোড়ার কথায় পৌঁছে যায় মন। নিরঙ্কুশ সত্য ও বাস্তবকে ঢেকে রাখে যে সামাজিক মহিমা, সেটাই প্রাধান্য পেতে পেতে কলঙ্কের জঞ্জালে নিক্ষেপ করে ওই শিশুকে। মহামুনি বিশ্বামিত্র দেবরাজপ্রেরিত অপ্সরার যৌবন ও যৌনতার গভীরে সংগোপনে তলিয়ে গিয়েছিলেন নিজের আশু কর্তব্য ভুলে গিয়ে। ফলে শকুন্তলার জন্ম। অবৈধ সন্তান। অতয়েব, পরিত্যক্তা। শুরু হয়ে গিয়েছিল এক দুঃখিনীর জীবন।

কিন্তু সীতা কাদের সন্তান? এক হাতে তো তালি বাজানো যাবে না। কোথায় সেই দুটি হাত?

নীরবতা হিমেল। কবি বাল্মিকীও একরকম নিরুত্তর। কারণ, এখানে যে তূরী ভেরী কাড়া নাকাড়া বাজিয়ে ঐশী শক্তিকেই প্রাধান্য দিতে হবে! দায়বদ্ধতার বোধ ক্রমশ প্রকাণ্ড ব্যাপ্তি পায় কবির হৃদয়েও।

সীতা কে?

উত্তর একটাই আসে—তিনি রামের পত্নী।

রাম কে?

তিনি বিষ্ণুর অবতার। হিন্দু ট্রাডিশনে তাঁর স্থান মন্দিরে। তিনি অলৌকিক। তিনি পূজ্য। তাই সীতাও দেবী। পূজ্যা। স্বামীর প্রতি ভক্তি ও বহুবিধ গুণের অধিকারিনী সীতা সামগ্রিকভাবে হিন্দু রমণীদের নিকট আদর্শস্থানীয়া। তিনিও অবতার। মা লক্ষ্মীর অবতার। রামের সঙ্গে তাঁর বিবাহ অতীব পূত ঘটনা—যাকে সাড়ম্বরে বলা হয় 'বিবাহ পঞ্চমী'।

শিশু সীতা আবিষ্কৃত হয়েছিল যে রাজ্যে, তার নাম জনকপুর। মানচিত্র হাতিয়ে দেখতে পাচ্ছি, জনকপুর নেপালের একটি অংশ। অর্থাৎ সীতা আসলে

নেপালের কন্যা। জনকপুরের রাজা জনক। সেই যুগের রীতি অনুসারে তিনি স্বয়ং কৃষিকর্মে ব্রতী হতেন। প্রকৃতির ইতিবাচক ইঙ্গিত পেলে লাঙল কাঁধে স্বয়ং চলে যেতেন ভূমিকর্ষণে।

ঘন মেঘের অনুপস্থিতিতে কিছুকাল মানুষ খানিক সন্ত্রস্ত হয়েছিল। সূর্যের তেজ কিছুতেই ম্রিয়মান হতে চায় না। অশ্বত্থ গাছের ছায়াতেও স্বস্তি নেই। রাজপুরোহিত কিন্তু বিশদে বলে গেছেন, বৃষ্টি আসছে সৃষ্টিসুখে ভাসতে ভাসতে। আপনি কর্ষণের জন্য প্রস্তুত থাকুন।

প্রস্তুত হয়েই আছেন রাজা জনক। আকাশের দিকে চেয়ে আছেন। তিনদিকে গিরিশৃঙ্গ। ক্রমে তাঁর পর্যবেক্ষণী দৃষ্টি উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে। তিনি অনুভব করলেন প্রকৃতির অন্তর্ভেদী দৃষ্টি—যাতে প্রতিভাত হচ্ছে জীবজগতের চাহিদা। অদ্ভুত একটা সাদা রঙের ছটা নীলাকাশকে এফোঁড় ওফোঁড় করে ঘনীভূত হতে থাকে। দ্রুত তার রঙও বদলায়। শ্বেতবর্ণ রূপান্তরিত হয় ঘোর কৃষ্ণবর্ণে। সোল্লাসে ধেয়ে আসে বাতাস। ঘন ঘন মেঘগর্জন। নানা প্রান্তে চিকুরহানা। তৎপরে অবিশ্রান্ত ধারাপাত।

রাজা কৃষিকর্মের টানে ঈষৎ অস্থির। এটা তাঁর কাছে অন্নসংস্থানের উপায় নয়, কিন্তু ধর্মসঙ্কট থেকে মুক্তি পাবার একটা পথ নিশ্চয়। এমনিতে রাজা জনকের আবেগ কম, তাই দৃঢ়তা বেশি। দৃঢ়তা অধিক হওয়ায় কথা বলেন কম। তিনি জানেন, বেশি কথা বলা মানেই সত্যের ওপর মিথ্যার প্রভাবকে প্রবলতর করা—

সে কহে মিথ্যা সবিস্তারে
যে কহে বিস্তর।

সেই রোমহর্ষক ব্যক্তিত্ব জনক সদ্য বৃষ্টিস্নাত ভূমিকে কর্ষণ করতে একাকী পৌঁছে গেলেন খোলা আকাশের তলায়। কোনও বস্তুকেন্দ্রিক প্রত্যাশার চাপ তাঁর মধ্যে ছিল না। ছিল এক প্রায় অলীক পবিত্রবোধ। ভূমিতে স্বর্ণমণ্ডিত লাঙল নামাতে না নামাতে শিশুক্রন্দন তাঁকে স্তম্ভিত করে দেয়। তিনি প্রত্যক্ষ করলেন এক অপরূপা শিশুকন্যাকে।

সৌম্যকান্তি রাজা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন। প্রকৃতি তাঁর শ্রেষ্ঠ সম্ভারগুলিকে ছড়িয়ে দিয়ে গেছে ওই শিশুর সর্বাঙ্গে। সকল শিশুর ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে, এই শিশুর ওপরেও কালসিটের মতন কোনও কলঙ্করেখা আঁকা নেই। ওই মুহূর্তে প্রশ্নই ওঠে না—এখানে শিশুর অবস্থান কী আদৌ আইনানুগ? অপরিসীম আনন্দে পুলকে স্নেহে শিশুকে বুকে জড়িয়ে রাজা

ছুটলেন তাঁর রাণীর নিকট। রাণীর নাম সুনয়না। তিনিও ভাবাপ্লুত ওই অপরূপা শিশুকন্যাকে দেখে। বুকে শিশুকে জড়িয়ে ধরে রাজদম্পত্তি শপথ নেন—এই কন্যা আমাদের। একান্তভাবেই আমাদের!

এই অবধি লেখার পর সামান্য ধন্দ। ধন্দটা ভৌগলিক। এক জায়গায় দেখছি, রাজা জনক ছিলেন জনকপুরের রাজা। অন্যত্র আবার তাঁকে বলা হয়েছে মিথিলার রাজা। মিথিলাই কী জনকপুর? এবং মিথিলা কী একসময় নেপালের অংশ ছিল?

সে যাই হোক, সীতা যে রাজপরিবারে স্থান পেল, এটাই বড় কথা। নবজাতিকাকে নিয়ে রাজবাড়িতে সাজো সাজো রব। উৎসবের রোশনাই অনেকদিন ধরে জ্বলেছিল। কন্যাপ্রাপ্তির ওপর মহিমার প্রলেপ বাড়তে থাকে। ঋষিরা চোখ পাকিয়ে বললেন, 'এই কন্যা ধরিত্রীরই সন্তান। এর মাতা ভূমি। পৃথিবীকে উত্তমতর করতে তাঁর আবির্ভাব। সমগ্র মানবজাতি চিরকাল এই সীতাকে নিজেদের হৃদয় নিঙড়ানো শ্রদ্ধা সমভাবে নিবেদন করে যাবে।

সীতার রূপ ও গুণ দিন দিন এমনই বিকশিত হতে থাকে যে তা ঋষিদেরও বাক্যহারা করবার পক্ষে যথেষ্ট।

কিন্তু যিনি প্রকৃত সত্যদ্রষ্টা, তিনি ওই কন্যার আবির্ভাবের পশ্চাতে গূঢ় তাৎপর্যের সন্ধান পান। তাঁদের ব্যাখ্যা, সীতা হলেন সেই ভূমির উর্বরতা—যা সামগ্রিকভাবে ভারতের নারীত্বকে এক বিশেষ উচ্চতায় স্থাপন করে গেছে। হিন্দুদের প্রতি স্রষ্টা অতি মেহেরবান, তাই সীতা হেন রমণীরত্নের নিদর্শন থাকছে আমাদের সামনে।

সীতার আরও কয়েকটি নাম রয়েছে। তিনি জনক রাজার কন্যা হওয়ায় জানকী নামেও পরিচিতা। তিনি রামের ঘরণী হওয়ায় অনেক সময় তাঁকে অভিহিত করা হয়েছে রামা নামে। সীতার পালক পিতা জনক বিশেষ শক্তি বলে নিজের দেহকে অদৃশ্য করতে পারতেন। তাই তাঁর এক নাম ছিল বিদেহ। বিদেহর কন্যা হওয়ায় সীতাকে কোনও কোনও সময়ে বলা হয়েছে 'বৈদেহী'।

সীতাকে কেবল হিন্দু রমণীর আদর্শকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে ধারধামে আনা হয়নি। ত্যাগ ও সত্যশক্তির মধ্য দিয়ে প্রবহমানা তিনি নিছক নির্বাণের পথিক নন। তাঁর আবির্ভাবের তাৎপর্য আদ্যাশক্তির বিকাশে।

সীতা কেন এলেন, এই বিষয়ে পরবর্তীকালে রামায়নের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আর একটি উপগাথা। নারীত্বের অপমান মানে মাতৃত্বের অপমান। এবং সেই অপমান যিনি করেন, তাঁর শাস্তি লাভ অনিবার্য। ভারতবর্ষে এই

আদ্যাসাধনার ধারাটি বিচিত্র। তন্ত্রের মধ্য দিয়ে উক্ত সাধনায় অনেকে চরিতার্থ লাভ করেছেন। কিন্তু তন্ত্র যুগে যুগে এত রকমের বিভক্তি অর্জন করেছে যে তাদের একটি সুসংহতরূপে দাঁড় করানো দুঃসাধ্য। বিজ্ঞান, বিশেষত দেহবিজ্ঞান এর সঙ্গে যুক্ত। এ দেশে শক্তি মানে রমণী। এই শক্তি থেকেই জগতসংসারের সৃষ্টি। ফলে রমণীকে যিনি আঘাত করবেন বা আহত করবেন, তাঁর শাস্তিলাভ অপ্রতিরোধ্য।

মহা বলবান রাবণ সেই আঘাত হেনেছিলেন। তাই তাঁকে শাস্তি পেতে হয়েছে। রাবণকে শাস্তি দেবার জন্যই সীতার আবির্ভাব।

পূর্বজন্মে সীতার পরিচয় ছিল বেদাবতী রূপে। তিনি আদ্যন্ত লক্ষ্মীর অবতার হলেও দরিদ্র পরিবারের কন্যা। দারিদ্র্যের কারণ তাঁর পিতা কুশধ্বজ ছিলেন আত্মভোলা জ্ঞানভিক্ষু। তিনি বহুবিধ জাগতিক অজাগতিক রহস্যের তল খুঁজে বেড়াতেন। তাঁর একটিই কন্যা—যে কন্যার তাপ উত্তাপ হাসি এবং বিষাদ নিয়ে তিনি তেমন ভাবিত ছিলেন না, যদিও উক্ত কন্যার ছিল একটি অত্যাশ্চর্য হৃদয় ও অপরিমিত সৌন্দর্য।

কুশধ্বজ শুভকরী ভাবনা ও জ্ঞানচর্চায় অধিকতর ব্রতী থাকবার বাসনায় বনাঞ্চলে ঘর বাঁধলেন। সেখানে প্রাকৃতিক সম্পদের অপ্রতুলতা না থাকলেও ব্যবহারিক জীবনের বৈভব জোগাতে তিনি ছিলেন অপারগ।

অন্যদিকে তাঁর কন্যা বেদাবতীও নিজের যাবতীয় তন্ময়তাকে নিবেদন করে বসে আছেন শ্রীবিষ্ণুকে। বেদাবতীর স্থির প্রত্যয়, তাঁর জীবনে শ্রীবিষ্ণুর অভ্যুদয় ঘটবেই।

কিন্তু আগমন যাঁদের ঘটল, তাঁরা সকলেই বেদাবতী ও তাঁর জনক-জননীর নিকট নিছক অনভিপ্রেত।

বনভূমি কেবলমাত্র বনবাদীর বিচরণভূমি নয়। সেখানে আসেন শিকারের সন্ধানী রাজা-মহারাজারা। আসেন এমন ব্যক্তিত্ব, যাঁরা বীররসেরও বিশেষ পূজারী। আবার আসেন মদগর্বী দৈত্য-দানবরাও। এঁদের মধ্যে কয়েকজনের নজর বিদ্ধ হয় আশ্রমকন্যার ওপর। যৌবনের ওই প্রকার বিকশিত মাহাত্ম্যে তাঁরা প্রথমে বিচলিত, তৎপরে উজ্জীবিত হয়ে ওঠেন। বেদাবতীর শারীরিক সম্পদ, মৃদুমন্দ কণ্ঠস্বর, শুধু কোন এক অদৃশ্য শক্তির প্রতি নিরবচ্ছিন্ন মনোনিবেশ তাঁদের যুগপৎ মুগ্ধ ও প্রলুব্ধ করে।

এই যুবতীকে স্ত্রীরূপে লাভের বাসনায় একজনের পর একজন আবেদন জানাতে আসেন কুশধ্বজ ও তাঁর স্ত্রীর কাছে। পার্থিব বিচারে তাঁরা কেউই

সামান্য নন। কেউ রাজা, কেউ সেনাপতি, কেউ প্রচণ্ড বলশালী ও সম্ভাবনাময়। প্রত্যেকেই জানাচ্ছেন, কুশধ্বজের রূপবতী কন্যাকে তিনি সকল প্রকার সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য দেবেন। আসলে তাঁরা তো অপাত্র নন, তাঁরা জানেন না যে, এই বনকন্যা তাঁর অন্তরে মাস্তুল আকারে রাখবার মতন একমাত্র কৃষ্ণভাবনাকেই পুঁজি করেছেন। সেখানে আর কোনও পুরুষের পক্ষে অনুপ্রবেশ করা দুঃসাধ্য।

কুশধ্বজ ও তাঁর স্ত্রী শান্ত সংযতভাবে সকলকে এই বিষয়ে অবহিত করলেন। আবেদনকারীরা হতাশ হলেন। কিন্তু তাঁদের ক্ষোভের কোনও অবকাশ ছিল না। ফলে কোনও চাঞ্চল্যকর কিংবা হাস্যকর পরিস্থিতিরও উদ্ভব হয়নি।

সেটা হল আরও পরে।

সেই কালে শম্ভু নামক এক দৈত্যের উত্থান দেবকুলকে বিশেষ বিব্রত ও হতচকিত করে রেখেছিল। শম্ভুর অন্বেষণ ছিল ব্যাপক—স্বর্গ, মর্ত্য পাতালের তাবৎ মহার্ঘ বস্তুর অধিকার তাঁর চাই-ই। সমুদ্র মন্থনকালে অসুরদের প্রতি যে বেইমানি দেবতারা করেছিলেন, তারই বদলা নেবার গুরুদায়িত্ব যেন নিয়ে রেখেছেন শম্ভু। এখন সমানুপাতিক নয়, অধিকতর সুখ ও ক্ষমতা চাই দৈত্যরাজের।

এহেন শম্ভুই বনাঞ্চলে পরিভ্রমণকালে আলটপকা দেখতে পেলেন বেদাবতীকে। রূপ ও যৌবনের অনবদ্য পশরা সামগ্রিক পারিপার্শ্বকে উজ্জ্বলতর করেছে। পুষ্পভূষণে সজ্জিতা দুর্লভ রূপবতী দৈত্যের শরীরে ও মনে তীব্র কামভাব সঞ্চালিত করে। যৌন মিলনই দৈত্যের নিকট প্রাধান্য পায় ও তিনি যুবতীকে অনুসরণপূর্বক কুশধ্বজের কুটিরে উপস্থিত হলেন।

দৈত্যরাজ বেদাবতীর পিতা-মাতার সঙ্গে যেভাবে বাক্যলাপ শুরু করলেন, তা অবশ্যই সৌজন্যের গণ্ডী অতিক্রম করে। তিনি আবেদনের পরিবর্তে দাবিকে প্রাধান্য দেওয়ায় কুশধ্বজ বিরক্ত হয়ে ভর্ৎসনার সুরে বললেন, 'আপনার কথা বলার ধরন প্রমাণ করে, আপনি একজন রুচিহীন শিক্ষাহীন মদগর্বী পুরুষ। আপনার ন্যায় অশালীন পুরুষকে কদাপি আমার কন্যা স্বামীরূপে বরণ করে নিতে পারে না। আমার কন্যা বেদাবতী শ্রীবিষ্ণুর নিকট মনে মনে নিজেকে সমর্পণ করে বসে আছে। সুতরাং আপনাকে সে উপেক্ষা করবেই।'

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এরকম স্পর্ধা অকল্পনীয়। কুশধ্বজ ক্রমান্বয়ে আরও কিছু কটু কথা শোনালেন, যাদের মধ্যে কিছু নীতিশিক্ষাও ছিল শম্ভুর জন্য। শম্ভু ক্রোধে অগ্নিশর্মা। একটি মানবীকে লাভ করতে এসে এরকম দৈন্যদশায় নিক্ষিপ্ত হবার আশঙ্কা তিনি করেননি। মনুষ্যেতর প্রাণীরাও বোধকরি এর চেয়ে বেশি কদর ও স্বাচ্ছন্দ্য পেয়ে থাকে কোনও গৃহস্থের কাছ থেকে।

ক্রোধান্বিত শম্ভু আকাশ পানে তাকালেন। চতুর্দিকে অন্ধকার ঘনায়মান। কালো মেঘের দাপটে ভগ্ন চন্দ্রের নিগ্রহ। আরও অন্ধকার জমাট বাধতেই অনিয়ন্ত্রিত হুঙ্কারে চতুর্দিক প্রকম্পিত করে তুললেন দানব শম্ভু। তাঁর চকিত আক্রমণে নিহত হলেন কুশধ্বজ ও তাঁর স্ত্রী। বেদাবতী সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলেন। শম্ভু কিন্তু তাঁকে স্পর্শ করতে পারলেন না। হয়তো শ্রীবিষ্ণুরই মহিমায় দানব অনেক সন্ধান করেও কুশধ্বজের কন্যাকে খুঁজে পাননি।

কন্যা তখন দহনে সংযমে অধিকতর ভাবমূর্ছায় বিষ্ণুপ্রেমের অতলান্তে পৌঁছেছেন। তাঁর বারোমাস্যা ভিন্নতর। একাকী যুবতী বনের ফলমূল আহার করেন। সূর্যতপা হয়ে নদীতে অবগাহন হয় তাঁর। অকাট্য নিয়মে তাঁর যৌবন আরও বিকশিত। বর্ণনাতীত রূপ মাধুর্য। কৃষ্ণবর্ণ হরিণচর্মে তাঁর ঊর্ধ্বাঙ্গ ও নিম্নাঙ্গ আচ্ছাদিত। প্রশস্ত জংঘা, ক্ষীণ কটিদেশ সুপক্ক আম্রের ন্যায় স্তনযুগল, বিশাল তৃষ্ণার্ত মেঘসমান কেশসম্ভার, দুই আয়ত লোচনে নারীর চিরন্তন প্রণয়তৃষ্ণা, তাঁর স্পর্শলাভের জন্য কী উদগ্রীব অরণ্যভূমি!

ভূবনবিজয়ী লঙ্কার রাজা রাবণ একদিন আবিষ্কার করলেন বেদাবতীকে। রোমাঞ্চিত হলেন বহু নারীসঙ্গে অভিজ্ঞ রাক্ষসরাজ। শম্ভুর মতন তাঁরও প্রতিটি রোমকূপ তপ্ততা পায় যৌনজ কামনায়। নারীর রূপ ও সৌন্দর্য যখন অগ্নিরূপ নেয়, তখন ন্যায়-নীতির প্রাকার চূর্ণ হতে থাকে।

রাবণ সরাসরি গিয়ে বেদাবতীকে প্রস্তাব দিলেন। যথারীতি বেদাবতী ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলেন রাবণের প্রস্তাবকে।

দিশেহারা কামক্ষিপ্ত রাবণ বেদাবতীকে আঁকড়ে ধরতে চাইলেন। বেদাবতী আত্মরক্ষা করতে অসমর্থ হলেন। তাঁর কেশরাশিকে ধরে আকর্ষণ করছেন রাবণ। ক্রুদ্ধ অপমানিত বেদাবতী তঝক্ষণাৎ তাঁর কেশত্যাগ করলেন। তাঁর চতুর্দিকে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত হয় এবং সেই অগ্নিকুণ্ডে আত্মবিসর্জনের পূর্বলগ্নে বেদাবতী রাবণকে বললেন, 'তুই আমাকে যেভাবে অপমানিত করলি, তার শাস্তি তোকে পেতেই হবে। আমি পুনরায় এই বিশ্বমৃত্তিকায় আবির্ভূত হব এবং আমাকে কেন্দ্র করেই শ্রীবিষ্ণুর হাতে তোর মৃত্যু ঘটবে।'

সীতার জন্মের পশ্চাতে সংঘটিত এই তাৎপর্যময় ঘটনাকে অগস্তমুনি একবার রামকে শুনিয়েছিলেন।

মানব-মানবী একাধিকবার এই পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারে আরদ্ধ কর্ম সম্পন্ন করবার জন্য। এই তত্ত্ব প্রাথমাবধি প্রাচীন হিন্দুদের কাছে পরম সত্য। অতীন্দ্রিয়বাদকে সমর্থন করে গেছেন পশ্চিমের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও ধার্মিকরা—যাঁদের মধ্যে রয়েছেন হেগেল, ম্যাথু আর্নল্ড, মেটারনিক, প্লেটো, জে.জি. ফ্রেজার, প্রফেসর টাইলব, রুলফ অট্রো, জীন ইব্ধে, ফিক্টে প্রমুখ চিন্তানায়কগণ। ঋগ্বেদে বলা হয়েছে ঃ

'হে অগ্নিদেব, তুমি তোমার উজ্জ্বল শিখার দ্বারা মৃতের আত্মাকে পরিশুদ্ধ কর। যে প্রয়োজনে তার অসমাপ্ত কর্ম সম্পাদন করতে পুনরায় সে আবির্ভুত হবে।

ছান্দোগ্য উপনিষদ বলছে, 'দেহ নশ্বর, তাই তার মৃত্যু আছে। আত্মা তার একটা সময় ওই দেহে অবস্থান করে। কিন্তু দেহের আনন্দ বা ব্যথা তাকে স্পর্শ না করলেও সে তার আরদ্ধ কর্ম বা কর্মফল অনুসারে পরবর্তী পর্যায়ে দেহান্তরে গমন করতে পারে।'

প্লেটো বললেন, 'আত্মা অবিনশ্বর।...প্রয়োজনের খাতিরে সে আবার মনুষ্যজন্মে ফিরে আসতে পারে।'

প্রতিশোধ নেবার স্পৃহাতেই বেদাবতী পরবর্তী জীবনে হয়ে এলেন সীতা।

কিন্তু দ্রৌপদী ?

দ্রৌপদীর জন্ম কোন ঘটনার সূত্র ধরে ? এখানেও রয়েছে বিলক্ষণ হেতু। এক কোজাগরী শারদ পূর্ণিমায় মর্ত্যসীমায় চলে এল অপূর্ব এক কন্যাসন্তান—দ্রৌপদীর জন্ম এরকম কোনও সাধারণ ঘটনা নয়। তিনিও সীতার ন্যায় ব্যতিক্রমী। সীতা জন্মেছিলেন রাবণের ওপর প্রতিশোধ নিতে। আর দ্রৌপদী এলেন তাঁর পিতার ওপর নিক্ষিপ্ত অপমানের বদলা নিতে।

মহাভারত রূপে-পরিধিতে অনন্য হয়ে উঠতে পারত না দ্রৌপদী না থাকলে। দ্রৌপদী সেই নারীচরিত্র, যাঁর ব্যক্তিগত চাহিদা ও স্বল্পলোকিত রহস্যময়তা নিয়ে অজস্র কৌতূহলের উদ্রেক ঘটায়। কল্পনা ও অভিমতের বিস্তর অবকাশ রাখে।

পাঞ্চালের রাজা দ্রুপদের কন্যা দ্রৌপদী। দ্রুপদের কন্যা বলেই তিনি দ্রৌপদী। আবার পাঞ্চালের রাজকুমারী ছিলেন বলেই তাঁর আর এক নাম পাঞ্চালী।

দ্রৌপদীর জন্মের অনেক আগে রাজা দ্রুপদের সঙ্গে পাণ্ডব ও কৌরবদের অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যের ব্যক্তিগত বৈরীতা ছিল। দ্রুপদ মনে করতেন, দক্ষিণ ভারতের সমৃদ্ধশালী তাঁর রাজ্য যেমন ভরা নদী ও ভরা ক্ষেতে টইটম্বুর, উত্তর ভারতে তার তুলনা মেলা ভার। আবার বাহুবলে ও অর্জিত বিদ্যায় তিনি দ্রোণকে টেক্কা দিতে চাইতেন, যদিও বাস্তবে কোনও দিনও তা সম্ভব ছিল না। তিক্ততা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে দ্রোণ পাঞ্চাল আক্রমণ করেন। দ্রোণের হয়ে যুদ্ধ করেন তাঁর প্রিয়তম শিষ্য অর্জুন। অর্জুনের বীরত্বের কাছে নস্যাৎ হয়ে যায় দ্রুপদের যাবতীয় প্রতিরোধ প্রয়াস। তাঁর অর্ধেক রাজ্য দ্রোণের করতলগত হয়। পরাভূত, লাঞ্ছিত দ্রুপদ তখন এর বদলা নেবার উপায় খুঁজতে থাকেন। তাঁর যাবতীয় ক্ষোভ দ্রোণের বিরুদ্ধে। অর্জুনের ক্ষতি করবার বাসনা তাঁর ছিল না। কিন্তু তিনি চাইছিলেন, এই অর্জুন যেন একদা তাঁর গুরু দ্রোণাচার্যকে পরিত্যাগ করেন ও দ্রোণের মৃত্যু অনিবার্য হয়ে ওঠে মহা রণক্ষেত্রে।

কীভাবে তা সম্ভব ?

এই প্রকার বিশাল সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে পারে একমাত্র আদ্যাশক্তিই। আদ্যাশক্তি মহামায়ার আগমনীর মধ্য দিয়েই আপাত অসম্ভবকে সম্ভব করা যেতে পারে। মহামায়া শক্তিকে যদি জাগ্রত না করা যায়, ঘটনাস্রোত রুদ্ধ হয়ে পড়বে।

'অর্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্যা বিশেষতঃ।
ত্বমেব সা ত্বং সাবিত্রী ত্বং দেবজননী তারা।

দৃশ্যত যা দুর্বল অনুচ্চার্য নিগুর্ণা তথা তুরীয়া, সেখানেও হে দেবী, তোমারই উপস্থিতি। তথায় তুমিই গায়েত্রী মন্ত্ররূপা। পরিণামহীনা হয়েও শ্রেষ্ঠাশক্তি রূপে পরিণামকে প্রতিষ্ঠিত করো। তুমিই তো দেবগণের আদি মাতা।

আদ্যাশক্তিকে তাঁর সংসারে কন্যারূপে আনয়নের তীব্র তাড়নায় মহাযজ্ঞের আয়োজন করলেন মহারাজা দ্রুপদ।

রাজ্যব্যাপি ঋতু উৎসবের আবহ। বহু ঋষি ও ব্রাহ্মণ আনন্দিত হয়ে সেই যজ্ঞস্থলকে বেষ্টন করে থাকেন। অগ্নিকুণ্ডে বারংবার আহুতি দেওয়া হয় ঘৃতসমেত বহুবিধ মহার্ঘ উপাচার। দিনের অবসান ঘটে। সূর্য অস্ত যায়। তৎপরে অজস্র নক্ষত্রের আলোকসম্পাতে যজ্ঞাগার থেকে বেরিয়ে আসেন এক অপূর্ব নারীমূর্তি।

তিনিই দ্রৌপদী।

তাঁর আবির্ভাবই পূর্ণযৌবনারূপে। জন্মমুহূর্তে কেবল সাবলীল নয়, যেন আকাশছোঁয়া সংশয়হীন আনন্দঘন আত্মবিশ্বাস। দীঘল শরীরের গঠন দ্রস্টার অন্তরে তীব্র শিহরণ তুলবেই। কোন রক্ষাকবরচ নিয়ে এসেছেন এই রূপসী ? কোন কুলে ভিড়বে এ তরী ? সমকালে এমন কোনও সুন্দরী ভূভারতে ছিলেন না, যিনি দ্রৌপদী অপেক্ষা অধিকতর আকর্ষনীয়ারূপে নিজেকে দাবি করতে পারেন। দ্রৌপদী গৌরবর্ণা নন। কিন্তু তাঁর মসৃণ কৃষ্ণত্বক নির্বাসিতের জীবনেও সুখস্বপ্নের সঞ্চার করতে পারে। যজ্ঞাধার থেকে দ্রৌপদী একাই বেরিয়ে এলেন না। তাঁর সঙ্গে এলেন আরও দু'জন—একজন ধৃষ্টদুম্ন্য, অপরজন লিঙ্গচ্যুত শিখণ্ডী। অর্থাৎ দ্রৌপদী সুনিশ্চিতভাবেই কৌরবদের ধ্বংস সূচিত করলেন।

সীতা এসেছেন রাবণকে নিকেশ করতে।

দ্রৌপদীর আবির্ভাব সমগ্র কৌরবপক্ষকে ধ্বংস করতে।

আর হেলেন ?

আর এক মহাকাব্যিক নায়িকা হেলেনের জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে এবার তাই আমাকে সন্ধানী হতে হচ্ছে।

হেলেনের নাম, তাঁর কাহিনি যোজন উড়িয়ে নিয়ে যায়, বসন্ত ঋতু খানিক পাগলামিও করে। হেলেনের সঙ্গে এসে যায় আধুনিকতার অনন্য রঙ্গ, যেহেতু হেলেনের মধুমাস রমণীয় হয়েছিল পরকীয়া প্রেমের উত্তাপে।

প্যারিসের পৌরুষ, বীর্য, দীপ্ত নিরঙ্কুশ দাবি ও সাহসিকতা রক্তবর্ণ হেলেনকে উত্তাল করে তুলেছিল। সুগন্ধ বাতাস খেলা করছিল তাঁর চেস্টনাট চুলের ঢল নিয়ে। কাঙ্খিত পুরুষের শারীরিক ওমে নিজেকে নিঃশেষ করে দিতে চেয়েছিলেন হেলেন। পরকীয়া প্রেমের উষ্ণতায় হারিয়ে ফেলেন পারিবারিক সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সম্বিত।

রাবণ সীতাকে হরণ করেছিলেন।

অপমানিতা দ্রৌপদী অপমানের প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলেন দুর্যোধন দুঃশাসন প্রমুখ সকলের নির্মম মৃত্যুকে সুনিশ্চিত করতে।

কিন্তু হেলেন তো অপহৃতা হননি। তিন তো কোনও অপমানের শিকারও নন। তিনি তো স্বেচ্ছায় ট্রয়ের রাজকুমার প্যারিসের বাহুবন্ধনে ধরা দিয়ে তৃপ্ত হয়েছিলেন। তথাপি ট্রয় কেন ধ্বংস হল ?

কবি হোমার সম্ভবত নীতির ও সদাচারের গণ্ডী চূর্ণ করবার বিপক্ষে ছিলেন। নারী ও পুরুষের বন্ধন একটি আদর্শ ও নিষ্ঠার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হোক—মহাকবির কাছে এটা কাম্য ছিল।

পরিবারের ভিত শক্তপোক্ত না হলে সমাজ দৃঢ়তা হারায়। সমাজ যেখানে উপেক্ষিত, রাষ্ট্রশক্তিও সেখানে যথাযথ দিশা দানে ব্যর্থ হয়। এই সকল ভাবনা কবিকে শেষমেশ দায়িত্ব সচেতন করলেও করতে পারে।

নাম তাঁর হেলেন কেন, এই নিয়ে এখনও পণ্ডিতদের মধ্যে নানান অভিমতের কাটাকুটি চলেছে। প্রত্যেকেই ব্যতিক্রমী কিছু বলতে চান. কিন্তু হেলেন শব্দটার সঙ্গে যে আলোকবর্তিকার একটি সম্পর্ক রয়ে গেছে, চর্চার মধ্য দিয়ে সেটাই বেরিয়ে আসে।

জর্জ কার্টিয়াস গ্রীক পুরাণ ও মহাকাব্য নিয়ে বিস্তর লেখালেখি করেছেন। তিনি বললেন, হেলেন শব্দটা নির্ঘাত এসেছে ELEVN শব্দ থেকে। আবার ELEVN শব্দের অর্থ যে চাঁদ, তা মনে করবারও ঢের কারণ রয়েছে। হেলেন তো চন্দ্রমুখীই। যে পুরুষ একবার ওই নারীর মুখের দিকে চেয়েছে, তার চিত্ত উত্তাল হবেই। ঋষিতুল্য দার্শনিকও এমত বিভ্রমের ব্যত্যয় ঘটাতে অসমর্থ।

অন্য এক গবেষক ইমেলিওবয়সাকও ELEVN শব্দটাকেই বেছে নিলেন। তিনি বললেন, হেলেন শব্দের অর্থ চাঁদ নয়। এর মানে আলোকবর্তিকা অথবা টর্চ [Torch]। এই টর্চ যাঁর ওপর গিয়ে পড়বে, তাঁর আর নিস্তার নেই। তিনি ওই সুন্দরীকে একান্ত নিজস্ব করে লাভের জন্য উন্মাদ হয়ে উঠতে পারেন।

নামের তাৎপর্য নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে এরকম তথ্য ও তত্ত্ব পাতে ফেলে ভূতভোজন চলছেই। আলো, চাঁদ, টর্চ, আগুন এই সমস্ত অভিধার ধারপাশ না মাড়িয়ে উপায় নেই।

ফলে অনিবার্য ভাবে চলে আসে ভেনাস।

লিন্ডা লি ক্লাডার অন্য একজন বিশেষজ্ঞ—যিনি বললেন, আমরা এ যাবৎ হেলেন নামের মাহাত্ম্য নিয়ে নিছক এক-একটি গুরুগম্ভীর জলচ্ছবি তৈরি করেছি মাত্র। এর একটাও যেহেতু ধোপে টিকছে না, তাই এখানেই ইতি টানা বাঞ্ছনীয়।

গ্রীক সভ্যতার সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতার যে একটি বিশেষ মেলবন্ধন রচিত হয়েছিল, তা প্রমাণ করবার জন্য গবেষকরা শব্দতত্ত্বের [etymology] সাহায্য নিয়েছিন। এই পদ্ধতির প্রয়োগ করে তাঁর প্রমাণ করতে চাইছেন, 'ইলিয়াড'-এর বিষয়বস্তুতে ঋগবেদের প্রভাব অনস্বীকার্য। ওই আদি বেদের সূত্র ১০.১৭.২ এ বর্ণিত আছে, সরযুনাম্নী এক রমণীকে অপহরণ করা

হয়েছিল। অপরহরণ কালে শূন্যমার্গ থেকে সেই নারী দেখেছিলেন বিশ্বের অপূর্ব রূপ—অরণ্যের বিশাল বিশাল 'গাছ আকাশের মুখ ঢাকতে চায়, গিরিবন্দরে চলছে আলো-আঁধারির খেলা। যদিও হেলেনকে নিয়ে পলায়নের সঙ্গে উক্ত ঘটনার কোনও সাদৃশ্য লক্ষণীয় নয়, গবেষকরা এখানে বৈদিক আদল দেখতে পাচ্ছেন গ্রীক মহাকাব্যে। ধারনাটা নিশ্চিত পুষ্টি যোগাচ্ছে Proto-Indo-European abduction-myth-কে।

কাহিনি নিয়ে অনুশাসনের বাধ্যবাধকতা বিশেষ ছিল না। মাইসেনিয়ান যুগের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে কবি হেলেনের ছবি এঁকেছেন। কবির নাম হোমার। অনেক পণ্ডিতের অভিমত, হোমারের হেলেন যথার্থ মৌলিক সৃষ্টি নয়। গ্রীক পুরানের রাংতায় মোড়া ছিল ওই চরিত্রটি। হোমার তাকে মহাকাব্যে অধিষ্ঠান দিলেন। রসিকমহলে খুশির হররা উঠল।

পুরাণ আর কী বলেছে? বলেছে, হেলেনের জন্মভূমি হল স্পার্টা। স্পার্টা মানেই দাপুটে পুরুষদের রঙ্গভূমি। সেখানকার শ্বাসবায়ুতে কেবল বীরত্ব, দাপট, অহঙ্কার—যা অজস্র উত্থানপতনের কারণ। ওই দিকচক্রে হেলেনের উপস্থিতি বিস্ময়ের উৎস। হেলেন এমনই রূপবহ্নি যাকে লাভ করবার জন্য অনেক পুরুষ অমরত্বকেও তুচ্ছ জ্ঞানে সম্মত। তিপ্পদের বর্ণমালায় হেলেন এক কালজয়ী মর্মরিত নারী।

স্পার্টার বিপরীতে ট্রোজান সার্কেল যেন আরও মহিমময়। সেখানেকার ভূদৃশ্যপটে শুধুই বীরত্ব ফুঁসে ওঠে না; সেখানে থাকে পারস্পরিক মমত্ব ও প্রশ্রয়। রাজপুত্র প্যারিসের বিজয় কামনায় রাজমাতা যখন বিধাতার কাছে প্রার্থনার ভঙ্গীমায় দু'দিকে দু'হাত বিছিয়ে দেন আমরাও তখন চাইছি—ট্রয়ের যেন পতন না হয়; হেলেন নাম্নী রমণীর নিশীথে প্যারিসের দুর্দমনীয় প্রেম ও অলৌকিক বীর্য তোলপাড় অক্ষুণ্ণ রাখুক তাঁদের কেয়ামতের শেষ প্রহর অবধি। তাই ট্রয়ের যখন পতন ঘটে, হেক্টর ভিক্টরের পর প্যারিসও শেষ শয্যা নেন তথা তঞ্চকতার শিকার হন এবং হেলেনকে নিয়ে গ্রীক যুদ্ধ জাহাজ পাল তুলে দেয় স্পার্টার উদ্দেশ্য, আমার যেন বলতে ইচ্ছে হয়ঃ

দেবতার ধন,
কে যায় ফিরায়ে লয়ে
এই বেলা শোন।

প্যারিসের সঙ্গে হেলেনের পলায়ন, পরিণতিস্বরূপ এক দীর্ঘস্থায়ী রক্তাক্ত যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ট্রয়ের পতন—বহু যুগ ধরে গ্রীসের মানুষ মুখে মুখে বলে এসেছে। পরে সেটা কবি হোমারের কলমে মহাকাব্যিক রূপ লাভ করে।

পুরাতাত্ত্বিকরা সেই কাহিনিকে কেবল লোকগাথা বলে স্বীকার না করায় খননকার্য চলে পরম উৎসাহে ও নিষ্ঠায়। পাওয়া যা গেল, তাকে লবডঙ্কা বলে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব না হলেও খৃষ্টজন্মের ১২০০ বছর আগে সভ্যতার প্রদীপ জ্বালিয়ে গ্রীসই যে ছিল য়ুরোপের সবেধন নীলমণি, সেটা তো সবুদ হয়েছে। আসলে সভ্যতাটার বয়স আরও বেশি। যীশুর আবির্ভাবের ১২০০ বছর আগে তার বিলুপ্তি ঘটে। সেই একটা সময়কে একেবারে ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না—যখন স্পার্টা ও ট্রয়ের নামডাক ছিল সমান সমান। টক্করও তাই চলেছিল সমান সমান।

এক-আধ বছর নয়। এক দশক। ওই সময়ে ট্রয়ের প্রাসাদে প্যারিসের প্রেম-সোহাগে ভাসমান হেলেনর যৌবনেও কী কালজনিত ক্ষয় আসেনি? কবি বলছেন, আসেনি। কারণ হেলেন অনন্তযৌবনা। অমনধারা সৌভাগ্য মহাকাব্যের নায়িকাদের হয়েই থাকে। একজনকে পাওয়া গেল লাঙলের ডগায়। একজন জন্মমুহূর্ত থেকেই পূর্ণযৌবনা। অন্যজনের আর বয়স বাড়ে না। ফরমান তো ঘোষিতই আছে—যেহেতু মহাকাব্যগুলিতে দেবমহিমা বুনিয়াদি স্তর থেকেই পাকাপোক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত, ইতিহাস ও যুক্তির অমন জোগারযন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা নাস্তি।

পুরাণ-কথায় কল্পনা সৌন্দর্য ও নীতিবোধ অজগরের মতন মাথা তুলে আছে। রসিকজন জানেন, ওই পুরাকথার বিস্তারে কত রস!

তো এই প্রথম পর্বে সীতা ও দ্রৌপদীর আবির্ভাবকে অনুভবে এনেছিলাম। এবারে হেলেন। তাঁরও একটি জমকালো আবির্ভাব কাহিনি আছে। অগ্নি, পৃথ্বী, বায়ু, অন্তরীক্ষ, আদিত্য, চন্দ্রমা, নক্ষত্রাদি সকলেই জানে সেই গুহ্যকথা। কবির কলম যেন কৃষ্ণের বাঁশির আটটা ছিঁদ্র। যখন বেজে ওঠে, শতদল যেন সহস্রদলে পরিণত হয়। মস্তিষ্কের কুঠুরিতে যত ভাষ্যই থাকুক, রসের সুলুক সন্ধানই শেষ কথা বলে।

হেলেন আবির্ভূতা হবে।

কালজয়ী নায়িকা যখন, তাঁর একখানা জবরদস্ত বংশগত পরিচয় থাকতে হবে। ইলিয়াড ও ওডেসি সমেত আরও কিছু উৎসকে ঝাড়পোছ করবার পর দেখা গেল, সকলেই বলছেন—হেলেনের শরীরে দেব শোনিত প্রবহমান। দেবতা হলেন জিউস ও মাতা হলেন লীডা। এই দু'জন যে সারাক্ষণ চুটিয়ে প্রেম করেছেন, রচনায় তেমন বাহুল্যতা না থাকলেও আমরা তা কল্পনা করে নিতে পারি।

কিন্তু মুশকিল ও তপ্ত রোমাঞ্চের সঞ্চার ঘটে লীডার পরিচয় পেয়ে। সেখানে কিন্তু বেশ কেতা ভাঙবার রসদ মজুদ। যীশুর জন্মের পাঁচ শত বৎসর আগে লেখা কাব্যে বর্ণনা রয়েছে—

লীডা বড় সুন্দরী। আবার ময়াল সাপের মতন তাঁর প্রেমবন্ধন। তাঁর যৌবন, যৌন মদকতা, সুমিস্ট প্রগলভতা মুগ্ধ করে স্পার্টার সম্রাট তিন্দারাসকে। সম্রাটের সংসারে কর্ত্রীর আশু পালনীয় কর্তব্যনিচয় সম্পন্ন করত রাণী লীডা সিন্দুকের চাবিকাঠিটিও হস্তগত করেছিলেন।

এহেন সম্রাজ্ঞী যখন দেবতাদের দেবতা জিউসের প্রেমে বাঁধভাঙ্গা হয়ে পড়েন পাঠকের হৃদয় ভিন্ন উষ্ণতায় মথিত হবেই। অর্থাৎ পরবর্তীকালে হেলেন যে পরকীয়া প্রেমে উদ্বেল হয়ে ওঠেন, তার বীজ তিনি পেয়েছিলেন তাঁর মার কাছ থেকেই।

আমাদের দেশের পুরাণে ও মহাকাব্যে নায়িকারা কদাপি ওই প্রকার উদ্দাম নন দেখে আমরা আশ্বস্ত হই। পুরুষরা কামবশে অনেক কিছু বেগড়বাই করে বসলেও নারীদের প্রেম একমুখী ও সংযম বড় কঠিন। এমনকী শ্রীরাধার মধ্যে ইত্যাকার সম্ভাবনা প্রকট হয়ে উঠতে পারে বুঝতে পেরে ভাষ্যকারগণ তার অঢেল গূঢ় শুদ্ধ তাৎপর্যের বিশ্লেষণ দিয়ে সংযমের পথটিকেই দেখাতে চেয়েছেন। তাঁদের ভাষা অঢেল জটিলতা সত্বেও ভারতবাসীর নিকট মান্যতা পেয়েছে। শারীরিক আকর্ষণ বলিহারি হলেও মানসিক স্থৈর্য পরিশেষে জয়যুক্ত হয়েছে।

তবে একথাও ঠিক, আদি পর্যায়ে কেবল ভারতভূমি নয়, পৃথিবীর প্রতিটি সভ্য দেশেই আদ্যাশক্তির ওপর নির্ভরতা ছিল খুব শক্তপোক্ত। কেন এমন হয়েছিল, তার বিস্তাবিত ব্যাখ্যা এখনও লভ্য নয়। কেবল দেখা গেছে, আদ্যাশক্তির কাছে নিজেকে মেলে ধরা সহজতর ও কার্যকর। ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংস মা কালীর সঙ্গে অনর্গল কথা বলে যেতেন। আমরা সেই মাধুর্যে নির্ভেজাল নির্ভরতা ও সততার সন্ধান পাই। বস্তুবাদের পতাকা কাঁধে মার্কসবাদীরা যখন রামকৃষ্ণ সম্পর্কে বলেন, 'উনি তো আসলে নিজের যৌন আবেগ দমন করতে গিয়ে ওই রকম পাগলামির আশ্রয় নিতেন', সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বিরক্তি ও ঘৃণার সঙ্গে ওই সকল ঐতিহ্যচ্যুত মানুষদের এড়িয়ে যাওয়াটাই শ্রেয় জ্ঞান করেছেন।

আদিতে জননীই সব। মাতৃপরিচয়ই প্রাধান্য দিত। পিতৃপরিচয়ের গুরুত্ব আসে অনেক পরে। জননী মানেই স্নেহ, মমতা ও দিশা। আর পুরুষের পরিচয়

যেন একটাই—প্রতিরক্ষা। পুরুষ শারীরিক বলে বলীয়ান। ওই শক্তির প্রয়োজন ও প্রয়োগ নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করতে। পরে অবশ্য এই একপেশে ধারণার বিলোপ ঘটে। তখন দেখা যায়, পুরুষ যেমন দেবত্বে আসীন, নারীও তদ্রূপ মহাশক্তিতে বলীয়ান। সর্বত্রই বিভাজন তৈরি হতে থাকে। এমনকী ধর্মগ্রন্থও। যেমন গীতা হল পুরুষাত্মক এবং চণ্ডী মহিলাত্মিকা।

সর্বদেশের প্রাচীন গ্রন্থাদি মন্থন করলে আমরা তিনটি শক্তির পারস্পরিক সম্পর্ককে চিহ্নিত করতে পারি ঃ

(ক) বিশ্বের সর্বত্র নারীশক্তির প্রভাব স্বীকৃত।

(খ) লিঙ্গপূজার প্রতি অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ।

(গ) ধর্ম বা কাব্য—যে মোড়কেই থাকুক না কেন, নর-নারীর প্রেমকে প্রাধান্য দিতেই হচ্ছে।

এই তিনের ব্যখ্যা দিতে দিতে কিছু মানুষ কাহিল হয়ে পড়েছেন। একদল বলছেন, পুরুষ ও নারীর প্রেমই হল আদত সূত্র। একে ধরেই ঈশ্বরপ্রেমের উন্মেষ। আবার আর একদল ভাষ্যকারের অভিমত—নারী-পুরুষের প্রেমের সঙ্গে ঈশ্বরপ্রেমের কোনও সম্পর্ক নেই। এই দুই দলই মেহনত করে চলেছেন নিজেদের অভিমতকে গ্রহণীয় করে তুলতে।

ইতিহাসকে ঘাঁটাতে হচ্ছে নিজেকে দম ফেলার ফুরসত না দিয়ে। সেখানে দেখছি, আদিকাল থেকেই দেবী এলেই তাঁর পাশে এসে দাঁড়াচ্ছেন একজন দেবও। একজন আর একজনকে আপ্যায়িত করছেন। সম্পর্কও নিগূঢ় হয়ে ওঠে। যেমন ব্যাবিলনের প্রাচীন সভ্যতা। দেব ও দেবীর সম্পর্ক রচনায় তাঁদের কৃতিত্বকে বাহবা জানাতেই হয়। যেই একজন দেবতা এলেন, দেখা গেল তাঁর পাশে সঙ্গিনীরূপে রয়েছেন একজন দেবী। প্রতিটি নগরের জন্য একজন করে দেবতা ও দেবী। জোড়ায় জোড়ায়। ক্রমে রাষ্ট্রশক্তি প্রবল হয়ে উঠলে তথা সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা প্রাধান্য পেতে থাকবার সঙ্গে সঙ্গে দেবীদের তুলনায় দেবতাদের মহিমা অধিকতর পরিস্ফুট হতে থাকে।

কয়েকজন মাতৃদেবী কিন্তু স্বমহিমায় চিরকাল সমান ভাস্বর। অনুসন্ধানী হলে দেখা যাবে, তাঁরা একই আদ্যাশক্তির বিভিন্ন রূপ। যেমন দেবী দুর্গা। তাঁর কত নামে পরিচিতি ! যথা কাত্যায়নী, কৌশিকী, অর্পণা ইত্যাদি। অপর্ণা শব্দের তাৎপর্য এখানে এই যে, দেবী অত্র সম্পূর্ণ নগ্নিকা। সম্ভবত আর্যদেব আগমনের পূর্বে অনার্য জনগোষ্ঠীর দ্বারা তিনি পূজিতা হতেন।

প্রাচীন গ্রীস ও রোমে দেবীরা একদিকে প্রেম, অন্যদিকে কল্যাণদায়িনী। যথা, প্রাচীন গ্রীসের ডিওন [Dione]। তিনি আবার আর্দ্রতা ও উর্বরতারও দেবী।

দেবতারা তাঁদের প্রেম নিবেদনের জন্য দেবীর সন্ধানে পরিভ্রমণ করতেন। যেমন হেলেনের পিতা দেব জিউস। নিজের আদত রূপ নিয়ে ঘুরতে বের হলে পাঁচজনের নজরে এসে যাবেন, স্বতঃসিদ্ধভাবে নানারকম প্রশ্ন ও কৌতূহল বাড়বে, মান-ইজ্জত নিয়েও টানাটানি পড়তে পারে...এই সমস্ত সাত-পাঁচ ভাবা ইস্তক জিউস একটু ইতস্তত করলেন। শেষমেশ কোনও হাঁকডাক না করে রাজহাঁসের রূপ ধরে দিলেন উড়াল। মনমতন একজন প্রেমিকাকে দেহে ও হৃদয়ে গ্রহণ করা ছিল তাঁর অভীষ্ট।

ঋজু ভঙ্গীতেই উড়ছিলেন রাজহংসরূপী জিউস। কিন্তু বিপদ ঘনালো। ওই সময় দুরন্ত শয়তানও বেরিয়েছে গগনবিহারে। তারও ছদ্মবেশ।' সে হয়েছে এক বিশাল ঈগল।

ঈগল তাড়া করল রাজহংসকে। রাজহংস ঈগলের তাড়া খেয়ে আশ্রয় নিল স্পার্টার রাজপ্রাসাদে। আর সেখানেই জিউস দেখলেন রানী লীডাকে। আর লীডা দেখলেন জিউসকে। জিউসের ঋজু ভঙ্গীমা আর লীডার যৌবনসমৃদ্ধ স্নিগ্ধতনু পরস্পরকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করে। জমজমাট ও গাঢ় রোমাঞ্চের উপাদান বুঝি শকটবাহী হয়ে সেখানে উপস্থিত। সকলের অগোচরে উভয় উভয়ের দেহের গলিখুঁজি, ভুলভুলাইয়ার গুপ্তপথগুলিকে চিনে নেন, কাম দানো হয়ে ওঠে। তাঁরা চূড়ান্তভাবে মিলিত হন।

ওই মিলনের ফলশ্রুতিতে গর্ভবতী হলেন লীডা। যথাকালে প্রসব করলেন একটি ডিম্ব। সেই ডিম্ব থেকে আত্মপ্রকাশ করে শিশু হেলেন। সকলে জানল, হেলেন রাজা তাইন দারিয়ুসের কন্যা। একমাত্র লীডাই জানেন, হেলেন দেবতা জিউসের ঔরসজাত।

কিন্তু ভ্যাটিকানের পুরানব্যাখ্যাকাররা বলেন, লীডা একটি ডিম প্রসব করেননি। তাঁর হয়েছিল এক জোড়া ডিম। একটি ডিম থেকে বেরিয়ে আসে ক্যাস্তর ও পোলাক্স। অন্য ডিম থেকে নির্গত হয় হেলেন ও ক্লাইটেমনেস্ত্রা। কাহিনি আরও গাঢ় হয়ে ওঠে এমত বর্ণনায় যে, জিউসের সঙ্গে যৌনমিলনের আগে লীডা ডাক পান স্পার্টার সম্রাটের কাছ থেকে। তিনি সম্রাটের নিকট উপস্থিত হলে সম্রাটের ভিতর কামভাব জেগে ওঠে ও তিনি স্বাধিকারে লীডার কাছ থেকে দেহমিলনের তৃপ্তিটুকু ষোল আনা আদায় করে নেন। এরপরই

লীডা ছুটে যান লুকিয়ে থাকা জিউসের কাছে ও তাঁর আবেগ-আশ্লেষে আপ্লুত জিউস যৌনমিলনে ব্রতী হন। এভাবেই পর পর দুজন পুরুষের সঙ্গে মিলিত হওয়ায় লীডা যথাকালে দুটি ডিম প্রসব করেন। একটি ডিম থেকে বেরিয়ে আসা ক্যাস্তর ও পোলাক্স স্পার্টার রাজার ঔরসজাত। আর একটি ডিম থেকে নির্গত হেলেন ও স্পাইটেমনেস্ত্রাকে গঠন করেছে দেবরাজ জিউসের বীর্য।

শ্লীল, অশ্লীল, যৌনতা এই সমস্ত নিয়ে মহাকাব্য ও পুরাণের দৃষ্টিভঙ্গী আশ্চর্য স্বচ্ছ। আবেগ ও বাসনাকে সেখানে যেমন স্বীকৃতি দেয়, তেমনি গুরুত্ব দেয় প্রয়োজনের। বংশরক্ষায় সন্তান দরকার, নারীর কামনাকে তৃপ্ত করতে বীর্যবান পুরুষের প্রয়োজন—এই উভয়কে মান্যতা দিয়েছেন তাঁরা কিছু বিধির ব্যাখ্যা সহকারে। পঞ্চপাণ্ডব ও বিদুরের জন্ম তো সেই সত্যেরই ফলশ্রুতি। অশ্লীলতার প্রশ্ন ওঠাটাই হাস্যকর।

তবে প্রেমের ক্ষেত্রে, যৌনতার ক্ষেত্রে নারীর বা দেবীর ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে খুব মান্যতা দেওয়া হত। পুরুষ সেখানে বলপ্রয়োগের আশ্রয় নিলে বা নিতে চাইলে কিংবা এই কারণে সংশ্লিষ্ট নারীকে যদি অপমানিত হতে হত, সেই বলদর্পীপুরুষের বিনাশ অনিবার্য। যেমন রাবণের বিনাশ ঘটে। কুরুবংশ ধ্বংস হয়। কিন্তু ওই অর্থে ট্রয়ের পতনকে কেমন যেন অযৌক্তিক মনে হয়।

নর ও নারীর প্রেম ও মিলনের বিষয়কে কেন্দ্র করে প্রাচীন দেবীদের প্রাধান্য। এই পথে উদ্ভাসিত রোমের ভেনাস, স্ক্যান্ডিনেভিয়া রাজ্যের ফ্রেয়া, দক্ষিণ আমেরিকার আজটেক সভ্যতার ত্বাজোলটি ওটল, গ্রীসের আফ্রোদিতি ব্যাবিলনের ইশতার প্রমুখ। কোথাও তাঁরা দেবী, কোথাও তাঁদের ভূমিকা যেন নগরনন্দিনীর। ক্রমে অনেকে মুছে গেলেন। অনেকে রইলেন কেবল যৌন প্রতীক হয়ে।

যৌনতার দুই প্রতীক—যোনি ও লিঙ্গ। লিঙ্গপূজার বড় সড় প্রচলন ভারতবর্ষে—যার গতিমুখ আজও সমান শক্তিশালী। শিবলিঙ্গের আরাধনা এক বিরাট পরম্পরা। প্রাচীন গ্রীসেও লিঙ্গপূজার প্রসার ছিল। কোথাও ব্যাপ্ত, কোথাও সংক্ষিপ্ত।

গ্রীসে ফেলিপোরিয়া নামক এক উদ্দীপনাময় উৎসব ছিল—যার জাঁকজমকে নরনারীরা বুঝি ঝলসে যেত। এটাও ছিল লিঙ্গপূজা। উৎসবপ্রাঙ্গণে লিঙ্গদেবতার গড়ন ও উচ্চতাকে মাপতেন পুরোহিতরা।

প্রাচীন মিশরেও লিঙ্গ পূজিত হত। পরে সেই দেবতা যেন নির্বাসনে চলে যান।

অতীতের ব্যাবিলনে পাষাণনির্মিত লিঙ্গকে জড়িয়ে ধরে সম্ভ্রান্ত বংশীয়া নারীরা আকুল হয়ে নিজেদের নিবেদন করতে চাইতেন। যুদ্ধে সম্ভাব্য বিপর্যয়ে বীর স্বামী যেন হতাশায় চুরচুর না হয়ে যান, তার জন্য রোমক নারীরা লিঙ্গ পূজা করতেন।

ক্রমে দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিবর্তন আসে। তখন লিঙ্গদেবতাকে নিছক যৌনতার প্রতীক বলে মনে করা হল না। কাচের পৃথিবীতে মনুষ্য জীবন অতীব ভঙ্গুর ও কণ্টকাকীর্ণ। লিঙ্গদেবতা তুষ্ট হলে তিনি তাঁর অনুগত ও পোষ্য নর-নারীদের দুঃখ ও বিপদ থেকে রক্ষা করবার ব্যবস্থা করবেন।

সেমিটিকরা পুরুষাঙ্গ ও যোনি উভয়ের উপাসক ছিলেন। সর্পকে প্রাচীনকালে থেকে যৌনতার জোরালো প্রতীকরূপে গণ্য করা হচ্ছে। সর্পদর্শন মানে অচিরে যৌন মিলনের বার্তা বয়ে আনতে পারে কোন ইষ্টিকুটুম পাখির মিষ্টি মধুর ডাক।

ফ্রয়েডও বলেন, সর্প হল পুরুষ যৌনাঙ্গের প্রতীক—যা সৃষ্টির প্রয়োজনেই উত্থিত হয় ও কিছুক্ষণের জন্য যেন সূর্যের তাপ লাভ করে।

প্রায় সকল ধর্মই বলে, নৈঃশব্দের দৃষ্টিকারী ফলন্ত বৃক্ষ যৌনমিলনের পরিণতিকে ইঙ্গিত করে। কোলাহলের বাইরে নিভৃতে ঘূর্ণায়মান জগত থেকে যেন একটু দূরে সরে গিয়ে নর-নারীর হৃদয়গত প্রেম শরীরী প্রেমের পুষ্করিনীতে তরঙ্গ তুলবে, অনুরাগে রঞ্জিত সেই মিলনে সৃষ্টিধারা অক্ষুণ্ণ থাকবে এবং এই নিয়ে ক্রোধ ও আক্ষেপ অনুচিত।

এইরূপ নিভৃত প্রেমের ফসল হেলেন। হোমার এখান থেকে তাঁর কাব্যের রসদ সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু সকল গ্রীক এপিক একই তথ্য পরিবেশন করছে না। হেলেন আসলে কাদের সন্তান, তা নিয়ে মতভেদ থাকবেই। Cyclic Epics-এর শিরোমনি Cypria বলছে, দেবতা জিউস দেবী নেমেসিসের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। সেই কারণে নেমেসিসের গর্ভজাত কন্যাই হল হেলেন।

জিউস যেমন প্রেমের সুযোগ এলেই একেবারে আত্মভোলা, দেবী নেমেসিস কিন্তু তা নন। তাঁকে সকলে ভয় পায়। নেমেসিসের ইচ্ছেয় কার যে কখন ভাগ্যবিপর্যয় ঘটবে, বলা মুশকিল। খুব দাপুটে ও সফল মানুষের কপালেও জুটতে পারে নিগ্রহ। হয়তো যেন সেই কারণেই নেমেসিস কন্যা হেলেন হয়ে উঠলেন ট্রয়ের ধ্বংসের কারণ।

Cyclic Epic সাইপ্রিয়া [Cypria]-র রচনাকাল সম্পর্কে সকলে একমত নন। তবে মোটামুটিভাবে ধরে নেওয়া যায়, যীশুর আবির্ভাবের সাতশত বৎসর পূর্বেও গ্রীসে যেরকম নান্দনিক লোকবর্তিকা প্রজ্বলিত ছিল তাতে ওই কাব্যের রচনাকাল হিসেবে সেই সময়কে বেছে নেওয়া যায়।

সাইপ্রা বলছে, কিছুটা চঞ্চলা ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির দেবী নেমেসিস প্রথমে জিউসের প্রেম নিবেদনে সম্মতি দেননি। কিন্তু জিউস প্রেমে পরাজিত হবার পাত্র নন। নিজের তারুণ্য ও সৌন্দর্যকে তিনি নানাভাবে বিকশিত করতে থাকেন নেমেসিসকে আকৃষ্ট করতে। এ যেন ছিল কবিগুরুর বর্ণনায় ঃ

দেহে আর মনেপ্রাণে হয়ে একাকার একি অপরূপ লীলা এ অঙ্গে অমার।
একি জ্যোতি, একি ব্যোম দীপ্ত দীপ জ্বালা দিবা আর রজনীর চির নাট্যশালা।

প্রেমের নিটোল সাধক জিউসের হাত থেকে রেহাই পেতে দেবী নেমেসিস নানারকম পশুর ছদ্মবেশ ধারণ করেন। এমন সমস্ত অঙ্গভঙ্গী ও আচরণ করতে থাকেন, যাদের অনুষঙ্গী নারীসুলভ নয়। তথাপি জিউসের প্রেমস্তোত্র অনর্গল। তিনি দিগ্‌ভ্রান্ত হবেন না। দেব-দেবীর প্রেমের এমত বিবলিওগ্রাফি বেশ আকর্ষক।

নেমেসিস শেষ পর্যন্ত রাজহংসীর রূপ নিয়ে উড়াল দিলেন। জিউস আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রত্যক্ষ করলেন সেই স্বর্ণবর্ণা রাজহংসীকে। হতাশার পরিবর্তে তাঁর জেদ ও ঝোঁক গেল আরও বেড়ে। পলায়ন করবার চেষ্টাটাই যে নেমেসিসের অবিমৃষ্যকারিতা—এটা জিউস এবার প্রমাণ করে ছাড়বেন। তিনি তখন স্বয়ং নিজেকে রূপান্তরিত করলেন এক অপূর্ব দর্শন রাজহংসে। উড়ে চললেন রাজহংসীরূপী নেমেসিসের পিছন পিছন।

নেমেসিসের এবার হার মানতেই হল। প্রেমেরও উন্মেষ ঘটে তাঁদের মধ্যে। স্বল্পপ্রসু বাধাদানের পর নেমেসিস জিউসকে সুযোগ দিলেন তাঁর দেহ উপভোগ করতে। সেই মিলনের ফলে গর্ভবতী হয়ে পড়েন নেমেসিস। বিনা পীড়ায় নির্দিষ্ট সময়ে একটি ডিম্ব প্রসব করলেন। সেই ডিম্ব থেকেই বেরিয়ে আসে শিশু হেলেন। সেই ডিম ও তা থেকে হেলেন—কাহিনিতে পৌনঃপুনিকতার ক্লান্তি এসে যাচ্ছে। সাইপ্রায় ঘটনাটাকে আরও খানিক টানা হয়েছে। একজন মামুলী পশুপালক ডিমটি কুড়িয়ে পান ও সেটিকে তুলে দেন রানী লীডার হাতে। অর্থাৎ লীডার সঙ্গে জিউসের গোপন উদ্দীপক অবৈধ ও আপসহীন দৈহিক প্রেমের যে বর্ণনা আমরা অন্যত্র পেয়েছি, তাকে তাহলে বিস্মৃতির অন্ধকার আধারে লুকিয়ে রাখতে হয়।

দুই কবি পেসিউড এরাসৌফিনিস ও অ্যাসেলপেডিসও লিখেছেন যে, প্রেমের সবচেয়ে উত্তেজক ও উপযোগী ক্ষেত্র প্রস্তুত করে ডিউস ও নেমেসিস মরাল-মরালীর ছদ্মবেশ ধারণ করেন। গড়ে তোলেন প্রেমে ও কামে টইটম্বুর অর্ন্তভুবন। আকাশে বহুক্ষণ পরিক্রমা সাঙ্গ হলে নির্জন গিরিকন্দরে তাঁরা মিলিত হলেন।

প্রাচীন গ্রীকদের ধর্মবিশ্বাস ও মনোভঙ্গির সঙ্গে ডিম্বের সম্পর্ক বেশ নিগূঢ়। যীশুর আবির্ভাবের দু'শ বছর পরেও স্পার্টার প্রায় প্রতিটি বড় বড় মন্দিরের শীর্ষে শোভা পেত একটি করে ডিম্বাধার—এ এমন এক প্রতীক, যা নর ও নারীর মিলনকে চিহ্নিত করে।

তিন দেবীর প্রতি অপরাধে অপরাধী যাঁরা

সীতা, রাম, রাবণ, দ্রৌপদী, জিউস, নেমেসিস, লীডা, হেলেন, জনক সকলেই যেন মানব-মানবী। মানুষী-মানুষ এসেছে আদি মানব মনুর সুবাদে। মনু তাঁর রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন সরস্বতী ও দুষদ্বতী নদীর মধ্যবর্তী সমতলভূমি ব্রহ্মবর্তে।

মনুর কন্যা দেবদ্যুতি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন প্রজাপতি মুনিপ্রবর কন্দর্পের সঙ্গে। পরে দেবদ্যুতির গর্ভে কন্দর্পের ঔরসে জাত নয়টি সুলক্ষণার বিবাহ হয় ব্রহ্মার পরিবারে।

এইভাবেই পৃথিবীব্যাপী মনুষ্যজাতির বংশবিস্তার। কোনও কোনও বংশের পুরুষ বা নারী যেন সৃষ্টিতে সাইক্লোন আনেন। বহুজনের মধ্যেও তাঁরা সবিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণকারী। তাঁদের কপালেই অমরত্বের জয়টীকা।

নিমজ্জমান গাথা থেকে এরকমই তিন নায়িকাকে তুলে এনে এই গ্রন্থকে স্মরণীয় করে রাখবার প্রয়াস। তার আগে স্বাভাবিক তাগিদ সীতা তথা দ্রৌপদীর আবির্ভাবের পূর্বে এই দেশে যে সকল মহান ব্যক্তিত্বের কীর্তি অসাধারণত্ব পেয়েছে কাব্যে-গাথায়, তাঁদের মধ্যে কয়েকজনকে তুলে আনা—যাঁদের মধ্যে সীতার পিতা জনক যেমন রয়েছেন, তেমনি রয়েছেন সীতার অপহরণকারী রাবণের কিছু কীর্তিকলাপ ও চরিত্র বিশ্লেষণ। রয়েছেন পাণ্ডবদের পূর্বপুরুষ ভগীরথ—যাঁর পূণ্যকর্মে সগর রাজার ষাট হাজার পুত্রের পরিত্রাণ। আছে কপিলমুনির ভূমিকা.....অষ্টবক্র মুনির আশ্চর্য জীবন।

এঁদেরকে বাদ দিয়ে সীতা দ্রৌপদী হেলেনের আলোচনায় ঢুকে পড়াটা হবে অযাচিত কর্ম।

মনু ও তাঁর স্ত্রী শতরূপার গায়ের রং ছিল গৌর। কিন্তু পৃথিবীর অর্ধেকের বেশি মানুষ কৃষ্ণবর্ণ কেন?

এর উত্তরে জানাতে হয়, সূর্যের অনাদি তেজের প্রভাবে মনুর এক কন্যা দেবদ্যুতির ত্বক কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। দেবদ্যুতির গর্ভজাত পুত্র-কন্যারাও আর গৌরবর্ণ থাকেন না। তদুপরি এক-একটি স্থানের আবহাওয়ার প্রগাঢ় প্রভাবে সেখানকার বাসিন্দাদের ত্বকের বর্ণ প্রভাবিত হয়। গাত্রবর্ণ নিয়ে অধিকাংশ মানুষের যে বিরতিহীন অহমিকা, তা নিছকই ক্ষুদ্রতা ও মূর্খতার পরিচয়।

দেবদ্যুতির স্বামী কন্দর্প ছিলেন অত্যন্ত রূপবান, গৌরতণু। তাঁদেরই সন্তান মহাজ্ঞানী তন্ত্রস্বর কপিল।

কপিলের যখন শিশুবয়স, তাঁর মাতুল প্রিয়ব্রত তখন বিশ্বকে শাসন করছেন। তাঁর ন্যায়বোধ ও নিষ্ঠা প্রশ্নাতীত। তাঁর বিহঙ্গদৃষ্টিতে কোনও অনাচার ধরা পড়লেই তিনি তার প্রতিকারে তৎক্ষণাৎ ব্রতী হন। তিনি শাসনকর্মে সুবিধার জন্য বিশ্বকে সাতটি দ্বীপাঞ্চলে বিভক্ত করেছিলেন। সেই সাতটি দ্বীপের নাম জম্বু, পুক্ষ, পুষ্কর, ক্রৌঞ্চ, শক, শাল্মলী ও কুশ। আজকের পৃথিবীতে তারাই সাতটি দ্বীপ—এশিয়া, আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ, আন্টার্কটিকা এবং অস্ট্রেলিয়া-ওশেনিয়া।

দেবদ্যুতি একে একে নয়টি কন্যারত্নের জন্ম দিয়েছিলেন। নয়টি কন্যার জনক হবার পর ঋষির মনে আবার ফিরে এল সংসার বৈরাগ্য।

একথা জানতে পেরে দেবদ্যুতি খুব বিচলিত। স্বামীকে বললেন, 'এই নয়টি কন্যাকে সুপাত্রস্থ করতে হবে। তাছাড়া আমাদের একটি সুপুত্রেরও দরকার।'

কন্দর্প বললেন, 'তুমি পুত্রবতী হবে। তোমার সেই পুত্র হবে অসাধারণ পণ্ডিত ও বহু গুণে গুণান্বিত।

অতঃপর ব্রহ্মা ও নারদের সহায়তায় উক্ত নয় কন্যাকে সৎপাত্রে সমর্পণ করা হল। নয় কন্যার নাম কলা, অনুসুয়া, শ্রদ্ধা, হরিভু, গতি, ক্রিয়াদেবী, খ্যাতি, অরুন্ধতী ও শান্তা।

আর এই কন্যাদের একে একে যে সকল ঋষিদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল তাঁরা হলেন মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, হরির্ভু, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু ও বশিষ্ট।

কন্দর্প ও দেবাদ্যুতির পুত্ররূপে জন্মালেন কপিল। কপিলের জন্মের পর কন্দর্প সংসার ত্যাগ করলেন।

একদিন দেবদ্যুতি দেখে স্তম্ভিত হলেন যে, তাঁর পুত্রর শরীর থেকে অদ্ভুত এক দ্যুতি নির্গত হচ্ছে। জননী হয়েও দেবদ্যুতি পুত্র কপিলকে প্রণাম করে বললেন, 'তুমিই পরমেশ্বর। আমাকে সাংসারিক ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্ত করো।'

কপিল স্মিত হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে মৃদুস্বরে বললেন, 'মা, আমি তো তোমাতেই অবলম্বিত। তুমি না থাকলে আমি কে? মানুষ বিশ্বাস করে, জীবনে চলার পথে প্রত্যেকেরই দুঃখলাভ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু আমি বলি, এই ক্লেশ থেকে মুক্তি আসতে পারে আত্মনিষ্ঠ যোগের মাধ্যমে।.....মা, মনুষ্যত্বের

উন্মেষ ঘটে সাধুসঙ্গের প্রভাবে। সকল মানুষেরই উচিত সাধুদের কাছাকাছি থাকা। কিন্তু প্রকৃত সাধু বড় বিরল।.....'

জ্ঞানসমুদ্র মন্থনকারী কপিল তাঁর জননী দেবদ্যুতিকে যত রকম বিষয়ে বিশ্লেষণ করে শোনান, তা মানবসভ্যতার অমূল্য সম্পদ।

কপিল খুব কম বয়সেই গৃহত্যাগ করলে দেবদ্যুতির আর প্রাণধারণের ইচ্ছা রইল না। তপস্যার মধ্যে দিয়েই তাঁর পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটে।

কিশোর কপিল হিমালয়ের সেই এলাকায় এসে হাজির হলেন, আজকের দিনে যা ডুয়ার্স নামে পরিচিত।

কেমন দেখতে ছিলেন কপিল মুনি?

তাঁর রূপের কিছু বর্ণনা দিচ্ছি। দেহের গঠন বিশাল ও সেই বিশালত্ব যেন সদর্থক, ইতিবাচক কর্ম সম্পাদনের জন্য। তিনি মহাশক্তির প্রতিভূ। খুব বড় বড় চোখ, কিন্তু দৃষ্টিতে গভীর প্রশান্তি। সর্বক্ষণই ক্ষমাসুন্দর তাঁর মুখোভাব। ত্বক অতীব মসৃণ, কাঞ্চনবর্ণ। তাঁর দীর্ঘ ও সবল গ্রীবা দর্শনে অনুমান করা যেত, এই মুনির অন্তর্নিহিত শারীরিক শক্তিও কত প্রবল।

হিমালয় পরিক্রমণ সমাপ্ত করে কপিল সমতলে নেমে এলেন। তারপর নদী ও সমুদ্রের মিলনস্থল খুঁজতে খুঁজতে একসময় উপস্থিত হলেন সাগরদ্বীপে। তিনি বুঝতে পারলেন, এই স্থানটি মানুষের সংকটমোচনের তীর্থে পরিণত হবার যোগ্য।

জম্বুদ্বীপের পূর্বপ্রান্তে ওই অপরূপ সাগরবেলায় কপিল তাঁর আশ্রম স্থাপন করলেন ও সেখানে যোগসাধনায় অতিবাহিত করলেন শত শত বৎসর।

এই কপিলের সঙ্গে রাক্ষসরাজ রাবণের বিরাট সংঘর্ষ হয়েছিল। সেই রাবণ—যিনি পরবর্তীকালে সীতকে অপহরণ করেন। রাবণের যেমন দাপট, তেমন অহঙ্কার। তদুপরি ব্রহ্মার বরে প্রায় অমর হবার সুবাদে তিনি সুযোগ পেলেই হাতে মাথা কাটতে চান বিরোধীর।

রাবণ সদলে এলেন সাগরদ্বীপ বেড়াতে। তিনি ভেবেছিলেন, সাগরদ্বীপ সমেত এই সমগ্র ভূখণ্ডটিকে তিনি অধিকার করে নেবেন। এখানে যে বিরাট কোনও শক্তিমান পুরুষ থাকতে পারেন, রাবণের কাছে তা ছিল অকল্পনীয়।

হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ তিনি দেখলেন, অদূরে পর্বতপ্রমাণ চেহারা নিয়ে এক ব্যক্তি ধ্যানমগ্ন অবস্থায় বসে আছেন। তাঁর বয়স যে কত, অনুমান করা কঠিন।

রাবণ বুঝলেন, ইনি অবশ্যই একজন মুনি। মুনি মনে হতেই রাবণের ভেতর উৎকট উল্লাস জাগে। তিনি মুনি-ঋষিদের হেনস্থা করতে পারলে আনন্দ পান।

তবে কপিলকে দেখে এই প্রথম রাবণের মনে হল, ইনি আর পাঁচজন সাধারণ মুনির মতন নন। এঁর শক্তি আছে, তেজ আছে। অর্থাৎ রাবণ তাঁকে শারীরিকভাবে আঘাত করে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারেন। তাঁর আরও মনে হল, জম্বুদ্বীপের পূর্বাঞ্চলে এত দিনে তিনি একজন সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে আবিষ্কার করতে পারলেন। ওই বিপুলদেহী তপস্যারত মানুষটার মধ্যে এমন সমস্ত উপকরণ তিনি দেখতে পাচ্ছেন, একজন সাধারণ ঋষির ক্ষেত্রে যা অলভ্য।

ইত্যাকার উপলব্ধিতে অনুপ্রাণিত রাবণের অন্তরে রণসাধ প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে। তিনি কপিলের সামনে গিয়ে দুই পা দিয়ে মাটিতে এমনবাবে আঘাত করলেন যে সেই দ্বীপভূমি কেঁপে ওঠে। চিৎকার করে বললেন, 'এই যে মুনি, চোখ খুলে দেখ তোর সামনে কে এসে দাঁড়িয়েছে। আমি হলাম সেই শক্তি, যার পদভারে সৃষ্টি স্থিতি লয় ত্বরান্বিত হয়। তুই কে, পরিচয় দে। আমার সামনে আর কপট ধ্যানের দরকার নেই, যেহেতু এবার থেকে তুই আমারই সাধনা করবি।'

তথাপি কপিল নিরুত্তর। কিন্তু তিনি এর আগেই মনোশ্চক্ষে দেখতে পেয়েছিলেন, আত্মপ্রশংসায় ডগমগ রাবণ এই দ্বীপেই আসছেন হানা দিতে। অবধারিতভাবেই ওই রাক্ষস আজ কপিলের কাছে বাহুবলের পরিচয় দিতে চাইবেন।

রাবণের পুনঃ পুনঃ হুঙ্কার শেষাবধি প্রত্যক্ষ আক্রমণে রূপান্তরিত হবার আগে কপিল চোখ মেলে তাকালেন। রাবণও তাঁর রোষ কষায়িত দুই চোখ রাখলেন কপিলের মুখের ওপর। ঋষির দৃষ্টি থেকে যাবতীয় প্রশান্তি ভাব অন্তর্হিত হয়। ক্রোধ ও ঘৃণা বিজড়িত সেই দৃষ্টির তীব্রতায় রাবণ কেমন যেন বিভ্রান্ত বোধ করেন—ঠিক যেন এক ভুলভুলাইয়ে পথ রারিয়ে ফেলেছেন লঙ্কেশ্বর।

কপিল উঠে না দাঁড়িয়ে বসে বসেই দাঁতে দাঁত ঘর্ষণ করে বললেন, 'রাবণ, তোর বড় অহঙ্কার রে। তাই তোর পতন কেবল সময়ের অপেক্ষা। এই অহমিকা একদিন স্বজন হারাবার বিষাদ ও হাহাকার ডেকে আনবে তোর জীবনে। ক্ষমতার অহঙ্কারে যার সনাতন মূল্যবোধ বিনষ্ট হয়, তার মতন আহম্মক করুণার অযোগ্য।'

ক্ষিপ্ত রাবণ কপিলকে আক্রমণ করলেন। কিছুক্ষণ নিষ্কল্প স্থির অবস্থায় থেকে কপিল যেন রাবণের প্রারম্ভিক প্রহারগুলিকে উপভোগ করলেন। তারপর উঠে দাঁড়ালেন। নিসর্গেরই নানান উপাদানে যেন গঠিত তাঁর অতিশয় বৃহৎ বপু। তাঁর অতি প্রাচীন দেহ থেকে যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে। বজ্রসম দুই বাহু দ্বারা আঁকড়ে ধরলেন রাবণকে। প্রায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসে লঙ্কেশ্বরের। কপিল তাঁকে দু'হাতে মাথার ওপর তুলে সবেগে নিক্ষেপ করলেন ভূমিতে।

ওই এক আঘাতেই দর্পচূর্ণ। তিনি কল্পনা করতে পারেননি, ঋষির শরীরে অযুত হস্তীর বল।

হতচেতন রাবণের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করেই মুনি বড় বড় পা ফেলে অদূরে অবস্থিত পাতালে প্রবেশ করলেন। এর আগে কিশকিন্ধ্যার অধিপতি বালির হাতেও রাবণকে খুব হেনস্থা হতে হয়। তথাপি সীতার অপরহরণকারী রাবণের চরিত্রচিত্রণে শুধুমাত্র কলঙ্কের দিকটাই দেখালে চলবে না। রাবণ রাজা অথবা প্রশাসকরূপে বরণীয় ব্যক্তিত্ব। স্বদেশ ও প্রজাদের রক্ষাকল্পে তাঁর শক্তি নিয়োজিত। মৃত্যুর পূর্বক্ষণে তিনিই রামকে বলে যান, একজন শাসক 'কীভাবে চললে সফল ও প্রাণবন্ত অবস্থায় থাকতে পারেন। অন্যদিকে রামায়ণের দুষ্ট চরিত্র হিসেবে রাবণ কোনও পক্ষপাতিত্ব দাবি করতে পারেন না। এ যেন এক ব্যক্তিত্বের অভ্যন্তরে ভালো ও মন্দ একে অপরের সম্পূরক। রাবণ কেন সীতাকে অপহরণ করেছিলেন, তার পিছনে রয়েছে মুখ্যত দুটি কারণ। একটি প্রত্যক্ষ, অপরটি অপ্রত্যক্ষ।

প্রত্যক্ষ কারণ, রাবনের ভগ্নী সুপর্ণখার চূড়ান্ত হেনস্থা রাম-লক্ষণের হাতে।

অপ্রত্যক্ষ কারণ, নারী বিশেষত সুন্দরী পরস্ত্রীকে ভোগ করবার পুরানো বাসনা লঙ্কেশ্বরের।

দ্রৌপদীকে কেন দুর্যোধন চূড়ান্ত লাঞ্ছনার পথে টেনে নিয়ে যান, তার পিছনেও রয়েছে একাধিক ঘটনা ও বাস্তবনিষ্ঠ প্রতিক্রিয়া—যার পর্যালোচনা পরবর্তী পর্যায়ে করা হবে। হেলেনকে নিয়ে প্যারিস কেন পলায়ন করলেন, তারও নানা কিসিমের ব্যাখ্যাকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

তার আগে সগর রাজার ষাট হাজার পুত্রকে কপিল মুনি কীভাবে ভস্মীভূত করেছিলেন, সেই কাহিনিকে ছুঁয়ে যেতেই হচ্ছে। আসলে সব

রাজা-মহারাজারাই দাপট দেখাতে ভালোবাসেন। এই বিষয়ে রাবণের সঙ্গে সগররাজার বা সগররাজার সঙ্গে সীতার পিতা জনকরে প্রভেদ বা কতটুকু ?

সগররাজা উদ্যোগ নিলেন, অশ্বমেধ যজ্ঞ করবেন। এই উদ্দেশ্যে একটি আশ্চর্য সুন্দর অশ্বকে যজ্ঞীঅশ্বরূপে নির্বাচিত করা হল।

কিন্তু সগর রাজার আস্তাবল থেকে হঠাৎ উধাও হয়ে গেল সেই অশ্ব। অধিকাংশের অভিমত—সম্রাট সগরকে অপদস্থ করবার এ এক গভীর চক্রান্ত। কোনও এক ঈর্ষান্বিত শক্তিমান তস্করকে কাজে লাগিয়ে পূত অশ্বটিকে অপহরণ করেছেন অশ্বের ভূপর্যটন শুরু হবার আগেই।

বিস্তর সন্ধানের পরও যখন যজ্ঞীঅশ্বের কোনও হদিশ মিলল না, রাজা সগর তাঁর ষাট হাজার পুত্রকেই এক সঙ্গে নিয়োগ করলেন অপহৃত অশ্বটিকে খুঁজে বের করতে।

আসলে এভাবেই সূচিত হল সগরবংশের বিলোপন-প্রক্রিয়ার।

আসমুদ্র হিমাচল ভারতভূমির সর্বত্র চিরুনি তল্লাশি চালিয়েও সগর রাজার পুত্ররা সেই অশ্বের সন্ধান পেলেন না। এই ব্যর্থতা তাঁদের প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত করে তোলে।

আদত ঘটনা হল, অশ্বটি নিজেই সগর রাজার আস্তাবল থেকে নির্গত হয় ও একাকী বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড অতিক্রম করে।

তার পরিপার্শ্বে বিবিধ প্রকার ভীতিপ্রদ পরিস্থিতি থাকলেও সে আত্মগোপনে সমর্থ হয়। শত যোজন পথ অতিক্রম করত সে উপস্থিত হয় সাগরদ্বীপে। আশ্রয় নিল পাতালে। কপিলমুনির আশ্রমে। মুনিও এই সুন্দর অশ্বটির লালন-পালনের সুবন্দোবস্ত করলেন।

ষাট হাজার রাজপুত্র যজ্ঞীঅশ্বের সন্ধানে ব্যর্থ হয়ে অত্যন্ত বেপরোয়া ও বিবেকচ্যুত। তাঁরা যেন ভুলে গেছেন ন্যূনতম সৌজন্যবোধ ও জীবনাদর্শ। তাঁরা তাঁদের চলার পথে যথেচ্ছ বৃক্ষনাশ করতে থাকেন। তাঁদের হাতে নিহত হল এক একটি ব্যাসার্ধের মধ্যে অবস্থানরত বহু জীব-জন্তু।

তাঁদের ওই বিকট কর্মকান্ডে বিচলিত স্বর্গের দেব-দেবীরা। সগর বংশের হাতেই সৃষ্টি ও স্থিতির বিনাশ ঘটতে চলেছে যে!

দেবতারা তখন সমবেতভাবে উপস্থিত হলেন প্রজাপতি ব্রহ্মার সমীপে। জ্ঞাপন করলেন তাঁদের আবেদন ঃ সগর রাজার ষাট হাজার পুত্র যজ্ঞীঅশ্বের সন্ধানে নিযুক্ত করার পর যে প্রকার তাণ্ডব করে বেড়াচ্ছে, তাতে জীবকূল ধ্বংস হবার পথে। প্রাণীজগতে দুর্দশার আর অন্ত নেই।

এই দুষ্কর্ম অব্যাহত থাকবার অর্থ কালেরও গতিরোধ। তাই আপনার হস্তক্ষেপ আশু কাম্য।

ব্রহ্মা আশ্বস্ত করলেন, 'সগরের পুত্ররা তাদের কৃতকর্মের শাস্তি পাবে। আপনাদের বিচলিত হবার কারণ দেখি না। কাল নিরবধি। আরও অনেক অনেক কিছু ঘটবে। এমনকি আমারই উপাসক রাবণ তাঁর চরিত্র দোষ ও নারী অপহরণের অপরাধে নিঃশেষ হয়ে যাবে। তারপরও কালচক্র ঘুর্ণায়মান থাকবে এটাই প্রমাণ করতে যে ন্যায় ও সত্যের পথে যারাই প্রতিবন্ধক হবে, তাদের বিনাশ অনিবার্য।'

ব্রহ্মার এই কথার মধ্যে নিহিত যুগপৎ রামায়ণ ও মহাভারত। ঘটনার মধ্য দিয়ে ন্যায় ও সততার প্রতিষ্ঠা ভারতীয় মহাকাব্যদ্বয়ে যতখানি স্পষ্ট, গ্রীক মহাকাব্যে ততটা নয়। সেখানে মুখ্যত নেমেসিস অর্থাৎ দুর্ভাগ্যের ছোবলই প্রাধান্য পাচ্ছে। সীতা ও দ্রৌপদীর অবস্থানের পশ্চাতে সত্য ও নীতির যে জোরালো প্রভাব, হেলেনের ক্ষেত্রে তার স্পষ্টতই অভাব। তবে সাদৃশ্যও অনেক—যার আলোচনা পরবর্তী পর্যায়ে এসে যাবে।

যাই হোক, অচিরে সগর রাজার ষাট হাজার মূঢ় সন্তান সাগরদ্বীপে অনুপ্রবেশ করলেন। দাপিয়ে তাঁর কপিলমুনির আশ্রমেও ঢুকে পড়লেন ও দেখতেও পেলেন তাঁদের হারানিধি যজ্ঞাশ্বটিকে।

রাজপুত্ররা মুহূর্তে সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন, অশ্ব অপহরণের মূল নায়ক এই পাতাল আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা বিপুলদেহী ঋষি কপিলমুনি। অশ্বটি বিরল প্রজাতির, অতীব মনোহর ; তাই লোভের বশবর্তী হয়ে এই দুষ্কর্মটি করেছেন।

জ্বলন্ত ক্রোধে তপ্ত ষাট হাজার তরুণ একযোগে ধেয়ে গেলেন কপিলকে আক্রমণ করতে। তবে মহাতপস্বীর অঙ্গে আঘাত হানা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তপঃশক্তিই তাঁদের গতিরুদ্ধ করে। তখন পশলা পশলা বৃষ্টির মতন কপিলের উদ্দেশ্যে বর্ষিত হতে থাকে সগরপুত্রদের মুখ-নিসৃতঃ অকথনীয় অসহনীয় কটুকাটব্য।

কপিল কিন্তু সেই কালেও প্রমাণ করে যাচ্ছেন যে তিনি কতখানি সহিষ্ণু ও ক্ষমাসুন্দর।

কিন্তু ক্রোধে অন্ধ রাজপুত্রদের কাছে ওই সহিষ্ণুতা মূল্যহীন। তাঁদের কুৎসিত কোলাহলে মুখরিত আশ্রম। মুনির চরিত্র, তাঁর নিত্যনৈমিত্তিক কর্মধারা ও তাঁর পূর্বপুরুষদের কীর্তির প্রতি উচ্চারিত হতে থাকে অর্থহীন ধিক্কার।

কপিলের ধৈর্যের বাঁধ একসময় চূর্ণ হয়। ভীষণ ক্রোধে জ্বলে উঠলেন মহামুনি এবং তাঁর চক্ষু থেকে নির্গত অগ্নিতে মুহূর্তে ভস্ম হয়ে গেলেন সগররাজার ষাট হাজার পুত্র।

ওই চরম বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটে যাবার অনেক দিন পর বৃদ্ধ সগর রাজা তাঁর পৌত্র অংশুমানকে প্রেরণ করলেন নিখোঁজ ষাট হাজার পুত্রকে খুঁজে বের করতে।

পিতা ও পিতৃব্যদের সন্ধানে অংশুমান তাবৎ ভূখণ্ড পরিভ্রমণ করে পরিশেষে উপস্থিত হন কপিলমুনির আশ্রমে।

মুনির-মুখ থেকে সকল বৃত্তান্তই অবগত হলেন অংশুমান। আরও জ্ঞাত হলেন যে মা গঙ্গা এই স্থানকে প্লাবিত না করা অবধি তাঁর নিহত পিতা-পিতৃব্যদের পারলৌকিক কর্ম সম্পাদন করাও সম্ভব নয়। যদি করেনও, সেই ষাট হাজার আত্মার মুক্তি ঘটবে না।

অতঃপর অংশুমান বহুজনের দ্বারে দ্বারে আবেদন নিয়ে ঘুরলেন—আপনারা কৃপা করে মা গঙ্গাকে এই ধরাধামে আনয়নে ব্রতী হন।

কিন্তু তাঁদের সকলের পক্ষেই ওই কর্ম করাটা ছিল সাধ্যাতীত। অংশুমানের পর সেই দায় এসে বর্তাল তাঁর পুত্র দিলীপের ওপর। অনেক চেষ্টা করে দিলীপও ব্যর্থ। দিলীপের পুত্র ভগীরথ। তিনি আর অন্যের দুয়ারে দুয়ারে না ঘুরে স্বয়ং তপস্যায় আসীন হলেন। যে তপস্যা যেমন কঠিন, তেমনি দীর্ঘ। তপস্যার প্রভাবে তুষ্ট হলেন তাবৎ দেব-দেবী। স্বয়ং গঙ্গাও বিচলিত। ভগীরথের মনেবাসনা পূর্ণ করতে তিনি শিবের জটা বেয়ে নেমে এলেন মর্তে। তারপর ভগীরথ প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে প্লাবিত করলেন কপিলমুনির আশ্রমকেও। এইভাবেই মুক্তি এল সগররাজার ষাট হাজার পুত্রের বিদেহী আত্মাদের।

তিন কন্যার তূল্যমূল্য আলোচনাকে বিস্তৃততর করবার জন্যই একটি বৃহৎ সময়ের পটভূমিকে টেনে আনছি। ওই প্রেক্ষাপটে ভগীরথ কর্তৃক গঙ্গা আনয়ন যেমন গুরুত্বপূর্ণ, কপিলমুনির হাতে রাবণের নাকাল হওয়াটা যেমন আগামী দিনের দিশানির্দেশক, তেমনি জরুরি অষ্টাবক্র মুনি ও রাজা জনক সম্পর্কে আলোকপাত করা। এই স্তরগুলি অতিক্রম করবার পর তিন কন্যার বিবাহ পর্বে আমরা পদার্পণ করব। যদিও দুটি পৃথক দেশ ও ভিন্ন সভ্যতা, তবুও যেন মনে হয় এই তিন মহাকাব্যিক নায়িকার সূত্র ধরে গ্রীস ও ভারত যেন পরস্পর গভীর সখ্যতায় আবদ্ধ হয়েছে।

রাবণকে সংযত ও চরিত্রবান হবার পরামর্শ দিয়েছিলেন কপিলমুনি। কতগুলি অত্যাবশ্যক গুণ রয়েছে, যেগুলিকে অর্জন না করতে পারলে প্রচণ্ড সম্ভাবনাময় পুরুষও নিজের নিজের সর্বনাশকে ডেকে আনেন। উদাহরণ রাবণ ও দুর্যোধন। কিন্তু গ্রীক দর্শনে রয়েছে নিয়তির নিষ্ঠুরতা। সেখানে গুণবান হওয়া সত্ত্বেও মহান পুরুষের সর্বনাশ হতে পারে। উদাহরণ, ট্রয়ের রাজকুমার প্যারিস। তাই রাবণ ও দুর্যোধনের সঙ্গে এক পঙ্কক্তিতে প্যারিসকে বসাতে পারছি না।

কপিলের সাংখ্য দর্শনকে স্মরণ করি ঃ

সত্বরজস্তমনাৎ সমাবস্থা প্রকৃতি প্রকৃততোর্ম্মহান
মহতোহহঙ্কারাৎ পঞ্চতখাত্রানুন ভয়মিস্তিয়ং তন্মাত্রেভ্যঃ
স্থূল ভূতানি পুরুষ ইতি পঞ্চাবিংশতি গণৎ।

এই সূত্রে বলা হয়েছে, প্রকৃতি মূখ্যত তিনটি গুণের সহাবস্থান—সত্ব, রজঃ ও তমঃ। এরপরেই রয়েছে অহঙ্কার নিয়ে কপিলের ব্যাখ্যা। অহঙ্কারতত্ত্বের কার্য আবার দ্বিবিধ—পঞ্চতমাত্র এবং বাহ্য। পঞ্চতমাত্র গঠিত পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ।

বাহ্য ইন্দ্রিয় স্বতন্ত্র হয়ে আছে দ্বিবিধ অভিপ্রকাশে—জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়।

কর্মেন্দ্রিয় আবার পাঁচ প্রকার—বাক, হস্ত, পদ, লিঙ্গ ও গুহ্য।

বিবিধ পুরাকাহিনির কোনও কোনও অংশের উজ্জ্বল অধ্যায়ে এই সকল ইন্দ্রিয়ের কথা বর্ণিত আছে। ব্রহ্মাণ্ডে বিচরণশীল নীহারিকা গ্রহ-তারকার মতন মানুষের অভ্যন্তরে সক্রিয় এই সকল ইন্দ্রিয়।

জ্ঞানেন্দ্রিয়রও পাঁচটি অংশ—শ্রবণ, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা এবং ঘ্রাণ।

তদুপরি আন্তর ইন্দ্রিয়রূপে রয়েছে মন—যাকে বশে রাখা সবচেয়ে কঠিন।

সাকুল্যে এই পঁচিশটি ইন্দ্রিয়কে নিয়ে সবিস্তার আলোচনাই হল কপিলমুনির সাংখ্যতত্ত্বের মূল কথা। আমরাও এখানে চরিত্র বিশ্লেষণে সেই ছকটাকেই বার বার ব্যবহার করব।

সেই সময়ের পারিপার্শ্বকে চিত্রিত করতে গেলে দেখা যাবে, পর্বত ও গিরিশৃঙ্গগুলির মস্ত মহিমা রয়েছে ঘটনাপ্রবাহে। পৌরাণিক কালে রাজা-মহারাজাদের তুলনায় মুণিদের দাপট যেন একটু বেশিই ছিল। একজন মানুষ মুনি হতে পারতেন সাধনার মধ্য দিয়ে। তাঁরা তাঁদের সাধনার স্থান রূপে ভারতবর্ষের গিরিকন্দরগুলিকেই নির্বাচন করতেন। ভারতের দারিদ্র্যক্লিষ্ট

জনজীবনে যে মূল্যবোধ ঊষালগ্ন থেকে চলে আসছে, তার কোনও বৌদ্ধিক বিশ্লেষণের দরকার দেখি না।

সত্যি বলতে কি, আমরা ধারাবাহিকভাবে নিজস্ব পরিবেশ ও ঐতিহ্যের কাছে শিক্ষনবিশি করে থাকি।

প্রসঙ্গক্রমে এসে যায় মৈনাক পর্বতের কথা। মৈনাকে রয়েছে বিনশন নামক একটি স্থান। সেখানে একসময় কশ্যপ মুনির স্ত্রী অদিতি অনুপান করতেন তাঁর সন্তানের জন্য। অনাড়ম্বর কিন্তু খুব সুস্বাদু সেই রান্না। দ্রৌপদী তাঁর যে রন্ধনপটুত্ব অর্জন করেন, এর পিছনে হয়তো ছিল অদিতির রেখে যাওয়া রেসিপি। পঞ্চপাণ্ডবের যখন বনবাস চলছে, তখন সেই অনাড়ম্বর দিনগুলিতেও সামান্য উপাদানের সাহায্য অসাধারণ সমস্ত পদ রান্না করে খাওয়াতেন দ্রৌপদী। সীতার রন্ধনপটুত্বের কোনও বিবরণ আমরা পাই না। হেলেনেরও নয়।

যাই হোক, বিনশনের অদূরে কনখল। এবং কলখল থেকে হরিদ্বারের দূরত্ব নামমাত্র। হরিদ্বারের মাহাত্ম্যকে প্রসারিত করেছে প্রবমানা মা গঙ্গা।

ওই গঙ্গাতীরেই কুটির বেঁধে বসবাস করতেন এক সংসারি তপস্বী। নাম তাঁর কহোড়। তাঁর স্ত্রী সুজাতা যেমন বিদূষী, তেমনি সুন্দরী। গার্হস্থ্য জীবনে কহোড় প্রথমদিকে সুখীই ছিলেন। তিনি তো বিদ্বান কম নন। সংসারে প্রবেশের আগে ছিলেন ভূপর্যটকও।

ওই সময় একবার সপারিষদ রাবণকে দেখতে পেয়েছিলেন দূর থেকে। কহোড়ের তখন মনে হয়েছিল, এই অহঙ্কারী ও দৃঢ়চেতা রক্ষরাজটি নিজ দোষে প্রায় সকল স্বজনকে হারাবেন।

পরবর্তীকালে সুজাতাকেও কহোড় এই কথা বললে সুজাতা স্মিত হেসে বললেন, সম্ভবত রাবণ নারীঘটিত কোনও অপরাধের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলবেন। শক্তিমান ও কৃতি পুরুষদের যখন বিনাশ হয়, তার কারণ সন্ধান করলে এই রকমই একটা সত্য বেরিয়ে আসে।

নানা শাস্ত্র নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আলোচনা। এ ছাড়া কহোড় ছাত্রও পড়াতেন। দূর-দূরাঞ্চল থেকে বহু ছাত্র আসত তাঁর কাছে পড়তে। কহোড়ের মতন শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি হরিদ্বারে দ্বিতীয় জন ছিলেন না।

সংসারি মুনি প্রতিদিন তাঁর জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধতর করেন। তবে একটু মেজাজি। আত্মসম্মানবোধটি অতীব ধারালো। কোনও ছাত্র-শিষ্যের ত্রুটি কিংবা অমনোযোগ ধরা পড়লে তিনি একেবারে অগ্নিশর্মা।

হুমকি-ধমকির শেষ নেই। ফলে শিক্ষকরূপে কহোড় মুনির খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

খ্যাতি সম্মান তৃপ্তি দিলেও যথার্থ সুখ দিতে পারছে না। ওই দম্পতির অন্তর্লীন জীবনে সুখের তুলনায় বিষণ্ণতা বেশি। পূর্ণতার পরিবর্তে শূন্যতার প্রাধান্য। দৃশ্যত কোনও হাস্যরস কিংবা কৌতুকজনক ব্যাপারে কহোড় দম্পতির সাড়া স্বতঃস্ফূর্ত নয়।

এর একমাত্র কারণ, এই দম্পতি সন্তানহীন। বছরের পর বছর অসংখ্য বার সম্ভোগ সত্ত্বেও সুজাতা যখন গর্ভবতী হতে পারলেন না, গভীর হতাশায় ডুবে গেলেন দু'জনই।

দোষটা কার ছিল, সে সম্পর্কে কোনও ইঙ্গিত আমরা পাই না। তবে একটা সময় দেখা গেল, হতাশা ও গ্লানিতে সুজাতার তুলনায় কহোড় অধিক আক্রান্ত। তিনি নিজেকেই এই অপ্রাপ্তির জন্য দায়ি করছেন এবং শেষাবধি সিদ্ধান্ত নিলেন, এ জীবন আর রাখবেন না।

তাঁর এই সিদ্ধান্ত ক্রমে প্রবল হয়ে ওঠে। এমনকী তাঁর আত্মহননের পর সুজাতার ভবিষ্যৎ কী হবে, তা নিয়েও মুনি তখন ভাবতে নারাজ।

কহোড় যখন আত্মহত্যা করতে চলেছেন, তখনই তাঁর কর্ণকুহরে ধ্বনিত হল দৈববাণী ঃ

হে মুনিপ্রবর কহোড়, এত বড় শাস্ত্রজ্ঞ হয়েও তোমার এমত প্রমাদ বিস্ময়কর। তুমি মনুষ্যজীবনের গুরুত্ব ও মহত্ব কী ভাবে বিস্মৃত হতে পারলে! এই জীবন যেমন পাত্রমিত্র সহযোগে আখের গুছোবার জন্য নয়, তেমনি নয় নিরাশার ছোবলে আত্মহননের পন্থাকে গ্রহণ করা।

আমরা অবশ্য তোমার নৈরাশ্যের হেতু যে কী, তা জানি। তুমি দেবাদিদেব শিবের আরাধনা কর। তোমার মনে কমবেশি যে বিভ্রান্তি এসেছে, তার অবসান ঘটবে। শিব তুষ্ট হলে তুমি তার কাছ থেকে পাবে এক বিশেষ মন্ত্রগুপ্তি। ওই মন্ত্র সঠিকবাবে উচ্চারণ করতে পারলেই আবির্ভূতা হবেন একজন বিশেষ দেবী। সেই দেবীর নিকট তুমি পুত্র প্রার্থনা করবে। এভাবেই পূর্ণ হবে তোমাদের শূন্যতা।'

দৈববানী শুনে কহোড় রোমাঞ্চিত। তখনই ঘরে ফিরে সুজাতাকে জানালেন দৈববাণীর সারমর্ম।

এবার স্বামী-স্ত্রী যুগ্মভাবে বসলেন শিবস্তুতিতে। শিব অল্প স্তুতিতেই তুষ্ট। কহোড় অনুভব করলেন, তাঁর চারিদিকে কী প্রাণবন্ত স্নিগ্ধ আলো—যে

আলোর পরশে জাগতিক অতৃপ্তি দূর হয়, মানুষ যুগপৎ শান্ত ও দৃঢ়চেতা হয়, ব্যাধিপীড়িত জীবনে নবশক্তি আসে ; জীবন যে অকিঞ্চিৎকর নয় তা অনুভূত হয়।

চোখ খুলে কহোড় মুনি দেখলেন, তাঁর সম্মুখে স্বয়ং শিব দণ্ডায়মান।

মুনি কহোড় দেখলেন শিবের প্রীত প্রশান্ত আনন।

শিব বললেন, কহোড়, আমি তোমার প্রার্থনায় তুষ্ট। তুমি তোমার মানসিক অস্থিরতাকে প্রশমিত কর।

আমি তোমাকে এমন একটি মন্ত্র প্রদান করব, যা তোমার আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করবে। তুমি ওই মন্ত্রের দ্বারা মহাদেবীকে তুষ্ট করবে। তখন মহাদেবীর আশীর্বাদে তোমাদের যে পুত্রসন্তান হবে, রূপে ও গুণে সে হবে একজন দেবতারই সমান।

শিব কহোড়কে মহামন্ত্র দিয়ে অন্তর্হিত হলেন। তবে ওই মন্ত্রের দ্বারা মহাদেবীকে তুষ্ট করবার সুযোগ লাভটাও সহজ হল না। আরও অনেক দিন ধরে মন্ত্রকে জপ করতে হল কহোড়কে। পরিশেষে তুষ্ট হলেন মহাদেবী। তাঁর আর্শীবাদে পুত্রের জনক হবার মতন শক্তি অর্জন করলেন কহোড়।

যথাকালে কহোড়ের স্ত্রী সুজাতা গর্ভবতী হলেন। কহোড় আবার শিক্ষকতার কাজে মন দিলেন। একদিন সকালে তিনি তাঁর ছাত্রদের শাস্ত্রবিদ্যা শেখাচ্ছেন, অদূরে শায়িতা তাঁর গর্ভবতী স্ত্রীও মন দিয়ে শুনছেন কহোড়ের শাস্ত্রব্যাখ্যা। কিন্তু কহোড়ের ব্যাখ্যায় কিছু সূক্ষ্ম ভুল ছিল।

তখন সুজাতা অনুভব করলেন, তাঁর গর্ভস্থ সন্তান কী যেন বলতে চাইছে। সুজাতা স্বামীকে কাছে ডেকে এনে বললেন, আমার গর্ভস্থ সন্তান তোমাকে কিছু বলতে চাইছে।

—কী বলতে চাইছে ?

—বলতে চাইছে, তোমার ব্যাখ্যায় কিঞ্চিৎ ভুল থেকে যাচ্ছে।

সুজাতার মুখে অনাগত সন্তানের এই অভিমত জেনে কহোড় নিজেকে খুবই অপমানিত বোধ করলেন। সুজাতার কথা দু-একজন শিষ্যও শুনতে পেয়েছিলেন। আত্মসম্মানে আঘাত লাগায় কহোড় দ্রুত অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠেন। সুজাতার গর্ভস্থ সন্তানকে উদ্দিষ্ট করে গর্জে ওঠেন, তুই এখনও ভূমিষ্ঠ হসনি। অথচ এরই মধ্যে পিতৃনিন্দায় দিব্যি পটু হয়ে উঠেছিস। আমাকে অপমান করলি। এর প্রতিফল তোকে পেতেই হবে। এই জগতসংসারে বিচরণকালে একসময় তোর শরীরে দেখা দেবে কুৎসিৎ সমস্ত বক্রতা। দেহের আটটি স্থান তাদের নিখুতত্ব ও সৌন্দর্য হারাবে।

হায় হায় করে উঠলেন সুজাতা। তুমি কেমন বাপ যে নিজের সন্তানের দোষকে ক্ষমা করতে পার না ? অথবা নিজ সন্তানের গুণকে ঈর্ষা কর ? ক্ষমা ও সহনশীলতা অন্তর সম্পদ হিসেবে যার ভেতর অভাব, তিনি আবার কেমন মুনি ? তোমার এত জ্ঞান-বিদ্যা বৃথা।

সুজাতা যতই তাঁর স্বামীর প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করুন না কেন, তখন আর কিছু করবার নেই। মুনির অভিশাপ যে অব্যর্থ।

যথাকালে কহোড় ও সুজাতার পুত্র জন্মগ্রহণ করল। অপূর্ব রূপ-লাবণ্যের অধিকারী শিশু। শারীরিক বিকৃতি বলতে কিছু নেই। আপাত খুশি কহোড় কিন্তু শঙ্কাকুল—আজ হোক, কাল হোক, এই সুদর্শন জাতক তার অঙ্গসৌষ্ঠব হারাবেই।

নবজাতকের নামকরণ হল সুব্রত। তার আর এক নাম দেবল। প্রায় জন্মক্ষণ থেকেই বিচ্ছুরিত তার অভাবনীয় স্মৃতি ও পাণ্ডিত্য। অতীতের কথা যেমন বলে, তেমনি ভবিষ্যতের কিছু দৃশ্যপটও এঁকে দেখায়। একদিন মাটিতে একটি আঙুল রেখে সে উচ্চারণ করল, সী-তা। আর এক দিন বহুদূরের কোনও কিছুকে ইঙ্গিত করে এমন এক শব্দ তুলল, যার অর্থ হুতাশন। অর্থাৎ সীতার কারণে লঙ্কায় আগুন—এটাই হয়তো বোঝাতে চেয়েছে। আগামীকালের চিত্রাঙ্কন শিশু দেবলের অন্যতম শক্তি। অবশ্য সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার এমত শক্তি প্রদর্শনের দৃষ্টান্ত হ্রাস পেতে থাকে।

শিশু বয়স অতিক্রম করে কৈশোরে পা রাখবার আগেই সুব্রত প্রত্যক্ষ করল প্রথম বিপর্যয়। হঠাৎ একদিন কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন তার বাবা কহোড় মুনি। কোথায় গেলেন তিনি ? বহুদিন প্রতীক্ষা করবার পরও তাঁর দেখা মিলল না।

অত্যন্ত বিমর্ষ বিপন্ন সুজাতা তাঁর শিশুপুত্রকে নিয়ে আশ্রয় নিলেন সুব্রতর মাতামহ উদ্দালোকের নিলয়ে।

ক্রমে জানা গেল, কহোড় মুনি কোথায় কেন কী অবস্থায় দিনাপিপাত করছেন। ততদিন সুব্রত কৈশোরের গণ্ডী অতিক্রমের পথে। মার মুখ থেকেই অবগত হলেন কহোড়-বৃত্তান্ত।

কহোড়ের গুণ যেমন অনেক, দুর্বলতাও যথেষ্ট। গর্ভস্থ সন্তানকে অভিশাপ দিয়ে তিনি তাঁর অসহিষ্ণুতার প্রমাণ রেখেছেন। বিত্ত ও খ্যাতির প্রতি তাঁর প্রবল আসক্তিরও প্রমাণ মিলল এবার।

সীতার যিনি পালকপিতা, সেই রাজা জনকের অনুগ্রহ লাভের জন্য তিনি

বিশেষ লালায়িত হয়ে ওঠেন। সংসার ছেড়ে উপস্থিত হলেন জনকের রাজসভায়। রাজার কাছে দাবি করলেন, আমিই ভূমণ্ডলের বিজ্ঞতম ব্যক্তি। তাই আপনার উচিত, আমাকে আপনার রাজসভায় শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের সম্মান ও পুরস্কার দেওয়া।

ওই এক কথাতেই বুদ্ধিমান জনক কহোড়কে চিনতে পারলেন। সুপণ্ডিত হলেও মুনির মনে অহঙ্কারের বীজ অনক দিন আগেই বপন করা হয়েছে। আত্মবিশ্বাস ও অহঙ্কার এক বস্তু নয়। ভাবপ্রবণতা ও অহঙ্কারও এক বস্তু নয়। অহঙ্কারের সঙ্গে আসে ঔদ্ধত্য। ঔদ্ধত্য প্রভূত সম্ভাবনাময় ব্যক্তিত্বকেও একটা সময় নিঃসহায় করে ছাড়ে। কহোড় এখন সেই পথেই এসে দাঁড়িয়েছেন।

জনক বললেন, মুনিবর, আমি আপনার পান্ডিত্যের খ্যাতি শুনেছি। কিন্তু আমার সভায় যে আর একজন মহাজ্ঞানী ব্যক্তি রয়েছেন। তাঁর নাম বন্দী। আপনি যদি বন্দীকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করতে পারেন, সভাপণ্ডিতের আসন ও মর্যাদা অবশ্যই আপনার প্রাপ্য হবে।

সুতরাং কহোড় বনাম বন্দীর তর্কযুদ্ধের আসর বসল জনক রাজার রাজসভায়।

কিছুক্ষণের মধ্যে কহোড় বুঝলেন, তিনি খুব কঠিন ব্যক্তির সঙ্গে জ্ঞানযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁর প্রতিটি প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর কোনও প্রকার আতিশয্য ছাড়াই দিয়ে চলেছেন বন্দী। কিন্তু বন্দী যখন প্রশ্ন করতে শুরু করলেন, কহোড় প্রমাদ গুনলেন। তিনি যেন আটকে গেলেন একটা বলয়ের মধ্যে—যার ভেতর থেকে আর বেরিয়ে আসতে পারলেন না।

কহোড় পরাজিত হলেন।

আর সেই পরাজয়ের শাস্তিস্বরূপ তাঁকে আটকে রাখা হল একটি জলাশয়ের মধ্যে। তিনি তখন বন্দীর আজ্ঞাবাহী ভৃত্যে পরিণত।

সেই বিপর্যয়কর সংবাদ ক্রমে এসে পৌঁছল সুজাতার কাছে। সুজাতা বললেন সুব্রতকে। আরও বললেন, তোমার পিতা যখন এইরকম বিপদাপন্ন, তখন তুমি নিশ্চয় পুত্রের দায়িত্ব পালন করবে।

সুব্রত বললেন, অবশ্যই করব। পিতার প্রতি পুত্র হিসেবে আমার যে কর্তব্য, তা পালন করতেই হবে।

পিতাকে উদ্ধারের শপথ নিয়ে পথে নামলেন সুব্রত। তিনি উদ্‌গ্রীব রাজা জনকের রাজ্যে পৌঁছে যেতে। একা অবশ্য নন। সঙ্গে রয়েছেন তাঁর মাতুল শ্বেতকেতু। দুজনই শান্ত, মার্জিত।

সুব্রতর শক্তি তাঁর জ্ঞান ও বিদ্যার পরিধি। এই বিদ্যা যত বাড়ে ততই তিনি বিনয়ী ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। পথ খুব দীর্ঘ না হলেও তার কিছুটা অংশ বন্ধুর এবং সেই অংশ থেকে অব্যাহতি পেতে অনেকে ঘুরপথে যান জনকরাজার রাজ্যে। সুব্রত ও শ্বেতকেতু অবশ্য নির্ভয়ে সেই দুর্গম পথটাকেই বেছে নিলেন। একসময় পৌঁছেও গেলেন জনকের রাজ্যে।

দৈবক্রমে তখন স্বয়ং রাজা জনক রাজ্যপরিক্রমায় নির্গত হয়েছেন। পথে দুই আগন্তুক সুব্রত ও শ্বেতকেতুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল তাঁর।

জনক জানতে চাইলেন, আপনাদের গন্তব্য কতদূর?

—আমরা যাচ্ছি রাজা জনকের রাজসভায়।

—কী আপনাদের নাম?

—সুব্রত ও শ্বেতকেতু।

—সম্পর্ক?

—মামা-ভাগ্নে।

—কোনও মন্বান্তর হয়নি এ অবধি?

—না।

—তাহলে এবার বলি। আমিই রাজা জনক।

—কী ভাগ্যবান আমরা!

—কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমি এখন আপনাদের দু'জনকে রাজবাড়িতে ঢুকতে দেব না।

—মহারাজ, আমরা ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণদের যাত্রাপথে বাধা দেওয়া অনুচিত কর্ম। আমাদের শাস্ত্র এরকমই বলে থাকে। যে কোনও স্থানে ব্রাহ্মণদের প্রবেশাধিকার সর্বাগ্রে। তারপর যেতে দিতে হয় দৃষ্টিহীনকে। তারপর বধিরকে। তারপর নারীকে। তারপর ভারবাহককে। তারপর যাবার অধিকার থাকে রাজার। এমতাবস্থায় আপনি কী শাস্ত্রের নির্দেশ অমান্য করে আমাদের গতিরোধ করবেন?

রাজর্ষি জনক চমৎকৃত। নবীন তরুণ যে বহু বিস্ময়ের উৎস, বুঝতে অসুবিধে হয় না। কট্টর বলে মনে হয় না; কিন্তু যা বলেন, তার পিছনে থাকে যুক্তির জোড়ালো দাবি।

জনক সুব্রতকে বললেন, 'বয়সানুপাতে আপনি অনেক প্রাজ্ঞ। আপনার অন্তরে যে তেজ, তার কারণ হল প্রচুর বিষয়ে বিদ্যা ও তাদের চর্চা। এত জানলেন কীভাবে?' সুব্রত বললেন, 'বিগত জন্মগুলি থেকে আমি চর্চা করে আসছি। এ জীবনেও চলছে সেই ধারাবাহিকতা।'

জনক বললেন, 'এই বিদ্যাই আপনার সবচেয়ে বড় আয়ুধ। এই আয়ুধ আপনাকে সম্ভাব্য বিড়ম্বনার হাত থেকে রক্ষা করবে। ঠিক আছে, আপনাদের অগ্রগতির পথে আর কোনও বাধা রইল না।'

আহ্লাদিত সুব্রত বললেন, 'জনক রাজার যজ্ঞের কথা ত্রিভুবনের সকলে শুনেছে। আমরা সেই যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হতে চাই।' রাজা বললেন, 'যজ্ঞাগারের প্রবেশ পথে আপনারা দেখা পাবেন একজন প্রহরীর। তিনি আপনাদের সহজে প্রবেশ করতে দেবেন না। আপনাদের সেই প্রহরীর হৃদয়কেও জয় করতে হবে। তা যদি না পারেন, ক্ষুণ্ণচিত্তে ফিরে যেতে হবে। আমার, কিছু করার নেই। এখানে এটাই নিয়ম।'

সুব্রত বললেন, 'আমি আত্মবিশ্বাসী। আপনার পৃষ্ঠপোষণ, যতটুকু পেলাম, তার জন্য কৃতজ্ঞ'।

মাতুলকে নিয়ে সুব্রত মুখোমুখি হলেন সেই বিশেষ প্রহরীর।

প্রহরী প্রবেশ বাধা দিয়ে বললেন, 'আপনাদের আমি ভেতরে ঢুকতে দিতে পারি না।'

'কারণ ?'

'দ্বাররক্ষী হলেও আমি রাজা জনকের প্রধান সভাপণ্ডিত বন্দীর আজ্ঞাবাহী। বন্দী বলেছেন, একমাত্র বয়স্ক ও বিদগ্ধ ব্রাহ্মণ ব্যতীত, অন্য কেউ এখানে প্রবেশাদিকার লাভের যোগ্য নন।'

সুব্রত বললেন, 'আমি কিন্তু মনে করি, আমার প্রবেশাধিকার আছে। প্রথমত, আমি ব্রাহ্মণ। দ্বিতীয়ত, বিদ্যাই মানুষকে বয়স্ক ও প্রাজ্ঞ করে। এবং আমি যত কম বয়সীই হই না কেন, আমি অবশ্যই বিপুল বিদ্যা ও জ্ঞানের অধিকারী। আমি চরিত্রবান। আমি অর্থলোভে লালায়িত নই। আমি নারীবিলাসী নই। আমি বৈদিকজ্ঞানে এতটাই সমৃদ্ধ যে আমাকে একজন প্রাচীন মানুষের সঙ্গে তুলনা করা যায়। সুতরাং কেবলমাত্র করগুণে আমাকে একজন কমবয়সী তরুণরূপে গ্রহণ করা অনুচিত। আমি অবশ্যই একজন প্রাচীন ব্যক্তি।'

দ্বাররক্ষীও যথেষ্ট জ্ঞান ও সূক্ষ্মবুদ্ধির অধিকারী। তিনি পাল্টা যুক্তি দেখালেন, 'দেখুন, যিনি প্রকৃত বিদ্বান, তাঁর মধ্যে অহঙ্কারের লেশমাত্র থাকে না। তিনি কদাচ আত্মপ্রচারে ব্রতী হন না। আপনি কিন্তু আমার সামনেই নিজের সম্পর্কে অনেক বড় বড় কথা বলেছেন। সুতরাং আমি আপনাকে বিদ্বান হিসেবে মেনে নেব কীভাবে ?'

সুব্রত বললেন, 'সত্যি পরিচয় দেওয়া নিশ্চয় আত্মপ্রশংসা নয়। আসলে আমরা এসেছি মহাপণ্ডিত বন্দীকে দর্শন করতে। আমদের আগমন সম্পর্কে স্বয়ং মহারাজা জনক অবহিত। বন্দী কত বড় পণ্ডিত, তা পরখ করবার জন্যও আমি চাতক পাখির মতন অপেক্ষমান।'

'অর্থাৎ আপনি বন্দীর সঙ্গে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে চান?'

'ঠিক তাই।'

ক্ষণমাত্র না ভেবে প্রহরী তাঁর প্রতিক্রিয়া জানালেন, 'তাহলে আপনার বাড়ন্ত সুসময়ের এখানেই ইতি ঘটবে। পরাজিতের প্রতি বন্দী প্রায়শ খুব নির্মম হয়ে থাকেন। স্বস্তিতে ও শান্তিতে থাকতে হলে এ বাসনা ত্যাগ করুন।'

দুজনের মধ্যে যখন এইরকম বাক্যালাপ চলছে, তখন সেখানে পৌঁছে গেছেন রাজা জনক। দিনমান ইতিমধ্যে ঈর্ষৎ বিবর্ণ। সুব্রত রাজার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মহারাজ আমি আপনার কৃপাপ্রার্থী। আপনার অনুমতি পেলে আমরা প্রবেশ করতে পারি। আপনি যে বিশ্ববন্দিত রাজা, এই সত্য সর্বদা অক্ষুণ্ণ। যজ্ঞার অনুষ্ঠান আপনি যেরূপ সুচারুভাবে সম্পন্ন করেন, তা একমাত্র রাজা যযাতির সঙ্গে তুলনীয়। আপনি দেবতাদের প্রিয়। আপনি সার্থক প্রজাপালক। অতিথিদের প্রতি আপনার স্নিগ্ধ আচরণ সুবিদিত।'

সুব্রতর জনক-স্তুতি যেন নানান শুঁড়িপথ ধরে এগিয়ে চলে। বড় বুদ্ধিমান পুরুষও এরকম প্রশংসায় নরম হয়ে পড়েন। জনকের অভিব্যক্তিতেও যেন হিজল-জিয়লের পরিতৃপ্ত ছায়া খেলা করে। তখন সুযোগ বুঝে সুব্রত তাঁর আবেদনকে ভিন্ন পথে এমনভাবে নিয়ে গেলেন যেন তাঁর দেউড়ি থেকে ভেতরবাড়িতে ঢুকে পড়বার ছাড়পত্র পেয়ে যান, 'আরও অনেকের মতন আমরাও শুনেছি, আপনার সভাপণ্ডিত বন্দী একজন অসাধারণ পণ্ডিত ব্যক্তি। সকল শাস্ত্রের সারবস্তু নাকি তাঁর মধ্যে একীভূত হয়ে আছে। জ্ঞানের তো অনেক অংশ, অনেক স্তর। তাঁর নাকি সবই জানা। ইতিপূর্বে তিনি তর্কযুদ্ধে বহু পণ্ডিতকে পরাজিত করেছেন এবং তর্কের শর্তানুসারে পরাজিতদের এক জলাশয়ে কয়েদ করে রেখেছেন। আমার বিশেষ বাসনা এহেন দ্বিজবিজ্ঞের সঙ্গে অদ্বৈত ব্রহ্ম নিয়ে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হব। জ্ঞান-পৃথুলতায় বন্দী যত বড় পণ্ডিতই হন না কেন, আমার প্রজ্ঞা-গতিশীলতার কাছে তাঁকে পরাভব স্বীকার করতেই হবে। আপনি আমাদের প্রবেশের অনুমতি দিন। আমি এক নতুন অধ্যায় রচনা করে যাব।'

রাজা জনক তন্ময় হয়ে শুনছিলেন সুব্রতর কথা। ওই কথাগুলি তাঁকে কেমন যেন আকাশ-পাতাল ভাবনায় নিক্ষিপ্ত করে। কৌতূহলও জব্বর হয়ে ওঠে। তিনি নিজেও তো কম জ্ঞানী নন। সুতরাং স্বয়ং সুব্রতকে একটু বাজিয়ে দেখতে চাইলেন। তিনি তখন একটির পর একটি কঠিন প্রশ্ন করতে থাকেন সুব্রতকে।

সুব্রত অবলীলায় প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গেলেন। জনক কিছুক্ষণ মুগ্ধ বিস্ময়ে সুব্রতর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তার নিজস্ব শক্তিও তখন একটা প্রান্তিক জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। যেন এই তরুণের কাছেই পুনঃপাঠগ্রহেণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিচ্ছে। বাস্তবে তো তা সম্ভব নয়। অহংবোধ আহত হবে ; আর সেটা বিষফোঁড়ার মতন ব্যথা দেবে। সুতরাং রাজা জনককে ঘুরিয়ে বলতে হল, 'আপনার সঙ্গে এতগুলি প্রশ্নোত্তরের পর বুঝতে পারছি, বয়স কম হলেও আপনার পাণ্ডিত্য যথেষ্ট। যান, আপনি ভিতরে প্রবেশ করুন। আমার সভাপণ্ডিত বন্দীর সাক্ষাৎ আপনারা পাবেন।'

ভিতরে ঢুকতে পারলেও সুব্রত কিন্তু সহজে বন্দীর দেখা পাননি। বন্দী তখন সারা শরীরে সাজিমাটি মেখে স্নান সেরে উঠেছেন। তারপর যথাযথ ভূষণে সজ্জিত হয়ে প্রবেশ করলেন রাজদরবারে।

সুব্রতও তাঁর মামাকে নিয়ে ঢুকে পড়লেন রাজা জনকের রাজসভায়। জনক রাজার রাজসভা অসম্ভব বৈভবপূর্ণ। এটা যেন বিশ্বের বহু মূল্যবান বস্তুর এক সংগ্রহশালা। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিরা নিজের নিজের আসনে আসীন। এঁদের মধ্যে কে যে রাজপণ্ডিত বন্দী, সুব্রত বুঝে উঠতে পারছেন না। এইরকম অবস্থায় একজন বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তি যা করে থাকেন, সুব্রতও তার ব্যত্যয় ঘটালেন না। তিনি দাঁড়িয়ে করজোড়ে বলতে থাকেন, 'উপস্থিত মহান ব্যক্তিবর্গ, আপনারা দয়া করে শুনুন, আমি সুব্রত। ব্রাহ্মণ। আপন যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে তবেই এই রাজ্যসভায় উপস্থিত হতে পেরেছি।'

সুব্রত একটু বিরতি দিলেন।

তারপর যেন মুখস্ত কথা বলতে থাকেন, 'আমি অনেক দিন ধরে অনেক লোকের কাছ থেকে শুনে আসছি এখানকার সভাপতি বন্দী নাকি জ্ঞানের গভীরতায় বিশ্বশ্রেষ্ঠ। জ্ঞানের মালভূমিতে তিনি নাকি এক বিশাল সমভূমি। তাঁর বিদ্যা যেন এক অনির্বাণ হোমশিখার দীপ্তি। বিশ্বের সকল পণ্ডিতরাই নাকি তাঁর কাছে নিছক আনপড়। বিদ্যারই যোশে তিনি বুঝি এক বিষধর সাপ। কোনও প্রতিবাদীকে সামনে পেলেই এমন ছোবল মারবেন যে তাঁকে

আর কোনও দিন মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে না। তাবৎ পণ্ডিতকুল ভয়ার্ত—জনকরাজার সভাকক্ষে উপস্থিত হবার কথা চিন্তাই করতে পারেন না। এতাবৎ যাঁরাই সেই দুঃসাহস দেখিয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেককেই বন্দী নিজের জল-কয়েদখানায় দাসবৎ বন্দী করে রেখেছেন।

সেই সভাপণ্ডিতকে আজ আমি এখানে উপস্থিত হয়েছি তর্কযুদ্ধে পরাজিত করতে।

আমি কোনও বিখ্যাত বিদ্বান নই। আমার এমন কোন শিষ্যকুল নেই, যাঁরা তাসাপার্টি বাজিয়ে আমার হয়ে প্রচার করবেন।

তথাপি চাঁচাছোলা ভাষায় দাবি করছি, আমি একজন প্রকৃত ব্রাহ্মণ—যাঁর আশীর্বাদে শান্তি-কল্যান অব্যাহত থাকে, অনেকের শোক-মোহ অন্তর্হিত হয়, মানুষ বুঝতে পারে কোনটা গ্রহণীয় এবং কোনটা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। অন্যদিকে আমি একজন সত্যিকারের পণ্ডিতব্যক্তি। আমার অভ্যন্তরে যে জ্ঞান-দীপ প্রজ্বলিত, তা সম্ভবত জনকরাজার সভাপণ্ডিত বন্দীকেও দাহ করতে সক্ষম। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।'

সুব্রত নরীব হতেই সভামধ্যে গুঞ্জন ওঠে। সকলের মনে হল আপন ঔদ্ধত্যে এই যুবক ফুলে ফেঁপে নিজেরই সর্বনাশ করতে উদ্যত।

একমাত্র রাজা জনক সুব্রতর ওই সমস্ত কথাকে বায়বীয় বলে মনে করছেন না। তাঁর মুখে স্মিত হাসি।

বন্দী যেন কেমন ঝাঁকুনি খেলেন। মনুষ্যোচিত কারণেই তিনি যুগপৎ বিস্মিত ও ক্রোধান্বিত। মলিন দীনভাবে উপস্থিত ওই যুবকের স্পর্ধাকে সীমাহীন মনে হল তাঁর। তবে তখনই কোনও প্রত্যুত্তর এল না বন্দীর তরফ থেকে।

অন্যদিকে সুব্রতও ঈষৎ অস্বস্তিতে। তাঁর অস্বস্তির কারণ, তিনি ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না—উপবিষ্ট সভাসদগণের মধ্যে বন্দী ব্যক্তিটি কে?

ঠাওর করতে অসমর্থ সুব্রত রাজা জনককে বললেন, 'মহারাজ, আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রশ্নাতীত। আপনার গৌরবকে কেউ কোনও অপব্যাখ্যার চাপান দিয়ে হেয় করতে পারবে না। দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র, নদীদের মধ্যে গঙ্গা যেমন শ্রেষ্ঠ, রাজাদের মধ্যে আপনার স্থানও তদ্রূপ। আপনি বন্দীকে বলুন, আমার সামনে প্রকটিত হতে।'

সুব্রতর স্তুতিতে প্রভাবিত জনক অতঃপর সেই অবিস্মরণীয় বিতর্কসভার আয়োজন করলেন।

একপক্ষে ডাকসাইটে পন্ডিত বন্দী। অন্যদিকে সদ্যযুবা এক আশ্চর্য উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব সুব্রত।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে, এ যেন এক গলিয়াথের সঙ্গে বালক ডেভিডের লড়াই—যে দ্বন্দ্বে ডেভিডের পা হড়কাবার বা একেবারে বিনষ্ট হওয়া প্রায় নিশ্চিত।

কিন্তু সেই লড়াই যত গড়াতে থাকে ততই যেন বিস্ময়ের রশ্মি বিচ্ছুরিত হতে থাকে। ঘাড় সোজা রেখে স্মিত আননে সুব্রত যেভাবে সকল আক্রমণকে সামনে প্রত্যাঘাত করতে থাকেন, তা দেখে অন্যান্য সভাসদ ও রাজা জনক যেন বিস্ময়ের শেষ বিন্দুতে পৌঁছে যাচ্ছেন।

সুব্রত বন্দীকে বললেন, 'আমাদের বিতর্কের পরিধি সীমাহীন। কারণ, জ্ঞানের কোনও মাপ হয় না। যিনি মাপতে যাবেন, তার হাঁপ ধরে যাবে। তল পাবেন না।

প্রথমে আপনি আমাকে প্রশ্ন করবেন। আমি উত্তর দেব।

তারপর আমি আপনাকে প্রশ্ন করব। আপনি উত্তর দেবেন।

এরকম চলতে থাকবার সময় আমাদের দুজনের মধ্যে যিনি একসময় প্রতিপক্ষের কোনও একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে ব্যর্থ হবেন, তাঁকে পরাজিত বলে গণ্য করা হবে।

এবং পরাজিতকে সেই শাস্তিই মাথা পেতে গ্রহণ করতে হবে—যে শাস্তি আপনি—পণ্ডিতপ্রবর বন্দী—আপনার নিকট পরাজিত বিদ্বানদের এতকাল দিয়ে এসেছেন।

সেই যন্ত্রণা, সেই ধারাবাহিক অসহনীয় গ্লানিকে বহন করতে হবে আজকের পরাজিত পক্ষকে।'

বন্দীর কূটদৃষ্টি আরও তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, 'অতি উত্তম প্রস্তাব। আমার সামনে আরও একটি শিকার। আমার কয়েদখানায় তাঁর যত্নআত্যির অভাব হবে না।'

বন্দী তাঁর বিদ্যাভাণ্ডার থেকে সেই সমস্ত প্রশ্নকেই উৎক্ষেপন করতে শুরু করলেন, যাদের প্রতিহত করা যথেষ্ট কঠিন। কিন্তু প্রতিক্ষেত্রেই সুব্রত বন্দীর জ্ঞানকক্ষের চৌকাঠ অবলীলায় ডিঙাতে থাকেন।

বন্দীর সেই সমস্ত প্রশ্নের একটি এইরূপ, 'অগ্নি এক। কিন্তু সে বহুভাবে প্রদীপ্ত।

আবার সমস্ত ভুবন সূর্যের আলোকে আলোকিত।

দেবরাজ ইন্দ্র হলেন সেই বীর, যিনি সঙ্গত কারণে অশুভ শক্তিতে বলীয়ান রাক্ষসদের নিধন করে চলেছেন। এবং রাজা যম হলেন আমাদের পূর্বপুরুষদের ভাগ্যনিয়ন্ত্রক।

আপনি বলুন, যুগ্মভাবে কারা সবিশেষ বিশিষ্ট?'

এইরকম একটি প্রশ্নকেও সুব্রত মনে করলেন একেবারে সরল ও অ-পীড়াদায়ক। তিনি উত্তর দিলেন, 'ইন্দ্র ও অগ্নি এই দু'জন একে অপরের শ্রেষ্ঠ বান্ধব। বহু বিষয়ে তাঁদের যুগ্ম ভূমিকা নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটিয়েছে।

নারদ ও পর্বত—এই দুজনই হলেন দেবর্ষি। তাঁরা একে অপরের চমৎকার পরিপূরক।

রথের ডান ও বাম—দু'টি চাকাই সমভাবে সক্রিয় না থাকলে বিপর্যয় অনিবার্য।

সর্বশেষে বলি, সংসারে জায়া ও পতি যদি যুগ্মভাবে না চলেন, তাঁদের পারিবারিক জীবন অস্থির ও পারস্পরিক করুণা বর্জিত হতে বাধ্য।'

বন্দী স্বীকার করে নিলেন যে, সুব্রতর উত্তর যথার্থ। এরপর সুব্রত যে প্রশ্ন করলেন, তাঁর উত্তর বন্দীর জানা না থাকায় সমবেত সভাসদগণ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যান।

সুব্রত এইভাবে তাঁর পিতা কহোড়কে মুক্ত করলেন।

কিন্তু মধ্যবয়সে পৌঁছে তিনি অস্থিরোগে আক্রান্ত হন ও তাঁর সমস্ত শরীর বক্ররূপ ধারন করে। তখন তাঁর নাম হয় মুনি অষ্টবক্র। তাঁর এই পরিণতি অবশ্যই তাঁর পিতার অভিশাপে।

সুব্রত কিছুদিন রাজা জনকের প্রাসাদে অবস্থান করেন। তবে সময়টা নিছক স্নান, আহার ও বিশ্রামে অতিবাহিত করেননি। প্রাসাদ সংলগ্ন বাগিচায় রাজা জনকের সঙ্গে বহু বিষয়ে মত বিনিময় করেন। সকাল থেকে শুরু করে মধ্যরাত অবধি তাঁদের আলোচনা।

সেদিন আকাশে বাঁকা চাঁদের আবির্ভাব। সুব্রত আঙুল তুলে বললেন, এখান থেকে অনেক দূরে রয়েছে জলধি। তারপর এক সমৃদ্ধ নগর। সেখানে সৌধের পর সৌধ। তৃপ্তি, বীর্য ও কামনার প্রতিভূ রাবণ সেই ভূখণ্ডের রাজা। রাজ্যের নাম লঙ্কা। তিনি ব্রহ্মার বলে বলীয়ান।

রাবণের অনেক গুণ। তেমনি তাঁর দোষও অনেক। তিনি অহঙ্কারী। নিজেকে কোথায় থামাতে হবে তা তিনি জানেন না। আবার তাঁর কামাগ্নিও

বড় তীব্র। অহিমকা ও কাম—এই দুই দুর্বলতায় কাবু হয়ে পড়লে দেবতারাও রেহাই পান না, রাবণও পাবেন না।

আপনি বহু গুণান্বিত রাজা। রাবণ সম্পর্কে আপনাকে আমি এত কথা বললাম এই জন্য যে ভবিষ্যতে আপনার কোনও এক স্নেহের জন ওই রাবণের কুদৃষ্টিতে গিয়ে পড়বেন। প্রচুর অশান্তিও হবে।'

সুব্রত এর বেশি কিছু জানাতে রাজি হননি। সেই গোপনীয়তা প্রত্ন ঐশ্বর্য হয়ে থাকল বেশ কিছুকাল।

রাবণ চরিত্রের সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন করে গিয়েছিলেন সুব্রত।

কিন্তু দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের যিনি মুখ্য হোতা, সেই দুর্যোধনের চরিত্র বিশ্লেষিত হয়েছে পরতে পরতে বিভিন্ন বিশ্লেষকদের দ্বারা। দৃষ্টিভঙ্গীতে পার্থক্য লক্ষণীয়।

দুর্যোধনও বীর ছিলেন। আবার তাঁর অহমিকা, কূটবুদ্ধি ও প্রতিহিংসা পরায়ণতা অনস্বীকার্য। যুক্তি দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে, এই দোষগুলি মানবচরিত্রে স্বাভাবিকভাবেই দেখা দেয়। এই দোষে দোষী দুর্যোধনের কিন্তু প্রগাঢ় বন্ধুপ্রীতি আমরা দেখতে পাই কর্ণের প্রতি তাঁর আচরণে।

আসলে যুক্তি দিয়েই আমাদের বিচার করতে হবে এই যুগে দাঁড়িয়ে।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'যুক্তি অপেক্ষা সার্বভৌম আর কী আছে? কারও মতের সঙ্গে একমত হয়ে বিশলাখ দেবতা বিশ্বাস করার চেয়ে যুক্তি অনুসরণ করে নাস্তিক হওয়াও ভালো।'

দুর্যোধন কিন্তু অসুর ছিলেন না। তিনি যদি মানুষ না হয়ে দৈত্য হতেন, তাঁর চরিত্র বিশ্লেষিত হতে পারত মহর্ষি লোমশের দ্বারা এইরূপে ঃ

একটা পাপ আর একটা পাপকে ডেকে আনে। পাপ অনেককে ক্ষমতাবান করে, শ্রীবৃদ্ধিও ঘটায়। কিন্তু পরিশেষে ওই পাপই তাঁর ক্ষয় ও পতনের কারণ হবেই। সত্যযুগে এর বড় বড় নজির নিশ্চয় নজর এড়াবে না। আলোক ঝলমল সম্ভাবনা ছিল দেবতা ও অসুর উভয়পক্ষের নিকটই। দেবতারা ধর্মকে মান্যতা দিলেন। আর অসুররা রাজকীয় দাপটের স্বাদ পেয়েই ধর্মকে ত্যাগ করলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররাও রাজকীয় দাপটে ধর্মকে ত্যাগ করেছিলেন বলেই নিজেদেরই ঘরের বধূ দ্রৌপদীকে পিতৃসম ব্যক্তিসকল ও অন্যান্যদের দৃষ্টিসমক্ষে উলঙ্গ করতে প্রয়াসী হন।

লোমশ মুনি লক্ষ করেছেন, ধার্মিকগণ বিলাসভ্রমণের পরিবর্তে তীর্থভ্রমণে

অধিক ব্যাকুল হয়ে থাকেন। এমনকি কেউ কেউ দলছাড়া অবস্থাতেও তীর্থস্থানের আকর্ষণে তন্ময় হয়ে যান। দেবতারা যখন সকল তীর্থস্থানে পা রাখছেন, দানবরা তাঁদের উপহাস করছেন।

মহাভারতের একটি বিশেষ অংশে সবিস্তারে বর্ণিত আছে বিত্ত ও বিরামবর্জিত হয়েও পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদীসমেত বহু তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করছেন। দুর্যোধন প্রমুখরা তীর্থদর্শনের কোনও মহিমাকেই স্বীকার করেননি। পরিতাপের বিষয় ধৃতরাষ্ট্রও কদাচ পুত্রদের এমন আভাসও দেননি যে রাজকার্যে কিংবা যুদ্ধে ব্রতী হবার পূর্বে ও পরে তীর্থযাত্রা বাঞ্ছনীয়।

এই যে প্রথাকে, নীতিকে অবজ্ঞা করা, এর থেকেই দানব ও মানুষের মনে পুষ্টি লাভ করে অহমিকা। অহমিকা যখন বৃহৎ হয়, অভিমান সেখানে প্রবাবশালী হয়ে উঠবেই। পাণ্ডবরা যখন পদব্রজে বনে-বনান্তরে ঘুরছেন, দুর্যোধন প্রমুখরা ঘোড়ায় টানা রথে সগর্বে রাজধানী পরিক্রমা করছেন।

যাঁর মনে অভিমান প্রবল, তিনি তো অল্পেতেই ক্রোধী হতে বাধ্য। ক্রোধ তাঁকে উগ্রতা দেবে। উগ্রতা তাঁকে উপহার দেবে বিচ্ছিন্নতা। বিচ্ছিন্নতা তাঁর নীতিবোধ ও সামাজিক ভাবনাকে দুর্বল করবে। সহজেই তিনি চরিত্রভ্রষ্ট হবেন। এই জন্যই বহুজনের মধ্যে থেকেও এক-একজন মানুষকে আমরা বিচ্ছিন্নতায় আক্রান্ত হতে দেখি। তিনি যেন সমস্ত কিছুকেই শুঁকে শুঁকে পরখ করেন ও তাঁর বাতিকগ্রস্ততা তাঁকে এমন এক শূন্যগর্ভ উদ্ধত্যের স্তরে পৌঁছে দেয় যে তাঁর কী করা উচিত, কী করা অনুচিত, কোনও ঠিক-ঠিকানা থাকে না। বহু দানবের মধ্যে আমরা এই চরিত্রের হদিশ পাই। দুর্যোধনের মধ্যেও এর বিকাশ ঘটে। ক্ষমা, লক্ষ্মী ও ধর্ম ত্বরিতে তাঁকে ত্যাগ করে। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ যে কত বড় গর্হিত কর্ম সেই বোধটুকুও তাঁর ছিল না।

আসলে এই চরিত্রের আত্মসমানবোধ খুব তীব্র হয়ে থাকে। কেউ তাঁকে অপমান করেছে,—এই বোধ একবার মস্তিষ্কে স্থান পেলে তিনি অনিবার্যভাবে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠবেন।

দুর্যোধন বিশ্বাস করতেন, দ্রৌপদী তাঁকে অতি কুৎসিতভাবে অপমান করেছেন। এরকম ভেবে নেবার সঙ্গত কারণ আছে যে দ্রৌপদী সময় সময় দুর্যোধনের চিত্তবিকারের কারণ হতেন। সুন্দরী কৃষ্ণবর্ণা হলেও রূপের কী অসামান্য দ্যোতনা!

কী কুক্ষণে যে দুর্যোধন সদ্য নির্মিত ইন্দ্রপ্রস্থের বৈভব মাপবার উদ্দেশ্যে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। খাণ্ডব অরণ্যের একাংশকে অধিকার করে

অনুপম গথিক রীতিকে মান্যতা দিয়ে প্রস্তুত করা হয়েছিল ইন্দ্রপ্রস্থকে। ইন্দ্রপ্রস্থের মুখ্য আকর্ষণ চোখ-ঝলসানো 'মায়াপ্রাসাদ'। স্বর্গ-মর্ত-পাতলে অমন নিবাসের দ্বিতীয় উদাহরণ অলভ্য। দ্রৌপদী স্বয়ং দুর্যোধন ও তাঁর পারিষদদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান প্রাসাদের প্রবেশ দ্বারে। দুর্যোধন তো প্রমিথিউস নন। তাঁর ঈর্ষাকুল সন্দিগ্ধ চিত্তেও দোল লাগে দ্রৌপদীকে দেখে। অমন সজীব রূপবতীকে দর্শন করলে যে পুরুষের চিত্তে বিভ্রমের সৃষ্টি হবে না, তিনি তো ঋষি। দ্রৌপদী কিন্তু ঘুরিয়ে নাক দেখানোর মতন কলাকৌশলের স্থাপনা করেছিলেন সেই মায়াপ্রাসাদে। আর দুর্যোধন, যেমত বা অন্যমনস্কতায়, সেই ফাঁদে পা দিয়ে ফেললেন।

প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে দুর্যোধন যেন কেমন হতচকিত হয়ে পড়েন। সৃষ্টির বিস্ময়কে প্রতি-উত্তর দেবার শক্তি তখন তাঁর ছিল না। অতিথিদের স্বাগত জানাতে যে সমস্ত নারীরা ব্যালকনিতে পুষ্পভাণ্ডার হাতে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁরা প্রত্যেকেই সুন্দরী ও আকর্ষনীয়া। সামনে এমন উঠান, যার চাকচিক্যের তুলনা হয় না। মনে হবে, এটাই বুঝি প্রাসাদের নাভিকেন্দ্র।

তো সেই অঙ্গনের আবার দুটো ভাগ। একভাগকে দেখলে মনে হবে, এইটি এক জলাশয়। শিশুর চোখের মতন স্বচ্ছ জল। সেই জলে যেন একটু ছায়া ছায়া মতন নিজের প্রতিবিম্বও দেখতে পেলেন দুর্যোধন।

অঙ্গনের অপর অংশটিকে দেখলে যে কোনও মানুষেরই মনে হবে, যথারীতি পোক্ত পাথরে গড়া উঠান। বিস্ময়ে থ হয়ে যাবার মতন কিছু মনে হয়নি তখন দুর্যোধনের। আর একবার মুখ তুলে দেখলেন অপেক্ষমান সুন্দরীদের। মুহূর্তের জন্য তাঁর মনে হল, ওই নারীদের ঠিক পিছনে রয়েছেন দ্রৌপদী—যাঁর দুই উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি যে কোনও ব্যক্তির পুরুষকারকে বিদ্ধ করতে সমর্থ।

দুর্যোধন সেই আপাত পাথুরে পথে পা রাখলেন। সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারলেন, কী মর্মান্তিক প্রমাদ ঘটেছে তাঁর। তিনি যাকে প্রস্তরে নির্মিত অঙ্গন ভেবেছিলেন, সেটাই আসলে এক অভিনব জলাধার। পায়ের পাতা থেকে শুরু করে কপাল-অবধি জলে খানিক খাবি খেতে হল তাঁকে ও তাঁর জনাকয়েক সঙ্গীকে। কানে এল সমবেত সুন্দরীদের রিনি রিনি হাসি। এই হাসি যে কতটা তীক্ষ্ণ ও মর্মভেদী হতে পারে, কেবলমাত্র ভুক্তভোগীরাই জানেন। সিক্ত বসনে নিতান্ত অপ্রস্তুত দুর্যোধন যখন জলাধার থেকে উঠে

এলেন শক্ত ভূখণ্ডের ওপর, তখন তাঁর কানে এল দ্রৌপদীর কণ্ঠস্বর। দ্রৌপদী অন্য নারীদের বলছেন, 'ছিঃ ! এভাবে হাসতে নেই। উনি আমাদের অতি মাননীয় অতিথি।'

দ্রৌপদীর মধুর উচ্চারণ যেন তীব্র হলাহল। নিজের দশা দেখে সতত গর্বিত দুর্যোধন তখন বুঝি আত্মহননের পথে গমন করতেও রাজি। তাঁর যে নেয়াপাতি ভুঁড়ি ছিল না, সহজেই অনুমান করা যায়। কারণ, তিনি গদাযুদ্ধের নিয়মিত অনুশীলনে রপ্ত এবং তাঁর পেবশীগুলি খুবই সংবদ্ধ। কিন্তু তাঁর পরিধেয় বহুমূল্য বস্ত্রের তখন নিতান্তই দুরাবস্থা। তাঁর অহমিকাঅন্ত প্রাণে ভূকম্পন। নিজের অজান্তেই দুর্যোধন সেই মুহূর্তে যে স্বরক্ষেপ করলেন, তাতে আর যা-ই থাকুক, তর্জন গর্জন বলতে যা বোঝায়, তা ছিল না।

ইতিপূর্বে একাধিকবার পাণ্ডবদের উৎকর্ষতার কাছে তিনি তুলনায় ম্লান প্রতিপন্ন হয়েছেন ; কিন্তু দ্রৌপদীর ওই চাপা হাসি ও সরস মন্তব্য তাঁকে যেরকম অপদস্থ করল, তার যে তুলনা হয় না। এই নিয়ে কত হাসাহাসি গল্পগাছা যে হবে, ভাবতে গেলে মাটিতে মিশে যেতে হয়।

কিন্তু, দুর্যোধনের আত্মগ্লানি নিতান্তই ক্ষণায়ু। মুষড়ে পড়বার পাত্র তিনি নন। নিজের ভাগ্যরেখার দিকেও উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন না। সামান্য খুচরো ঘটনা যাঁকে উত্তপ্ত করে, সেই দুর্যোধনের অন্তরাত্মায় তখন দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। সেই আগুন তাঁকে জীবনের শেষ দিন অবধি তাতিয়ে রেখেছিল। তিনি পঞ্চপাণ্ডবের ঘরণী দ্রৌপদীকে চূড়ান্ত হেনস্থা করবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন ওই ঘটনার পর থেকে। নারীনির্যাতনের শ্রেষ্ঠ পন্তাটা যে কী, প্রত্যেক পুরুষই হয়তো তা জানেন। দুর্যোধন সেই পন্থাটাকেই তাঁর ভাবনায় প্রাধান্য দিয়ে রেখেছিলেন।

এটাই দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের মুখ্য কারণ। এটাই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পটভূমিকে অনেকটা প্রস্তুত করে। ভীমের হাতে যে দুর্যোধনের মৃত্যু হবে, তার বীজকেও সেইদিনই বপন করা হয়।

কর্ণের প্রতি দ্রৌপদীর আচরণ আমার বিচারে অমানবিক। দ্রৌপদীর পানিপ্রার্থীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কর্ণ। মহাভারতের সবচেয়ে ন্যায়নিষ্ঠ, কর্তব্যনিষ্ঠ, সর্বাধিক দয়ালু চরিত্রের মানুষ হয়েও যেন দৈবের নিষ্ঠুর প্রহারে এক নিষ্পত্র বৃক্ষ। দ্রৌপদীর নিটোল সুঠাম উদ্ধত আদিম যৌবনকে একান্ত নিজের করে পাবার জন্য সেদিন যাঁরা স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে দক্ষতার বিচারে একমাত্র কর্ণই ছিলেন অর্জুনের সমকক্ষ।

কর্ণের সমুৎকর্ষতা সম্পর্কে বিলক্ষণ ওয়াকিবহাল ছিলেন রাজা দ্রুপদ ও স্বয়ং দ্রৌপদী। তাই কর্ণ যখন জলের দিকে তাকিয়ে ঘূর্ণায়মান চক্রে অবস্থিত মৎসের চক্ষু বানবিদ্ধ করতে অগ্রসর হন, রাজা দ্রুপদ তাঁকে বাধা দেন। তিনি বললেন, 'কর্ণ যেহেতু দলিত পরিবারের সন্তান তাই তাঁর অধিকার নেই এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেবার।'

অসহ্য অপমান। কর্ণের তিক্ত জীবনের অন্যতম রক্তাক্ত মুহূর্ত। সেই বিশ্রী তিক্ত অনুভূতি কর্ণ আমৃত্যু ভোলেননি। বহু উদ্বেগঘন সময়ে, নির্জন নিশীথে কর্ণকে কুরে কুরে খেয়েছে সেই স্মৃতি। দ্রুপদের কথার তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন দুর্যোধন, কিন্তু স্বয়ম্বর সভাকে অনাবশ্যক রণক্ষেত্র না করে কর্ণ যেখানে ক্ষণিকের তরে ছিলেন এক আড়ষ্ট বিমূঢ় পাথরখোঁদা মূর্তি যেন। অতঃপর কর্ণের জীবন কোনও দিন প্রশান্তিময় হয়নি।

কর্ণের প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপের পশ্চাতে সেদিন দ্রৌপদীর যে প্রচ্ছন্ন সমর্থন ছিল, সেই সম্পর্কে দ্বিমতের অবকাশ কম। আবার পরবর্তীকালে কর্ণের বীরত্ব, মহত্ব ও প্রকৃত বংশ পরিচয় জ্ঞাত হবার পর এই দ্রৌপদীই মনে মনে কর্ণকে কামানা করেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, আজ যদি কর্ণ পাণ্ডবদের জ্যেষ্ঠভ্রাতা রূপেই অধিষ্ঠিত থাকতেন, দ্রৌপদী কর্ণকেও স্বামীরূপে লাভ করতেন।

প্রকাশ্যে দ্রৌপদীর শ্লীলতাহানির চেষ্টা তথা কর্ণের সহায়তায় বলীয়ান দুর্যোধনের বণংদেহী আচরণ—এই সকলের পিছনে অবশ্যই অনুঘটকের কাজ করেছে দ্রৌপদীয় স্বয়ম্বরসভা।

কুন্তির একটি কথায় দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামীর লাভ অভিনব দৃষ্টান্ত। কিন্তু অনন্যা সতী কী পাঁচজন স্বামীর প্রতিই সম অনুরাগ পোষণ করতেন?

অসম্ভব।

এটা চতুর শ্রীকৃষ্ণ বুঝতে পারতেন। দ্রৌপদীর সর্বাধিক অনুরাগ যে তাঁর সখা অর্জুনের প্রতি, এটা ছিল সুস্পষ্ট।

ইংরেজি Polandry শব্দের বাংলা অর্থ স্ত্রীলোকের বহু বিবাহপ্রথা। এই প্রথা ইন্দো-এরিয়ান সভ্যতায় কতটা মান্যতা পেত, সে সম্পর্কে পরে আলোচনা করব।

তার আগে আমাদের পর্যালোচনা স্পর্শ করবে ত্রিদেবীর অন্যতমা হেলেন ও তাঁর প্রতি আকৃষ্ট প্যারিসকে।

হেলেনের জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে যে সমস্ত পুরাণসম কাহিনি রয়েছে, আমরা ইতিপূর্বে তা অবগত হয়েছি।

দুই এথোনিয়ানস থিউস এবং পিরথোয়াস জানতেন, তাঁদের শারীরিক তবকে দেবরক্ত প্রবহমান। ফলে রাশি-রাশি ভোগউপাচার একদিকে যেমন তাঁদের প্রাপ্য, অন্যদিকে তাঁরা অবশ্যই হকদার অসাধারণ রূপবতী, দেবতার ঔরসজাত দুই সুন্দরীকে বিবাহ করবার।

কোথায় সেই দুই রূপসী ?

ওই রূপসীদ্বয় হলেন জিউসের কন্যা। বাগানের দুই জেসার পুষ্পস্তবক যেন। কথামালার নায়িকা। কেবল ওদের উষ্ণ ঠোঁট স্পর্শ করতে পারলেই বুঝি পুরুষ জীবন সার্থক।

দুই কন্যার একজন হলেন হেলেন, অন্যজন ফার্সেফোন। এঁদের মধ্যে ফার্সেফোন আবার বিবাহিতা। তাঁর স্বামীর নাম হ্যাডেস। বিবাহিতা রমণীর নিকট অন্য পুরুষ তো প্রেমিক হিসেবে ব্রাত্য।

থিউসের পছন্দ হেলেন ; স্থির করলেন, কাঙ্ক্ষিত নারীকে অপহরণ করে তাঁরা একজন অপরজনকে সাহায্য করবেন। এই বিষয়ে কোনটা ন্যায় এবং কোনটা অন্যায়—তা নির্ণয়ে তাঁরা থাকবেন সম্পূর্ণ নির্বিকার।

ঈশ্বরপুত্র থিউসের কাজ ছিল তুলনামূলকভাবে সহজ। তিনি খর যৌবনে আন্দেলিতা হেলেনকে নিজের সঙ্গে নিয়ে আসতে সমর্থ হলেন। হেলেনকে এনে রাখলেন এথেন্সে তাঁর মা এথেরার কাছে।

এরপর থিউস গেলেন পিরথোয়াসকে সাহায্য করতে। কাজটা খুবই কঠিন। রানী ফার্সেফোনের স্বামী রাজা হ্যাডেস সাধারণ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি নন। তিনি বিবিধ অবলুপ্ত প্রায় বিদ্যার অধিকারী। তাঁর শাসন কিছুটা মাটির ওপর। বেশিরভাগ পাতালে। এই রকম পর্যায়ভুক্ত একজন নৃপতির ডেরায় ঢুকে তাঁর বউকে নিয়ে চম্পট দেওয়া অতীব ঝুঁকিবহুল কর্ম। কিন্তু পিরথোয়াসের হৃদয়ে শিকড় গেড়েছে রাজ্ঞী ফার্সেফোনেসের রূপ ও যৌবনের দ্যুতি। মনোজগতে যে আলোড়ন ও মাধুরি, তা শক্তিমান কবির লিখনিতে কালজয়ী শিল্পকৃতি হয়ে থাকবার যোগ্য। প্রেম নয়, মুখ্যত রূপ ও যৌবনে অনুপ্রাণিত হয়ে সাবান্ধব পিরথোয়াস মারাত্মক ঝুঁকি নিলেন। মারাত্মক এই জন্যে যে রাজা হ্যাডেস প্রথম দর্শনেই দুই তরুণের পরিচয় ও উদ্দেশ্য বুঝে ফেললেন। দুজন সমধর্মী। দেহে দেবশোনিত। যেভাবে তাঁরা হ্যাডেসের খাসমহলে ঢুকে পড়েছেন, সেটাও রুম কৌতূহলোদ্দীপক নয়। হ্যাডেস সাদরে তাঁদের অন্দরমহলে নিয়ে গেলেন। সমাদরের বহর কোনও অর্থেই গৌণ নয়। তাঁদের এমন এক কক্ষে নিয়ে গিয়ে বসালেন, যেখানে

যৌনদ্যোতক কয়েকজন সুন্দরী দুই তরুণকে নিয়ে বসালেন দুই আসনে। সম্মুখে বিস্তর সুখাদ্য। ঘ্রাণে ম ম। যেইমাত্র আহার্যের দিকে থিউস ও পিরথোরাস হাত বাড়িয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক থেকে কতগুলি সাপ এসে তাঁদের আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে। সেই বন্ধন থেকে নিজেদের মুক্ত করবার মতন শক্তি তরুণদ্বয়ের নেই।

ইতিমধ্যে অপহৃতা হেলেনের তত্ত্বতলাশ শুরু হয়ে গিয়েছে। হেলেনের দুই ভাই কাস্টর ও পোলাক্স সামরিক অভিযান চালালেন এথেন্সের বিরুদ্ধে। এথেন্স ব্যর্থ হল স্পার্টার সেই আক্রমণকে প্রতিরোধ করতে। পোলাক্স ভগ্নী অপহরণের প্রতিশোধ নিতে নথিউসের মা এথেরাকে বন্দী করে। তারপর দুই ভাই বোন হেলেনকে নিয়ে বিজয়গর্বে ফিরে এলেন স্পার্টায়।

এই ঘটনার ফিরিস্তি নানান জন নানানভাবে দিয়েছেন। কোথাও কোথাও আচমকা মোচড়ও এসেছে সূত্র ধরিয়ে দিতে। কিন্তু বেশিরভাগ লেখা পড়েই বোঝা গেল, হেলেন তখনও বালিকা মাত্র। তাঁর অসাধারণ যৌবন তখনও ফুঁসে ওঠেনি। অর্থাৎ থিউসের মতলব ছিল—হেলেনের যৌবন যতদিন না ষোলকলায় প্রস্ফুটিত হয়ে উঠছে, তিনি তাঁকে বিয়ে করবেন না। ততদিন ভাবী শ্বশ্রুমাতার হেফাজতেই থাকুন হেলেন।

লেসবগের বিশ্লেষক হেলানিকাস লিখেছেন, 'হেলেনের বয়স তো তখন মাত্র সাত বছর। তার যৌবন তখন ঘুমন্ত কচ্ছপের মতন অপেক্ষমান।'

অন্য এক লেখক ডিওডোরাস বললেন, 'না, না, হেলেনের বয়স তখন দশ। ক্ষণে ক্ষণে না হলেও তাঁর মধ্যে তখন মিলন সম্পর্কে একটা ধারনা গড়ে উঠেছে।'

এই দু'জনের লেখাকে আবার নস্যাৎ করে দিচ্ছেন আর একজন তাবড় কলমবিদ। নাম স্টেসিরোকাস। তিনি বললেন, 'অপহৃতা হবার সময় হেলেন পূর্ণযৌবনা ও অসাধারণ রূপবতী ছিলেন। তাঁকে যৌনমিলনে সম্মত করাতে থিউসকে সেরকম কঠিন পর্যায়কে অতিক্রম করতে হয়নি। তাঁদের উভয়ের মিলনে যে কন্যার জন্ম হয়, তার নাম ইফিজেনিটা।'

স্টেসিফোরাসের এই গল্প মর্মান্তিকভাবে হালে পানি পায়নি অধিকাংশ কবি লেখকদের গাথারচনায়। তাঁরা বলছেন, ইফিজেনিটা নাম্নী এক কন্যার উপস্থিতি আমরা দেখতে পাচ্ছি ঠিকই, কিন্তু উক্ত কন্যাকে থিউসের ঔরসে হেলেনের গর্ভজাত ভাবাটা উন্মাদবৎ কল্পনা। ইফিজেনিটা ভূমিষ্ঠ হয়েছিল আগামেমন এবং ক্লাইটেমেস্ট্রার জৈবিক প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে।

এই ধরনের বিবাদ ও দূরবিস্তৃত কল্পনা উত্তরোত্তর এমনই বৃদ্ধি পেতে থাকে যে শেষমেশ আদি স্রষ্টা হোমারই বুঝি হারিয়ে যেতে বসলেন।

সেই অকাল বোধন রুখতেই যেন সক্রিয় হয়ে উঠলেন রোমক কবি-লেখকরা। তাঁরা ইলিয়াড ও ওডিসিকে মাথায় করে রাখলেন। বিশ্লেষণ ও অন্বেষণ চলল নানাভাবে।

পরিশেষে হোমার থেকে তাঁরা প্রাথমিকভাবে যতটুকু উদ্ধার করে কল্পনার বসে ও নির্যাসে মধুময় করে তুললেন, তা এইরকম ঃ

হেলেনকে তাঁর দাদারা উদ্ধার করে বীরদর্পে ফিরে এলেন। বালিকা হেলেন ক্রমে যুবতী হল। তখন তাঁর রূপ ও যেকোনও পুরুষের হৃদয়ে শক্তিশেলরূপে বিদ্ধ হবার যোগ্য। তবেই যারাই সেই শক্তিশেল বুকে নিয়ে তাঁর পিচনে ছুটবার চেষ্টা করেন, তাঁদের প্রত্যেকেই শেষপর্যন্ত হাল ছেড়ে দিতে হয়। কারণ, ওইরকম যুবতীকে নিয়ে নিজের হারেমে চালন দেওয়া তাঁদের সাধ্যাতীত। তদুপরি রয়েছে দুই দাদার কঠিন প্রহরা।

রূপ তো ঈশ্বরের দান। কিন্তু স্বাস্থ্যকে মজবুত রাখাটা নিজের ওপর নির্ভর করে। সচেতন হেলেন খুব নিষ্ঠার সঙ্গে Physical education-এর পাঠ নিয়েছিলেন। তিনি সম্পূর্ণ নগ্নিকা হয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠতেন। একনাগাড়ে অনেকক্ষণ সেই ঘোড়াকে ছোটাতেন রৌদ্রালোকিত প্রান্তরের বুক চিরে। একদল মৌমাছি গুঞ্জন তুলে ছুটবার ব্যর্থ চেষ্টা করত তাঁর পেছন পেছন। শরীরে সুতো না থাকলেও সঙ্গে থাকত রকমারি মারনাস্ত্র। একে ওই রূপ ও গতি, তদুপরি অতরকমের অস্ত্রশস্ত্র—স্বয়ং গডজিলা যেন ভয়ার্ত চোখে আশ্রয় খুঁজত। আবার এখানেই আমার খটকা লাগে। জট ছাড়াতে কষ্ট হয়। রাবণ যখন অনিচ্ছুক সীতাকে নিয়ে লঙ্কার দিকে বায়ুমার্গে ছুটছেন, সীতা নিজেকে ওই অপহরণকারীর হাত থেকে মুক্ত করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। কিন্তু হেলেনের হাতে অস্ত্র থাকা সত্ত্বেও এবং সেই অস্ত্র প্রয়োগে তিনি সুশিক্ষিতা হয়েও অপহরণকারী প্যারিসের বিরুদ্ধে সামান্যতম প্রতিরোধ গড়ে তোলেননি কেন ?

ঘটনাটা বিদ্‌ঘুটেও নয়, রহস্যময়ও নয়। হেলেন প্যারিসে সমর্পিতা। তাঁকে এ যুগে দাঁড়িয়ে আমরা স্বৈরিনী বললেও বলতে পারি। কিন্তু গ্রীসের মহাকাব্যিক যুগে একজন রানী ওইরকম স্পর্ধা দেখাতে পারতেন বৈকি।

প্রেম শব্দটি হেলেনের ক্ষেত্রে যে ধরণের ওজস্বিতা পেয়েছে, সীতা ও দ্রৌপদীর ক্ষেত্রে ততটা নয়। দ্রৌপদীকে চূড়ান্ত অপমানিত বা লাঞ্ছিত করতে

পারলেই দুর্যোধন-দুঃশাসন প্রমুখরা খুব খুশি। ভগ্নী সুর্পণখা যদি লক্ষণের দ্বারা ওইভাবে মর্মান্তিক হেনস্তা না হতেন, রাবণ সীতা অপহরণে অতটা উগ্র ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে উঠতেন কি না, বিতর্কের বিষয়।

কিন্তু হেলেন ও প্যারিসের সম্পর্ককে বিশ্লেষণ করলে স্পষ্টতই প্রেমের প্রসঙ্গ এসে যায়। এবং এই প্রেম অনিবার্যভাবে লালন করে যৌনতাকে।

প্রেমের স্ফূরণ বহুধা। প্রেমে থাকতে পারে নরনারীর ভালবাসা, প্রেমে অবশ্যই থাকবে পরস্পরের প্রতি স্নেহ, মমত্ব। অতি প্রাচীন সভ্যদেশ ব্যাবিলনের দেবী ইশতার, গ্রীসের আয়োজিত, রোমের ভেনাস, পেরুর আজটেকদের ত্বাজোলটিওটল, স্ক্যান্ডানেভিয়ার ফ্রেয়া প্রমুখ দেবীরা মুখ্যত প্রেমেরই পতাকাবাহী। তাঁদের অনুগ্রহ বা অনুমোদন না পেলে পুরুষ ও নারীর মেধ্যে প্রেম আসে না। প্রেমের অভাবে বিবাহিত জীবন ব্যর্থ হয়। সংশ্লিষ্ট দেবীর আশীর্বাদ না পেলে নারী তার জন্মদায়ী ক্ষমতা পায় না অর্থাৎ তার নারীত্ব বিকশিত হতে পারে না। দেবীর ইচ্ছা না থাকলে পুরুষ ও নারীর যৌন আবেগও তীব্রতা পায় না—যে কারণে হতাশা ও ব্যর্থতা আসে উভয়ের জীবনে।

ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে আবার ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। এখানে প্রেমের দেবতা মদন ছিলেন ঠিকই, কিন্তু তিনি মাত্রা অতিক্রম করার অপরাধে ভস্মীভূতও হন। গ্রীসে এই নীতির মাত্রাটি প্রায়শ দৃশ্যমান নয়। আপাত বিচারে যা গর্হিত, তার পশ্চাতে যুক্তির জাল বুনতে কবি ব্যস্ত হয়ে পড়েন না। যেন সেটা এক স্বাবাবিক ঘটনাই ছিল। ভারতের ক্ষেত্রে সর্বকর্মেই ন্যায় ও নীতির প্রতিষ্ঠায় যুক্তি খোঁজা হয়। বলাই হচ্ছে ন্যায়ের জয় হবে ও অন্যায়ের বিনষ্টি ঘটবে। কিন্তু কোনটা যে ন্যায়, আর কোনটা যে অন্যায়—তা নির্ণয় করা বড় শক্ত। সাদা চোখে যাকে অন্যায় বলে মনে হয়েছে কিংবা বড় অসামাজিক কর্ম বলে মনে হয়েছে, সেটাই কোনও এক দেবসম বা দেবীসম ব্যক্তিত্বের ব্যাখ্যায়, এমনকী প্রত্যক্ষ উদ্যোগে সঠিক কর্মের বর্ম পরে দণ্ডায়মান।

সীতা, দ্রৌপদী ও হেলেনের বৃত্তকে তাই আরও প্রসারিত করতে হচ্ছে ন্যায় ও অন্যায়ের অনিবার্য টানপোড়েনকে কেন্দ্র করে।

ধর্মের নামে মানুষের আকুলতা দিনকে দিন বাড়ছে বই কমছে না। মধ্য সমুদ্রে পৌঁছে একটি ছোট্ট জলযান যেমন দিশেহারা হয়ে পড়ে, ধর্মবিশ্বাসহীন মানুষকে বহু প্রাজ্ঞব্যক্তি তেমনটিই মনে করে থাকেন। সেই জলযান যদি

কোনও বন্দরে গিয়ে থিতু হতে পারে ও নিজেকে নিরাপদ জ্ঞান করতে পারে, ধর্মে বিশ্বাসী মানুষও তেমনি এক স্বস্তি অনুভব করেন—যে স্বস্তি সমগ্র মনুষ্যসমাজের শান্তি-কল্যানের পক্ষে অতীব প্রভাবশালী। অন্যদিকে যাঁরা ধর্মকে ধর্মান্ধতার পর্যায়ে নিয়ে যান, তাঁরা কেবল সেই ধর্মের পক্ষে ক্ষতিকারক নন, মনুষ্যসমাজের পক্ষেও স্বাস্থ্যহানীকর দূষিত প্রাণী।

তবে ধর্ম যে আসলে কী, এই নিয়ে আদি ও মধ্যযুগ থেকে যুক্তি-তর্কের কাটাকাটি চলছেই। ত্রিনারীর অবস্থান যে তিনটি মহাকাব্যে—সেই রামায়ণ, মহাভারত এবং ইলিয়াড-ওডিসিতে এই প্রশ্ন পাঠকের মনে উঠে আসবেই। আতিপাতি করে খুঁজলেও একেবারে দৃঢ়বদ্ধ অভিধার সন্ধান মেলে না। রামায়নের রাম সুগ্‌পীব-বালির দ্বৈরথে নাক গলিয়ে যেভাবে বালিকে হত্যা করলেন, সেখানে ধর্মের বানী নিষ্কম্প থাকছে?" ইলিয়াডে যেভাবে প্যারিসভ্রাতা হেক্টর-ভিক্টরকে নিকেশ করা হল, সেখানে কী প্রথানুগ ন্যায়-নীতি রক্ষিত হয়েছে? আর মহাভারতে ঘটনাপরম্পরায় এমন সমস্ত কীর্তি আমরা দেখতে পাই, যা এই যুগে ঘটলে, 'মিডিয়া সংশ্লিষ্ট নারী-পুরুষদের নির্ঘাৎ ছিঁড়ে খেত।

তাহলে শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়ে কবি ব্যাসদেব একথা বলালেন কী যুক্তিতে : 'যথা ধর্ম, তথা জয়'?

স্বয়ং ব্যাসদেবের জীবনবৃত্তান্ত জ্ঞাত হলে ধর্মের প্রকৃত অভিধার কাছাকাছি পৌঁছে যেতে পারি। তাঁর পূর্ণনাম মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস। হিন্দুদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ বেদের বিভাজন তাঁর জীবনের অন্যতম কীর্তি। এই কারণেই তিনি বেদব্যাস। ব্যাস শব্দের অর্থ হল বিভাগ। অর্থাৎ ব্যাস শব্দটি তাঁর উপাধি মাত্র।

দ্বৈপায়ন একাই যে বেদের বিভাজন করেছেন, একথা বলা যায় না। বিষ্ণুর ইচ্ছাক্রমে মোট আঠাশজন বেদব্যাস বেদকে বিভাজিত করেছেন। কৃষ্ণ দ্বৈপায়নকে বাদ দলে অন্যদের সম্পর্কে কোনও বিবরণী আমরা পাচ্ছি না। একটা কথা কেবল বলা হয়েছে,—এঁরা প্রত্যেকে দ্বাপরযুগে বিষ্ণুর আবেশ অবতার হয়ে ধরাধামে এসে বেদবিভাজনের কর্ম সম্পন্ন করেন। আর আমাদের আলোচ্য বেদব্যাস হলেন সংখ্যায় অষ্টাবিংশ ও পরাশর মুনির পুত্র মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ।

ব্রহ্মা দ্বৈপায়নকে ডেকে বললেন, 'তোমার মুখ্য দায়িত্ব হল বেদকে বিভাজিত করা। এই প্রয়াসে তুমি ঈশ্বরের নিখুঁত শায়ক। তোমার কলম সেই শায়কের অগ্রফলক। প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়কেও তুমি সমগুরুত্ব দেবে।'

অর্থাৎ এক দমকায় ব্যাসদেব যেমন বেদের বিবাজনে ব্রতী হননি, তেমনি মহাভারত রচনাতেও তিনি কোনও তাড়াহুড়ো করেননি, বিশেষত তিনি স্বয়ং মহাভারতের একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র।

দ্বৈপায়ন বুঝলেন, তিনি একাকী অতবড় কাজ করতে গেলে ভুল ও জটিলতা দুয়েরই সৃষ্টি হতে পারে। এই ভাবনার প্রেক্ষাপটে দ্বৈপায়ন চারজন গুণী লেখক-বিশ্লেষককেও কাজে লাগালেন। চারজনের নাম শৈল, বৈশম্পায়ন, জৈমিনি ও সুমন্ত। এংরা বেদবিভাজনের আটাশতম প্রয়াসের শ্রাবক। দ্বৈপায়নের নেতৃত্বে ওই চার শ্রাবক বেদের চারটি বিভাজনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। রচিত হয় বেদের চারটি খণ্ড—ঋক, সাম, যজু ও অথর্ব। বেদের এই বিভাজন বিশেষ জরুরি হয়ে পড়েছিল এ কারণে যে কোনও কোনও ক্ষেত্রে একটি খণ্ড যেন অপরখণ্ডের বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছে।

মন রাখতে হবে, দ্বৈপায়নকৃত বেদের এমত বিভাজন কিন্তু চুড়ান্ত নয়। বলা হয়েছে, আগামী কোনও এক যুগে দ্রোণপুত্র চিরজীবী অশ্বত্থমা আর একবার বেদের বিভাজনে হাত দেবেন।

দ্বৈপায়ন তো রোদে জলে পোড় খাওয়া এক মহান নির্মেতার মতন বেদের চারটি অংশকে নতুন করে গড়েপিটে তুললেন। কিন্তু কাজ সেখানেই থেমে রইল না। তাঁর প্রিয় শিষ্য বৈশম্পায়ন বিশেষ পারিপাট্যের সঙ্গে যজুর্বেদকে সাতশটি শাখায় বিভক্তও করলেন গুরুর মহিমাকে আরও ব্যাপ্তি দিতে। কিন্তু এরপরও মনে হল, চারখণ্ডে বিভক্ত বেদকে সঠিকভাবে ভবিষ্যত প্রজন্ম অনুধাবন করতে নাও পারেন। সেই খামতি দূর করার মানসে রচিত হল একটির পর একটি পুরাণ। বেদব্যাস আঠারোটি পুরাণ রচনা করে তাঁর শিষ্য রোমহর্ষণকে পাঠ করতে দেন। এইগুলি প্রশ্নাতীতভাবে সর্বজ্ঞানের সারসত্য। এখানেই আবার মেলে পরাজ্ঞানের হরেক রাজপথ-গলিপথ। জানা যায় আদি মানব-মানবীর আবির্ভাব ইতিহাস। আলোকপাত ঘটেছে নর-নারীর মধ্যকার সম্পর্ক ও মানবসভ্যতার বিকাশকে অক্ষুণ্ণ রাখবার যাবতীয় দিশা। তাবৎ বিশ্বে ভারতবর্ষের পুরাণতুল্য জ্ঞানগর্ভ আধার দ্বিতীয়টি নেই।

বিভিন্ন দিক বিচার করে বলা যায়, বেদব্যাস একজন ঐতিহাসিক ব্যাক্তিত্ব। তাঁর জন্ম হিয়েছিল প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ হবার কিছুদিন বাদে তিনি দেহরক্ষা করেন। তাঁর জনক পরাশর এমন এক পুত্রসন্তান চেয়েছিলেন, যিনি হবেন চিরস্থায়ী কীর্তির অধিকারী। তাঁর

মেধায় ভাস্বর হয়ে থাকবে স্বকাল ও চিরকাল। সর্বযুগের সমাগত নক্ষত্রদের মধ্যে যিনি হয়ে থাকবেন উজ্জ্বলতম।

অনন্য সন্তানের পিতৃত্ব লাভের আকুলতা নিয়ে পরাশর শিবের তপস্যায় বসলেন। তাঁর সাধন-তপস্যা যে ফলপ্রসু হবে, তার আভাস তো ছিলই। স্বয়ং বিষ্ণু চাইছিলেন, পরাশরের তপস্যায় শিব তুষ্ট হন।

শিব তুষ্ট হলেন। সুবর্ণ সময়ে তিনি আবির্ভূত হলেন প্রার্থনারত পরাশরের সম্মুখে, 'বৎস পরাশর, আর প্রার্থনার দরকার নেই। তুমি উঠে দাঁড়াও।' কিছুদিনের মধ্যেই তুমি এক অসাধারণ পুত্রের পিতৃত্ব লাভ করবে. তোমার সন্তানের মেধা, পাণ্ডিত্য, নীতিবোধ ও অনুসন্ধিৎসা মানুষের অনাগত দিনগুলিকেও আলোকিত করে রাখবে। সে হবে ব্রহ্মজ্ঞানী। এমন কোনও বিষয় নেই, যে সম্পর্কে তার ধারণা হবে ক্ষীণ। সর্বশাস্ত্রে তার থাকবে পূর্ণ অধিকার। ন্যায়-নীতি, মানব-মানবীর পারস্পরিক সম্পর্ক ইত্যাদি সকল বিষয়ের নির্ণয়ে তোমার পুত্রের দ্বারা প্রদর্শিত পন্থা ও ব্যাখ্যাই প্রাধান্য পাবে। এটা যে দেবকুলেরও অভীষ্ট।'

বরদান করে অন্তর্হিত হলেন দেবাদিদেব মহেশ্বর। প্রাচীন ভারতের এক মহান শক্তিমানের জন্ম ও কীর্তির উৎপত্তির পিছনে এটাই হল বৃত্তান্ত।

শিব বলে বলীয়ান পরাশর তখন বের হলেন দেশভ্রমণে। নদ-নদী-পাহাড়-পর্বত, সুজলা-সুফলা এবং ঊষর মরু অঞ্চল পরিভ্রমনান্তে তিনি এসে দাঁড়ালেন যমুনা নদীর তটে। এই নদী পার হবার জন্য তিনি ধীবরকুলের প্রধানকে এসে ধরলেন, 'আমি মুনি পরাশর। তোমরা কী আমাকে যমুনার অপরতীরে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করতে পারবে?'

ধীবর প্রধান বললেন, 'আমাদের সৌভাগ্য যে আপনার মতন মন্ত্রসিদ্ধ ঋষি নদী পার হবার জন্য সাহায্য চাইছেন। এই মুহূর্তে নদীতটে নৌকা নিয়ে বসে আছে আমার কন্যা সত্যবতী। সে-ই আপনাকে যমুনার অপরতটে পৌঁছে দেবে।'

পরাশর তদনুযায়ী নদীঘাটে অপেক্ষমান তরীতে গিয়ে উঠলেন। কিন্তু পারানীকে দেখে তিনি এককথায় স্তম্ভিত। কিছুক্ষণ একেবারে বাক্যহারা।

ইনি যে উদ্ধত যৌবননিষ্পাষিতা এক অপরূপা। নারীর রূপ ও যৌবন যে কতখানী উন্মাদনা সৃষ্টি করতে পারে যে কোনও বয়সের একজন পুরুষের অভ্যন্তরে, এই যুবতী বুঝি তারই প্রমাণ দেবার জন্য বসে আছেন। এর যৌন আবেদনের কাছে তুচ্ছ হয়ে যায় নীতিবোধ, কাণ্ডজ্ঞান ও শিক্ষা।

পরাশরের মতন ধী-শক্তিসম্পন্ন সুযোগ্য ঋষিরও অস্থিরতা বাড়তে থাকে। ন্যায়, বিদ্যা ও উদ্দেশ্যও সেই মুহূর্তে আর তাঁর দোসর নয়। কামভাব প্রকাশের নানারূপ প্রকট হয়ে ওঠে তাঁর বাহ্যিক আচরণে।

দু'চারটে অবান্তর কথা বলবার পরই তিনি প্রায় নজিরহীন আকুলতায় সত্যবতীর কাঞ্চনবর্ণ দেহাংশ স্পর্শ করে বলতে শুরু করেন, 'আমি এতবছর ধরে এই বিশ্বের বহুস্থানে পরিভ্রমণ করেছি। কিন্তু তোমার মতন রূপবতী যৌবনবতী নারী এ যাবৎ দেখিনি।

আমি তোমাকে চাইছি। তোমার ভিতরে প্রবিষ্ট হতে না পারলে আমি উন্মাদ হয়ে যাব। তুমি সম্মত হও, সুন্দরী।'

শিহরিত সত্যবতী সলজ্জে বললেন, 'ঋষি, আপনি বশিষ্ট বংশোদ্ভব। অন্যদিকে আমি শূদ্রবংশীয়া। আমাদের মিলন শাস্ত্রসমমত নাও হতে পারে। সুতরাং আপনি আপনার বাসনাকে দমন করুন। আমি আপনাকে নিরাপদে যমুনা পাড় করিয়ে দিচ্ছি।'

সত্যবতীর এই কথায় পরাশরের ভেতরে একটা ধাক্কা লাগে। তিনি সামান্য সময় আড়ষ্ট হয়ে থাকেন। তারপর আবার মুখ তুলে সত্যবতীর মাদকতাময় মুখের দিকে তাকাতেই পূর্ববৎ কামার্ত হয়ে পড়েন। সেই সঙ্গে তাঁর মধ্যে এই বোধেরও উদয় ঘটল যে, ধীবর-কন্যা মৎস্যগন্ধা এই যুবতী মোটেই আটপৌঢ়া নয়। এর জন্ম অতি মহৎ কোনও সন্তানের জননী হবার জন্য।

হয়তো এটাই সত্যি হবে যে, তিনি শিবের বরে যে পুত্রের জনক হবেন, সেই পুত্র হবে সত্যবতীরই গর্ভজাত।

পরাশর মুনি সত্যবতীর আরও নিকটবর্তী হয়ে বললেন, 'তুমি অতশত ভাবনায় কাতর না হয়ে সব কিছু আমার উপর ছেড়ে দাও। আমায় আস্থা রাখ। আমি একজন তপঃসিদ্ধ পুরুষ। আমার মধ্যে সবটুকুই সততা, মিথ্যা বুজরুকি বলতে কিছু নেই। এসো, আমরা মিলিত হই।'

সত্যবতীও ততক্ষণে দীপ্ত পুরুষ পরাশরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। কৃষ্ণবর্ণ এই ঋষির পৌরুষ যে অসামান্য আনন্দদায়ক হবে, সেটাই তিনি বুঝতে পারলেন। তথাপি বাস্তব পরিস্থিতি অনুধাবন করত তিনি আঙুল তুলে দেখালেন, 'ওই দেখুন, নদীতটে কত যাত্রী অপেক্ষমান। ওঁরা সকলে এখনই এসে পড়বেন আমার নৌকার সওয়ারি হতে।'

পরাশর মনে মনে হাসলেন। সত্যবতী যে রাজি হয়েছেন, এই কথাতেই তা প্রমাণিত।

উল্লসীত পরাশর তখন তাঁর তপঃপ্রভাবে এমন এক কুয়াশাজাল সৃষ্টি করলেন যে নদীতটে উপস্থিত কোনও ব্যক্তিই সত্যবতীর তরীটিকে দেখতে পেলেন না।

মিলিত হবার পূর্বক্ষণে পরাশর সত্যবতীকে প্রশ্ন করলেন, 'সুন্দরী, বলো, তুমি আমার কাছ থেকে কী চাও?'

সত্যবতী বললেন, 'জন্মাবধি আমি মৎস্যগন্ধা। অনেক দূর থেকে আমার শরীরের ওই গন্ধ সকলে পায়। এটা আমার খুব খারাপ লাগে। তুমি কী পারবে, আমার দেহকে সুগন্ধময় করে তুলতে?'

প্রসন্ন পরাশর বললেন, 'এই মুহূর্ত থেকে তুমি এক আশ্চর্য সুগন্ধের অধিকারিনী হলে। বহুদূর থেকে লোকে তোমার সুগন্ধে মোহিত হবে।'

মুনির এই কথা শেষ হওয়া মাত্র সত্যবতীর দেহ থেকে নির্গত হতে থাকে আশ্চর্য সুন্দর গন্ধ। এক যোজন দূরত্বেও সেই গন্ধ লভ্য হওয়ায় পরবর্তীকালে সত্যবতীর আর এক নাম হয় 'যোজন গন্ধ'।

পরাশর ও সত্যবতীর সেই মিলন হল দীর্ঘস্থায়ী ও অত্যন্ত সুখদায়ক। পরাশরের তপ্ত বীর্য ধারণ করাতে সত্যবতী গর্ভবতী হলেন। তিনি তখন চলে গেলেন লোকচক্ষুর আড়ালে। আশ্রয় নিলেন সরস্বতী নদীর মধ্যস্থলে একটি দ্বীপে।

সেখানে তিনি প্রসব করলেন কৃষ্ণ দ্বৈপায়নকে। বড়সড় চেহারা, উজ্জ্বল দুই চক্ষু, তবে ত্বক ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। যেহেতু গায়ের রং কালো ও জন্ম এক দ্বীপভূমিতে। তাই তাঁর নামকরণ হল কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। জন্মের পর মুহূর্ত থেকেই যেন স্বোপার্জিত শক্তি ও বুদ্ধিতে ভাস্বর হয়ে উঠল শিশু। যে দ্রুততার সঙ্গে তা যৌবন লাভ ঘটল, তা বিস্ময়কর। বিস্ময়কর তাঁর বিবিধ শাস্ত্রের বীজমন্ত্র গ্রহণ। তিনিই মৌলিক পন্থা অনুসরণ করে পরবর্তীকালে বেদের বিভক্তিকরণ সম্পন্ন করেন ও তখন তিনি উপাধি পান বেদব্যাস।

মহাকাব্যিক যুগে বেদব্যাসের সঙ্গে পাণ্ডিত্যে ও জীবন বৈচিত্র্য টক্কর দিতে পারেন, এরকম ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎ মেলে না।

জন্মগ্রহণের কিছুদিনের মধ্যে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাঁর জননী সত্যবতীকে বললেন, 'মা, এই বিশ্বে আমার পালনীয় কর্তব্যের পরিমাণ বিপুল ও ক্রমবর্ধমান। কালক্ষয়ের অবকাশ নেই। অবকাশ নেই লঘু কৌতুকেরও। আমি তাই এখনই তপস্যা করতে যাচ্ছি।'

বেদনার্ত সত্যবতী বললেন, 'তুমি চলে গেলে আমি যে বিপন্ন হয়ে পড়ব।'

ব্যাসদেব বললেন, 'না, তুমি বিপন্ন হবে না। তোমাকে কেউ কলঙ্কিত বলতে পারবে না। রাজরাজড়াদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ, তিনিও তোমার গুণগ্রাহী হবেন। তথাপি যখনই তুমি কোনও সঙ্কটে পতিত হবে, আমাকে স্মরণ করো। আমি নিশ্চিত তোমার ডাকে সাড়া দেব।'

এই কথাগুলি বলেই মাকে প্রণাম করে দিশাবিহীন বিশ্বকে পথ দেখাতে বেরিয়ে পড়লেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন।

পুত্রর অন্তর্ধানের পর সত্যবতী ফিরে গেলেন তাঁর পিত্রালয়ে।

আর দ্বৈপায়ন তাঁর জ্ঞানলাভকে ত্বরান্বিত করতে সরস্বতী নদীর তীরে একটি আশ্রম নির্মাণ করে সেখানে তপস্যায় বসে গেলেন। তপস্যা চলে নিয়মিত। অন্যসময় তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেন পর্যবেক্ষণে। এই পর্যবেক্ষণ কালে একটি পক্ষীদম্পত্তির আচরণ যেন তাঁর দৃষ্টিকে আরও সুদূরপ্রসারী করে। তিনি দেখলেন, ওই পক্ষীদম্পত্তি তাদের শাবকের প্রতি কী মায়াময় ও যত্নবান। শাবককে সক্ষম করতে চাহিদামাফিক সমস্ত কিছুই করে চলেছে তারা। কিন্তু প্রত্যাশার কোনও বিস্ফোরণ সেখানে নেই। শাবকটি সুস্থ সক্ষম হয়ে স্বয়ং উড়ান দিতে পারলেই তাদের স্বস্তি ও প্রাপ্তি। এর অধিক কিছু প্রত্যাশা করতেও তারা অপারগ।

দ্বৈপায়ন ভাবলেন, পাখিদের অপত্যস্নেহ যদি অমন গাঢ় ও নিঃস্বার্থ হতে পারে, মানুষের পুত্রস্নেহেও তাহলে অধিকতর উৎকর্ষ হওয়া উচিত। যার সন্তান নেই, সে বড় ভাগ্যহীন। যে মানুষ পুত্রবান হতে পারছেন, তিনি পুণ্যবান।

এইরকম একটি ভাবনা নিয়ে দ্বৈপায়ন চললেন হিমালয়ের দিকে। হিমালয়ই হল সেই পূতস্থান—যেখানে তপস্যাব্রতীরা অপেক্ষাকৃত কম সময়ে সিদ্ধিলাভ করে থাকেন। দ্বৈপায়নের পদধ্বনি শোনা গেল হিমালয় অতিক্রম করে সুমেরু পর্বতেও। ওই পর্বত আরও সুন্দর, আরও গম্ভীর। এখানকার আনাচে কানাচেতে বহু ঋষি ও মানবহিতৈষী ধ্যান করেছেন, সিদ্ধিলাভ করেছেন ও দেশ-সমাজ থেকে হিংসা তথা বৈরীভাব দূর করতে নিজের নিজের তপঃপ্রভাবকে সুপ্রযুক্ত করেছেন। হয়তো আপামর জনতা তাঁদের নামও জানেন না। কিন্তু তাঁদের প্রভাব যথার্থভাবে অনুভূত।

সুমেরুর শৃঙ্গ কর্ণিকাকে চিহ্নিত করলেন দ্বৈপায়ন। এই সেই স্থান, যেখানে ইতিমধ্যেই বসতি স্থাপন করেছেন অশ্বিনীকুমারদ্বয় সমেত বহু মুনি-ঋষি, এমনকী কিন্নর-কিন্নরীরাও। এঁদের জীবন-পাঁচালি নিয়ে দ্বৈপায়ন মাথা

না ঘামালেও তিনি এই স্থানটিকে বেছে নিলেন সাধনার ক্ষেত্ররূপে। তখনও জীবনের অতিব সুখ, সাফল্য দুঃখের বৃশ্চিক কর্কট তাঁকে প্রভাবিত করেনি। তিনি পরিপূর্ণ শুভ্র মন নিয়ে আরাধনায় বসলেন।

তবে একটি ভাবনা তাঁর মনে থেকে থেকে ঝিলিক দেয়। আমি কার উপাসনা করব? শিব না ব্রহ্মা? বিষ্ণু না সূর্য? লক্ষণীয়, তাঁর মনে কিন্তু কোনও মাতৃদেবীর নাম আসেনি।

তাঁর এই মানসিক দ্বিধা ও বিভ্রমকে দূর করতে তখন আসরে আবির্ভূত হলেন দেবর্ষি নারদ। বললেন, 'তুমি মহাশক্তির অধিকারিনী মা ভাগবতীর উপাসনা করো। উপাসনা সর্থক না হলেও ফললাভ ঘটতে পারে।'

দ্বৈপায়নের ধ্যান হয়েছিল খুব কঠিন। শতবর্ষ আরাধনা কররবার পর সিদ্ধিলাভ করলেন তিনি। সেই সিদ্ধির পুরস্কারস্বরূপ দ্বৈপায়ন লাভ করেন তাঁর পুত্র শুকদেবকে।

কৌতুহলোদ্দীপক বিষয় হল, শতবর্ষাধিক বৎসর বয়স্ক দ্বৈপায়ন যখন বিবাহ করলেন, তখনও তাঁর যৌবন পূর্ণাঙ্গরূপে বিদ্যমান।

তবে দ্বৈপায়নের স্ত্রী যে পদ্ধতিতে গর্ভবতী হলেন, সেটা এক অস্বাভাবিকের নিদর্শন। স্ত্রীর মুখগহ্বরে হঠাৎ একটি ছোট্ট শুক পক্ষী প্রবেশ করে এবং তিনি গর্ভবতী হলেন।

কালানুসারে ষোল বছর পর্যন্ত মাতৃজঠরে অবস্থান করেছিলেন শুকদেব। শুকদেবও তাঁর পিতৃদেবেরই মতনই জন্মমুহূর্তে গৃহত্যাগ করলেন। দেহে যৌবনের জোয়ার। কিন্তু মনে আশ্চর্য নিরাশক্তি।

জীবনের সকল সাধই অধরা। অথচ কোনও কিছুর প্রতি আগ্রহ নেই। কোনটি উচিত, কোনটি অনুচিত—এই সমস্ত নিয়ে ভ্রান্ত বা অভ্রান্ত ধারনা তাঁর মাথায় তখন নেই। তিনি জানেনও না, কোথায় চলেছেন? এমনকী, তিনি চলেছেন সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায়। হাঁটতে হাঁটতে চলে এলেন এক অপূর্ব জলাশয়ের তীরে। ওই সময় কোনও পুরুষের পক্ষে স্থানটি ছিল নীতিগতভাবে বর্জনীয়। কারণ, তখন সেখানে জলকেলি চলছে স্নানরতা পরমা সুন্দরী অপ্সরাদের। তাঁরা সকলে নগ্ন ও মনোজ্ঞ শুকদেবকে দেখলেন। কিন্তু তাঁদের একজনও কামভাবে মোহিত হলেন না। পরিবর্তে তাঁদের অন্তরে জাগ্রত হল মাতৃভাব। শুকদেবের জীবনবৃত্তান্ত তাঁদের অজানা। তবুও তাঁদের মনে হল, ইনি তাঁদের পুত্রের সমকক্ষ। নারীচরিত্রের বহুতর ভাবনার শ্রেষ্ঠটি অধিকার করে নেয় তাঁদের।

কিন্তু এর কিছুক্ষণ বাদেই পুত্রের সন্ধানে দ্বৈপায়ন সেখানে উপস্থিত হলে দেখা গেল একেবারে ভিন্ন প্রতিক্রিয়া। সুন্দরীরা লজ্জা পেলেন, শিহরিত হলেন, লজ্জা ও কামকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে জলে ডুব দিলেন।

পরে অপ্সরীরা উপলব্ধি করেন, তরুণ হয়েও শুকদেব নির্বিকার। অপাপবিদ্ধ। কামভাব তাঁকে পীড়িত করছে না। যৌনসঙ্গমের কোনও অভিজ্ঞতা বা আকুলতা তাঁর নেই।

কিন্তু ঋষি দ্বৈপায়নের কথা একেবারেই আলাদা। তিনি কেবল বৃদ্ধ ও প্রাজ্ঞ নন, অভিজ্ঞও। নারীসঙ্গমে এখনও দিব্যি সমর্থ এবং তাঁর এই শক্তি আরও বহুকাল অটুট থাকবে। সুতরাং একজন নগ্নিকা যুবতী যদি তাঁকে দেখে লজ্জিত হয় বা কামভাবে আক্রান্ত হয়, সেটা হবে তার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া।

শুকদেব বাড়িতে ফিরে আসায় দ্বৈপায়ন নিশ্চিন্ত। দ্বৈপায়ন শুকদেবকে বললেন, 'তোমাকে শাস্ত্র শিক্ষা দেবার শ্রেষ্ঠ গুরু হলেন বৃহস্পতি। বেআব্রু হয়ে চরকিবাজির দিন শেষ। আমি তোমাকে বৃহস্পতির নিকট পাঠাচ্ছি।'

বৃহস্পতি শুকের মেধা দেখে সন্তুষ্ট হলেন। শিক্ষা দিলেন ব্রহ্মচর্য পালনের রীতিনীতি। বেদ ও তৎসম্পর্কিত যাবতীয় ব্যাখ্যাও অধিগত হল তরুণ শুকদেবের।

এরপর দ্বৈপায়ন তাঁর পুত্রকে বিবাহ করতে বললেন, যেহেতু সংসারধর্মও একটা বিরাট শিক্ষা।

এবার কিন্তু শুক বেঁকে বসলেন। তিনি বিবাহিত জীবনে প্রবেশ না করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। নিজের কৌমার্যকে আজীবন সুরক্ষিত রাখতে চান।

দ্বৈপায়ন দেখলেন, তাঁর পুত্রটি বড় স্বভাবগম্ভীর। সর্বদা যেন কী ভাবনার অতলান্তে ডুবে আছেন। ওঁর মুখে হাসি ফোটাতে দ্বৈপায়নের পিতৃহৃদয় আকুল হয়ে ওঠে। বললেন, 'আমি যতদিন জীবিত আছি, ততদিন তোমার বিষণ্ণ ও গম্ভীর হয়ে থাকবার কোনও কারণ দেখি না। ঠিক আছে, আমি এবার তোমাকে এমন একটি স্থানে পাঠাব—যেখানে কেবলই সুখ ও আনন্দের হিল্লোল।'

'আপনি কোন স্থান ও ব্যক্তির কথা বলতে চাইছেন?'

'আমি বলতে চাইছি মিথিলার কথা—যেখানে রাজা জনক রাজত্ব করছেন।'

'অর্থাৎ যার অপার পিতৃস্নেহে মহামান্য সীতা প্রতিপালিত হয়েছিলেন?'

'যথার্থ। সেই জনক, যাঁর আত্মা অপাপবিদ্ধ, যিনি সদাই সত্যবাদী, সকল সময় প্রশান্ত চিত্ত। তিনি যোগসিদ্ধ ও জীবন্মুক্ত।'

'তুমি তাঁর এত প্রশংসা করছ! তাই আমারও খুব ইচ্ছে হচ্ছে তাঁর কাছে যাবার।'

শুকদেব রাজা জনকের নিকট গমন করলেন শিক্ষালাভের জন্য।

পুত্র চলে যাবার পর দ্বৈপায়নের কেমন যেন চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হল। তিনি খুবই অস্থির হয়ে পড়লেন। কেন এই অস্থিরতা, বুঝবার চেষ্টা করতেই তিনি দেখতে পেলেন তাঁর জন্মদায়িনী সত্যবতীকে।

বিপন্না জননী সত্যবতী তাঁকে স্মরণ করছেন।

এই অবধি লেখার পর অনিবার্যভাবে লেখকের মনে অবারিত হয়ে ওঠে মহাকাব্যিক যুগের রীতিনীতি, পারস্পরিক সম্পর্কের বন্ধন, মায়া, মমতা এবং দায়বদ্ধতার বৈচিত্র্য ও গভীরতা। এইগুলিকে বর্তমান যুগের প্রেক্ষিতে গ্রন্থিত করলে মনে হতে পারে, আধুনিকতার দৌড়ে আমরাই বরং সেই যুগের তুলনায় পিছিয়ে আছি ও সেই ব্যবধানকে ঘোচাতে আজও আমরা অক্ষম।

স্বামীর ঘর করতে যাবার আগে হেলেন যে একাধিকবার একাধিক পুরুষের সঙ্গে যৌনমিলনের স্বাদ নিয়েছেন, তার উল্লেখ প্রায় সকল প্রাচীন কবির লেখাতেই পাই। সেই মিলনের তেজ ও উদ্যম প্রশ্নাতীত। তাতে প্রেম, বেগ ও নিষ্ঠুরতা সকলই বর্তমান। কিন্তু গ্রীক ট্রাজেডির কোরাসের ধুয়া সেখানে নেই। যেন এইগুলিতে মানবমঙ্গলের শক্তি অন্তর্নিহিত রয়েছে। প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির মধ্যবর্তী যে দূরত্ব, তাঁকে অতিক্রম করবার জন্যই হেলেনের সৃষ্টি। তাই যুবতী হেলেন যেখন সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে শরীর চর্চা করেন, কবি সেখানে স্রষ্টার অনবদ্য সৃষ্টিকেই দেখতে পান, নৈতিকতার প্রশ্নই ওঠে না। ভারতে কোনও মহাকাব্যিক নারী চরিত্রে অতখানি উদ্দামতা লক্ষ্য না করা গেলেও তাঁদের কার্যকলাপ ও সেই কার্যের ওপর যুক্তির প্রলেপগুলি একবিংশ শতাব্দীতেও হজম করা কষ্টকর।

সীতা কিংবা দ্রৌপদীর কার্যকলাপে প্রবল উগ্রতার স্থান না মিললেও সত্যবতী একাই অনেকখানি 'শূন্যতা' পুরণ করেছেন। সত্যবতী তাঁর বিয়ের আগে ভাসমান নৌকার মধ্যে পরাশর মুনিকে দেহদান করেছিলেন। সত্যবতী কিন্তু সেদিন পরাশরের দ্বারা ধর্ষিতা হননি। পরাশরের সতৃষ্ণ অনুরোধ-উপরোধ কিছুটা দৃষ্টিকটু হলেও আধুনিকা তরুণী সত্যবতীর মনেও কামের সঞ্চার ঘটে ও তাঁর সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে যায়। তাই তিনি কৃপা করে পরাশর মুনির অবদমিত পৌরুষকে ব্যাপক মুক্তি দেননি, মিলনকালে তাঁর মধ্যে ছিল

না কোনও প্রেমহীনতার উপলব্ধিও। বিবাহপূর্ব জীবনের সেই ঘটনাকে সত্যবতী নিছক কুলকুচো করে ফেলে দিতে পারেননি, যেহেতু ওই মিলনের ফলেই দ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের জন্ম।

শতাধিক বৎসর অতিক্রান্ত হবার পর সেই বয়স্কা সত্যবতী তাঁর প্রথম সন্তান দ্বৈপায়নকে দিয়ে এমন কয়েকটি কাজ করালেন, শুধুমাত্র ঘটনা হিসেবেও যা আমাদের স্তম্ভিত করে।

দ্রৌপদী ও সীতার বেলায় যেমন সংশ্লিষ্ট রমণীরত্ন লাভে একাধিক প্রতিদ্বন্দ্বীর সন্ধান আমরা পাই, সত্যবতীর ক্ষেত্রে তা দৃষ্ট নয়।

সত্যবতী সহজেই শান্তনুর গলায় মালা পরাতে পেরেছিলেন।

আদতে সত্যবতীর সঙ্গে শান্তনুর জীবন-অভিজ্ঞতার সাদৃশ্যটুকুও লক্ষণীয়। পার্থক্য ছিল বংশ গৌরবে। শান্তনু চন্দ্রবংশের সন্তান। চন্দ্রবংশের ধারাবাহিকতায় আমরা যে সমস্ত রাজদণ্ডধারী ব্যক্তিত্বদের সন্ধান পাই, তাঁরা হলেন পরুরবা, নহুষ, যযাতি, যদু, ভরত, পুরু, দুষ্মন্ত, শান্তনু, ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, দুর্যোধন, যুধিষ্ঠির প্রমুখ।

এঁদের মধ্যে শান্তনুর সঙ্গে সত্যবতী পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। সত্যবতীর সঙ্গে শান্তনুর যখন পরিচয়, তখন দু'জনেরই মানসিক অবস্থা ভালো নয় এবং তাঁরা দু'জনে নিজ নিজ জীবনের বাঁকমুখে এসে দাঁড়িয়েছেন।

শান্তনুর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল গঙ্গার। কিন্তু গঙ্গা তাঁদের সন্তান দেবব্রত (পরবর্তী কালে ভীষ্ম নামে পরিচিত)-কে জন্ম দিয়েই স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে স্বামীগৃহ ছেড়ে চলে যান। তবে নবজাতককে সঙ্গে নিয়ে যাননি—এটাই যা সান্ত্বনা শান্তনুর।

অন্যদিকে মুনি পরাশর যুবতী, লাবন্যময়ী সত্যবতীকে উপভোগ করেন, তাঁর গর্ভসঞ্চার ঘটান এবং তারপর পুত্র দ্বৈপায়নও মাকে ছেড়ে চলে গেলেন।

এইরকম ক্লেদাক্ত অভিজ্ঞতার প্রভাব দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়েছিল সত্যবতীর জীবনে। একজন পোড়-খাওয়া নারীর মতনই অতঃপর তিনি নিজের অফুরন্ত যৌবনকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেন স্বীয় স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখতে।

শান্তনু সত্যবতীর প্রেমে সাংঘাতিকভাবে মজলেন। সুযোগ বুঝে নিজের স্বার্থকেও সুরক্ষা দিলেন সত্যবতী। তবে তাঁর স্বার্থ-প্রজ্ঞার স্বরূপে ছিল অপত্য স্নেহ। নিজের ভাবী সন্তানদের স্বার্থরক্ষাই ছিল তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। সত্যবতী

যে শান্তনু ও গঙ্গার পুত্র ভীষ্মের চরিত্রকে ভালোভাবে জরিপ করবার চেষ্টা করেছিলেন, এ ব্যাপারে আমি নিঃসন্দেহ। ভীষ্মের ন্যায় ন্যায়বান, দৃঢ়চিত্ত, কর্মঠ হয়েও অন্তর্মুখীন ব্যক্তিত্ব সর্বকালে এক ব্যতিক্রমী চরিত্র। সেই ভীষ্মকে সামনে রেখে সত্যবতী শান্তনুকে দিয়ে শপথ করিয়ে নেন যে, একমাত্র সত্যবতীর গর্ভজাত সন্তানই শান্তনুর পরে রাজসিংহাসনে আরোহন করতে পারবে। শান্তনুর ঔরসে গঙ্গার গর্ভজাত পুত্র ভীষ্মের কোনও অধিকারই থাকবে না সিংহাসনের ওপর। ভীষ্মের প্রতি মারাত্মক অবিচার হবে—এই বিবেচনার শান্তনু ভেঙ্গে পড়লে ভীষ্মই এগিয়ে এসে সত্যবতীকে কথা দিলেন যে তিনি ভবিষ্যতে কখনও রাজসিংহাসন দাবি করবেন না। ভীষ্মের এই ত্যাগ, গোঁড়ামি, দায়বদ্ধতা ও পিতৃপ্রেম তাঁকে মহাভারতের শ্রেষ্ঠ চরিত্ররূপে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। ম্যাক্সমূলারের কথায়, 'এই রকম বলিষ্ঠ চরিত্রায়ন দেখবার পর আর নিশ্চুপ থাকা সম্ভব নয়। আমি এই মহাকাব্যকে বার বার মাথায় তুলে নিতে বাধ্য।'

শান্তনুর সঙ্গে সত্যবতীর বিয়ে হল। কিন্তু অলক্ষ্যে তির্যক হাসি হাসলেন দৈব—যিনি গ্রীক পুরাণে দেবী নেমেসিসরূপে পরিচিতা। এই দেবী নিজের ছাঁচে ফেলে প্রভুত প্রত্যাশা ও সম্ভাবনাকে অপ্রত্যাশিতভাবে ধ্বংস করে থাকেন।

সত্যবতী পর পর দুটি সন্তানের জন্ম দিলেন এবং দুটি সন্তানেরই মৃত্যু ঘটল। বিশেষত বিচিত্রবীর্য যখন মারা যান, তাঁর দুই স্ত্রী বর্তমান। সত্যবতীর ইচ্ছাপূরণ তো হলই না, পরন্তু ঐতিহ্যাশ্রয়ী কুরুবংশের লোপ পাবার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠল।

এইরকম পরিস্থিতিতে সত্যবতী যা করতে চাইলেন, সেটা আজকের দিনে অবশ্যই নীতি ও সংস্কার-ভাঙা বিদ্রোহ। আমাদের পারস্পরিক পারিবারিক সম্পর্কের ভিতটাকেই নাড়িয়ে দেয়। কোনটা ঠিক, কোনটা বেঠিক, কোনটা ধর্ম, কোনটা অধর্ম—তা নির্ণয়ের ধোঁয়াশা আমাদের এক বাঁকমুখে এনে দাঁড় করায়।

সত্যবতী ভীষ্মের দিকে ঘুরে তাকালেন। যে ভীষ্মের প্রতি তিনি ছিলেন সন্দেহপরায়ণ ও যাঁকে সিংহাসন থেকে দূরে সরিয়ে রাখবার জন্য কত রকমের নিষ্ঠুর আঁক কষেছেন, সেই গঙ্গাতনয় দেবব্রতই তখন তাঁর কাছে সকল মুশকিলের আসান। দেবব্রত সেই দুর্লভ তরুণ—যিনি সত্যপালনের জন্য জীবন বিসর্জন দিতে পারেন, যিনি কোনও সুন্দরীর সংশ্রবে আসতে চান না,

খুনসুটিতে অনাসক্তি, পরিপূর্ণভাবে বীর্যবান এবং গুরুজনদের কাছে সকল সময় বিনম্র।

এ হেন ভীষ্মকে নিকটে ডেকে এনে সত্যবতী অনেক কথা বললেন। দেবব্রত, তুমি এক গৌরবদীপ্ত বংশের একমাত্র প্রদীপ শিখা। কিন্তু আমি ভাগ্যহীনা। তাই এমত বংশের ধারাবাহিকতা রক্ষার দায়িত্ব ছিল আমার গর্ভজাত যে দুই পুত্রসন্তানের ওপর, তাঁরা দুজনই অকালপ্রয়াত। তুমি তোমার ভাই বিচিত্রবীর্যকে এমনই স্নেহ করতে, যা একজন পিতার হৃদয়ে জাগ্রত থাকে তাঁর আত্মজের প্রতি।

বিচিত্রবীর্যকে আমরা বাঁচাতে পারিনি। কিন্তু তার দুই বিধবা পত্নী অম্বিকা ও অম্বালিকা বর্তনান।

এই অবধি বলবার পর সত্যবতী ভীষ্মের মুখের দিকে তাকালেন।

ভীষ্মের মুখে ভাবান্তরের ছায়াপাত ঘটেনি। তিনি পূর্ববৎ নির্বাক নিশ্চল অনড়। সেই পাথরে চাঞ্চল্য আনতেই যেন সত্যবতী এবার অম্বিকা এবং অম্বালিকার রূপ-যৌবনের তাৎপর্যময় বর্ণনা দিতে লাগলেন। আমার এই পুত্রবধূ দুটি অনন্যা। সকল দিক বিচার করে দেখো, ওরা কত অসাধারণ। বড় বংশের কন্যা। প্রাক-বিবাহিত জীবন অতিবাহিত হয়েছে স্নেহ ও ঐশ্বর্যের মেলবন্ধনে। কিন্তু বিবাহিত জীবনে ওরা তো কিছুই পেল না।

তুমি তোমার পৌরুষদীপ্ত হৃদয় ও বাসনা নিয়ে ওই দুটির দিকে তাকাও। প্রত্যক্ষ জগতে একজন নারীর মধ্যে যতরকমের ঐশ্বর্য থাকতে পারে, তা সকলই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে তাদের মধ্যে পরিস্ফুট। কিন্তু এইগুলি অব্যবহৃত থাকায় তাদের দু'জনের বড়ই যন্ত্রণা ও গ্লানি। তুমি ওদের যন্ত্রণা ও গ্লানি থেকে নিষ্কৃতি দাও। তোমার সঙ্গে ওদের পর্যায়ক্রমে মিলন ঘটকু। যুগপৎ তোমার ও তাদের অপ্রাপ্তির আর্তি আর থাকবে না। এবং এইভাবে অম্বিকা ও অম্বালিকা গর্ভবতী হয়ে পড়লে এই মহান কুরুবংশের ধারাও অক্ষুণ্ণ থাকবে।

কথাগুলি প্রলোভিত করবার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু ভীষ্ম যে সত্যপালনের রথচক্রে পিষ্ট এক প্রাণ। সত্যবতী-শান্তনুর বিবাহকালে তাঁর প্রতিজ্ঞা ছিল—তিনি তাঁর জীবৎকালে কোনও নারীসংসর্গ করবেন না। আজ কীভাবে সেই অঙ্গীকার থেকে তিনি সরে আসতে পারেন?

এটাই হল মহাকাব্যিক যুগের ধর্ম। সেখানে বংশ রক্ষার জন্য এইরকম ব্যবস্থার আশ্রয় নেওয়া নিন্দনীয় নয়। আবার সত্যপালনের খাতিরে

আত্মপীড়ন স্বাভাবিক। সেইসঙ্গে এটাও আসছে যে, যিনি বীর ও উপযুক্ত তিনি নিজের কাঙ্খিত রমণীরত্ন লাভে প্রয়োজনে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবার হকদার। শর্ত কেবল একটাই—সংশ্লিষ্ট নারীর সম্মতি অত্যাবশ্যক। রাবণের সঙ্গে জুটি বাঁধতে সীতা কদাপি সম্মত হননি। দ্রৌপদী বরাবরই দুর্যোধনকে হেয় নজরে দেখতেন। কিন্তু হেলেন প্যারিসের রূপ ও শক্তিতে ভালোভাবেই মজে গিয়েছিলেন। এই দিক থেকে বিচার করতে বসলে সীতা ও দ্রৌপদীকে এক শিবিরে রাখা গেলেও যেতে পারে, কিন্তু হেলেনকে রাখতে হবে অন্য একটি শিবিরে। তবে তিন দেবীরই হাতে এক একটি নিখুঁত শায়ক—যাদের অব্যর্থ ব্যবহারে তিন-তিনটি মহা বিনষ্টি। পুরুষবৃত্তের সমূল বিনাশ। স্ত্রীশক্তির খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করুন ; দেখবেন, ভারতবর্ষ ও গ্রীস কাছাকাছি চলে আসছে। সীতা, দ্রৌপদী ও হেলেন যেন একই লাইনে দাঁড়িয়ে। এক সাদৃশ্যকে বহন করে হিন্দুধর্ম ও গ্রীসের ধর্মবিশ্বাস যেন একে অপরের পরিপূরক হয়ে দাঁড়ায়। মুখরোচক গল্পগুলিকে একপাশে সরিয়ে রেখেও দেখতে পাবেন, খ্রিস্টান জ্ঞানবাদীরা বলছেন—প্রথম মানুষ হচ্ছেন আদি সত্ত্বা। হুঁশের জন্ম আগে। তার থেকে আসে মানুষ। তারপর আসে ভক্তি এবং নির্ভরতা। এই ভক্তি-নির্ভরতাকে খ্রিস্টানরা বলে থাকেন 'হোলি গোস্ট।' এই হোলিগোস্টই হল স্ত্রী-শক্তি। স্ত্রীশক্তি থেকেই উদ্ভব পুরুষসত্তার। স্ত্রীশক্তি তাই সবসময় প্রবলতর ভূমিকা নেয় পুরুষসত্তাকে হাজারো উপায়ে উপরিতল থেকে নিম্নতল অবধি কিছুকালের জন্য হলেও অধিকার করে নিতে। তখন দেহীসত্তা এমন প্রবল হয়ে ওঠে যে পুরুষের যাবতীয় অনুভব প্রবলভাবে ধাক্কা খায়। বহু বিপর্যয়ের স্বতঃনির্মাণ ঘটে।

যে পুরুষ ওই অভিঘাতের মুখেও অবিচলিত সুস্থিত কিংবা অমনস্ক থাকতে পারেন, তিনি অনন্য।

এইরকম এক বিরল পুরুষ চরিত্র ভীষ্ম। সেক্সচুয়াল আর্জ ও সেক্সচুয়াল এথিকস—এই দুটোই যখন তিনি অতিক্রম করেন, আমাদের মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। ভীষ্ম কী তাঁর ধর্মরক্ষা করলেন ? উত্তর হল, করলেন। তিনি তাঁর ক্ষত্রধর্মকে রক্ষা করলেন। তখনই প্রশ্ন ওঠে, সত্যবতী কী ধর্ম রক্ষার জন্যই ব্যাকুল হয়ে এই সমস্ত করতে চাইছিলেন ? এর উত্তর হল, ঠিক তাই। বংশ রক্ষার জন্য প্রয়োজন ছিল ওই সমস্ত পদক্ষেপ। সেখানে আর তখন উচিত-অনুচিতের প্রশ্ন আসে না। সেটাই তখন বড় ধর্ম—যেখানে বেসুরো তারগুলিকেই সংবদ্ধ করে নতুন সুর বাঁধতে হবে ধর্মেরই মোড়কে বা ঘোরাটোপের মধ্যে থেকে।

ভীষ্ম অস্বীকৃত হলেন। স্বল্পালোকিত বিবাদে সত্যবতী যখন মুহ্যমান, তখন ভীষ্মই তাঁকে সমাধানের পথ দেখাতে যে পরামর্শ দিলেন, সেটাও তাঁর নবরসায়নে কম চমকপ্রদ নয়।

সত্যবতী তবুও ভীষ্মকে তাঁর দুই বিধবা ভ্রাতৃবধূকে বিয়ে করে গর্ভবতী করবার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু ভীষ্ম যে প্রস্তাব রাখলেন, তা আরও বৈপ্লবিক। একবিংশ শতাব্দীতেও আমাদের নানান খণ্ডিত নীতিবোধের মধ্যেও যাকে স্থান দেওয়া কার্যত অসম্ভব।

ভীষ্ম বললেন, 'অম্বিকা ও অম্বালিকা যদি বন্ধ্যা নারী না হয়, তবে তাদের গর্ভবতী করবার জন্য আর একটি সঙ্গত উপায় বর্তমান। আমরা একজন সক্ষম পুরুষের সন্ধান করতে পারি। তিনি ব্রাহ্মণ হলেই বেশি ভালো নয়। তিনি বিদ্বান ও তেজসম্পন্ন পুরুষ হবেন। তাঁর এই কাজের জন্য আমরা তাঁকে উপযুক্ত মূল্য দেব।'

ভীষ্মের এই প্রস্তাবে সত্যবতী সমাধানের আলো দেখতে পেলেন। তিনি স্মরণ করলেন তাঁর কুমারী অবস্থায় প্রাপ্ত পুত্র দ্বৈপায়নকে। ভীষ্ম যে ধরণের পুরুষের দ্বারা দুই ভ্রাতৃবধূকে গর্ভবতী করবার পরামর্শ দিয়েছিলেন, তার সবগুলিই পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল দ্বৈপায়নের মধ্যে। আপাতভাবে দ্বৈপায়নের নিগেটিভ পয়েন্ট ছিল দুটো—প্রথমত, তাঁর বয়স তখন অনেক। অম্বিকা ও অম্বালিকার কাছে তিনি তো এক বৃদ্ধব্যক্তি, যদিও তাঁর যৌনক্ষমতা তখনও ঈর্ষনীয়। দ্বিতীয়ত, তাঁর রূপ—যা যে কোনও তরুণীকে স্বেচ্ছাসঙ্গমে নিষ্ক্রিয় করতে পারে।

সে যাই হোক, মাতৃ আজ্ঞা পালন করতে দ্বৈপায়ন দুই স্বামীহারা ভ্রাতৃবধূর সঙ্গেই সঙ্গম করেন এবং অনিবার্যভাবেই দুই যুবতী গর্ভবতী হন। কেবল তাই নয়। রাজবাড়ির এক যুবতী পরিচারিকাকেও তিনি গ্রহণ করেন, যার পরিণতিস্বরূপ বিদুরের জন্ম। লক্ষমীয় এই যে, ইত্যাকার কর্ম যেভাবে নীতির আগমার্কা ছাপ পেয়ে যায় মহাভারত কিংবা ইলিয়াড-ওডিসিতে, রামায়ণ মহাকাব্যে কিন্তু তা এক অতি ভয়ঙ্কর অপরাধ। অর্থাৎ রামায়ণ যখন রচিত হয়, সেই সময়কার ন্যায়-নীতি বোধ পরবর্তী মহাবারতীয় যুগে আমূল পরিবর্তিত হয়ে যায় সেই ন্যায়-নীতির যুক্তিতেই। মহাভারতে সবচেয়ে বড় ন্যায় হচ্ছে সময়ের চাহিদাকে মান্যতা দেওয়া। বৃহৎ প্রয়োজনের স্বার্থে পুরনো সংস্কার ও বিশ্বাসকে চূর্ণ করা। কেবল বৃহৎ প্রয়োজনে নয়, নিছক ব্যক্তিগত বাসনাকে তৃপ্ত করতে গিয়ে যদি কখনও প্রথা ভাঙ্গা হয়, তাকেও প্রতিষ্ঠা

দিতে যুক্তির অভাব ঘটে না। এই ধরণের বহু চমকপ্রদ বিধিবর্হিভূত ঘটনাকে আশ্চর্য উদারতার সঙ্গে মেনে নিয়েছিলেন ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির।

হোমারের কাব্যে জীবন এবং যাপনের ক্ষেত্রে স্ত্রীর ওপর স্বামীর অধিকারবোধের জোরদার স্বীকৃতি থাকলেও সেই স্ত্রী যদি পরপুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হন, শাস্তির দৃষ্টান্ত নাস্তি।

হেলেন তাঁর বিয়ের আগে ও পরে যে সমস্ত কর্ম স্বেচ্ছায় করে গেছেন. তার জন্য তাঁকে তো তেমন শাস্তি পেতে হয়নি। অর্থাৎ প্রেমের নিষ্কলুষতাকে [Love uncorrupted] রক্ষার ব্যাপারে কোনও আদর্শগত তকমা হোমারের রচনায় অলভ্য। এমনকী নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের কথাও সেখানে বলা হয়নি। একে কিন্তু পশ্চিমী কালচারের চিরন্তন স্বরূপ ভাবাটাও অযথার্থ। কারণ, ওই কালচারে প্রথম জীবনে উদ্দাম হয়ে ওঠার পর লিও টলস্টয় যখন পরবর্তী জীবনে আশ্চর্য সংযত, শান্ত ও নিয়মনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন, তাকেও কিন্তু পশ্চিমী দর্শন প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জানিয়েছে। ১৪ জুলাই, ১৯১০ লিও টলস্টয় তাঁর স্ত্রীকে যে চিঠিখানা লেখেন, এখানে তার একাংশকে তুলে ধরছি ঃ

'....Try to Think lelmly, dearest, try to listen to your heart, try to feel and you will decide everything in the right way.

As for myself, I must say that I have decided everything for my art is such a way that I cannot, cannot decide otherwise. stop torturing yourself, darling—not others, but yourself—because you are suffering a hundred times than anyone.'

স্ত্রীর কাছে এইরকম মর্মস্পর্শী আবেদনও কিন্তু উপেক্ষিত হয়েছে সংশ্লিষ্ট মহিলার দ্বারা। মানব চরিত্রের বিসর্পিল অলিগলি নিয়েই ওই সমস্ত মহাকাব্য। ন্যায় ও নীতিকে সেখানে ইচ্ছেমতন যুগধর্মের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে ভাঙা হয়েছে, গড়া হয়েছে। তিন প্রধান নারীচরিত্র—সীতা, দ্রৌপদী ও হেলেনর গঠন ও কার্যকলাপ তাই তিন প্রকারের।

ধর্মের বর্ম যুগে যুগে বদলেছে। ধর্ম মানে দেব-দেবীর স্তুতি নয়। ধর্ম মানে ব্রত পালনের মধ্য দিয়ে নিজের অভিসন্ধিকে বাস্তব রূপ দেবার প্রয়াস নয়। ধর্মের প্রধান লক্ষণ হল তার মানবিক মুখ—যেখানে ক্ষমা আছে ও প্রশ্রয়ের মধ্য দিয়ে সংশোধনের লক্ষও দেখা যাচ্ছে। যুধিষ্ঠির নিজমুখে স্বীকার করেছেন, 'ধর্ম যে কী, তা নিয়ে সংশয়ের বিস্তর অবকাশ। বেদ, স্মৃতি, সদাচার—এই তিন দিশাও সংশয় দূর করতে অসমর্থ।'

আবার মানুষ কখন ধর্মের উদাহরণ টানে ? সে উদাহরণ টানে অপরের অন্যায় ও পাপকে আঙুল তুলে দেখাবার সময়। নিজে যদি অপরাধ করে, তাহলে সেই অপরাধকে নিরপরাধ প্রমান করতে অথবা অপরাধটিকে লঘু করে দেখাতে সে ন্যায় ও নীতির অভিধাটাই বদলে দেবার চেষ্টা করবে। সুতরাং সত্যবতী, কুন্তি, দ্রৌপদী প্রমুখ রমণীরত্নকে আদর্শ বানিয়ে এযুগের গৃহিণীরা যদি ভালোবাসার সেতু নির্মাণ করতে উদ্যোগ নেন, ব্যাপারটা কোথায় দাঁড়াবে ভাবতে পারছেন ?'

দুর্যোধন কোনও অস্বাভাবিক চরিত্র নয়। সর্বকালে সর্বত্র এরকম মানুষের দেখা আমার পেয়ে থাকি। দুর্যোধনের মতন তাঁরা সকলেই যে নিদারুণভাবে পরিণামে বিধ্বস্ত হয়েছিলেন, একথা বলা যাবে না। হিটলার, সাদ্দাম বা গদ্দাফিকে নিকেশ করা সম্ভব হলে যোশেফ স্তালিন কিন্তু জীবনের অন্তিমলগ্ন অবধি একই ধরনের অহংসর্বস্ব দাপট দেখিয়ে গেলেন এবং বহুজনের কাছ থেকে স্তুতিও পেয়ে চলেছেন অদ্যপি।

পাণ্ডবদের প্রতি দুর্যোধন বরাবর খড়্গহস্ত। জ্ঞাতিশত্রুরাই যে সবচেয়ে বড় শত্রু হয়ে থাকে, দুর্যোধন তার মস্ত উদাহরণ। পাণ্ডবদের জন্য পাঁচটি গ্রাম দিতেও তিনি রাজি হননি। তাঁর ক্রোধ ও অসূয়াতে ঘৃতাহুতি দিয়েছিলেন দ্রৌপদী। দ্রৌপদীর উন্নাসীকতা দুর্যোধনের কাছে ছিল অসহ্য, বিশেষত যে দ্রৌপদীর প্রতি তাঁর যে দুর্বলতাও ছিল।

রামায়ণের যুগে আদর্শ রমণী বলতে যা বোঝাত, মহাভারতীয় যুগে তার আমূল পরিবর্তন বিস্ময়কর। রামায়নের নায়িকা সীতাকে সর্বক্ষণ সন্ত্রস্ত থাকতে হত—যাতে রাম ব্যতীত অন্য কোনও পুরুষের স্পর্শে তাঁর শুচিত্ব নষ্ট না হয়। এমনকী পুত্রবৎ হনুমানকেও তিনি স্পর্শ করতে অস্বীকার করেন। প্রবল প্রতাপ হনুমান সাগর পার হয়ে লঙ্কার অশোক কাননে সাধারণের দৃষ্টির অন্তরালে বন্দিনী সীতাকে গিয়ে বললেন, 'মা, আপনি আমার পিঠে বসুন। আমি শূন্যপথে আপনাকে নিয়ে প্রভু শ্রীরামের নিকট নিয়ে যাব।'

সীতা রাজি হলেন না। তাঁর মন তখন কানায় কানায় আশঙ্কায় পরিপূর্ণ। কারণ, তিনি রামের মানসিকতাকে খুব ভালোভাবেই চেনেন। সন্তানবৎ হলেও হনুমান একজন পূর্ণবয়স্ক পুরুষ। অতয়েব, একজন পুরুষের পিঠে উঠলে স্পর্শদোষে সীতা কলুষিত হবেন। রামের ভ্রুকুঞ্চনের পাত্রী হয়ে যাবেন সীতা। একেই অপহরণকালে লঙ্কারাজ রাবণ তাঁকে কোলে তুলে নিয়ে রথে উঠেছিলেন এবং সেই ঘটনা যে তাঁরই অপরাধরূপে গণ্য হবে না, এমন

স্থিরতা তাঁকে কে দেবে ? রামের ইত্যাকার ন্যায়বিচারের নমুনা বা সম্ভাবনা সীতাকে সর্বক্ষণ ভীত করে রেখেছে। ন্যায়বিচার সমতা ও সামাজিক শান্তি-কল্যানের নামে এটা যে একজন নিরপরাধিনীর ওপর বাঁধাধরা ও নিরন্তর মানসিক অত্যাচার, রামের সেই বোধ ও বিবেককে ঘুমন্ত দেখে আমরা বিস্মিত হই। কিন্তু এর ঠিক বিপরীতে হেলেন ও দ্রৌপদী। তাঁরা সীতার তুলনায় যে ধরনের অবাধ স্বাধীনতা ও ইচ্ছাপুরণে অধিকার পেয়েছেন, তা এই একবিংশ শতাব্দীর মুসাফিরখানাতেও কদাচিৎ লভ্য।

আসল কথা সময় প্রবহমান। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী ও বিচারবুদ্ধিতেও পরিবর্তন অপ্রতিরোধ্য। পরিপার্শ্ব দৃশ্য ও ঘটনা তাই বদলায়। শ্যাওলা ধরে না।

পরপুরুষের ছোঁওয়া লাগলেই নারী অপরাধিনী হয়ে গেলেন—এইরকম একটা উদ্ভট গোঁড়ামির কথা মহাভারতীয় যুগের ভারতবর্ষ বা হেলেনের গ্রীসে কেউ ভাবতেও পারত না। হেলেন যে তাঁর বিবাহপূর্ব জীবনে একাধিক পুরুষের কাছ থেকে যৌনসুখ আদায় করে নিয়েছিলেন, তা উপলব্ধি করতে মুহূর্তগুলিকে আর কল্পনায় গড়ে নেবারও দরকার পড়ে না। অনুরূপভাবে সত্যবতী, কুন্তি প্রমুখ 'সতী'রা তাঁদের বিবাহপূর্ব জীবনে চুটিয়ে প্রেম করেছেন, সংসর্গে রত হয়েছেন, এমনকী পুত্রবতীও হয়েছেন। আর 'পরমা সতী'র শিরোপাপ্রাপ্ত দ্রৌপদীর তো আবার পঞ্চস্বামী। পঞ্চস্বামীকে সমান প্রেম ও সোহাগ দেওয়া কী সম্ভব ? চতুর কৃষ্ণ ঠিক বুঝতেন দ্রৌপদীর মানসিকতা। পঞ্চস্বামীর মধ্যে অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদীর টান ছিল বেশি। আর পঞ্চস্বামীর মধ্যে ভীমই যেন ছিলেন দ্রৌপদীর প্রেমে সর্বাধিক প্রভাবিত ও দায়বদ্ধ। দ্রৌপদীর অপমানে ভীম যতটা ক্রুদ্ধ ও বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন, অন্য চার পাণ্ডবদের মধ্যে সেরকম তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। যুধিষ্ঠিরের তো নয়ই। তিনি তো দ্রৌপদীকে নিছক এক পণ্যের পর্যায়ে টেনে নামান। আবার দ্রৌপদী যে পঞ্চস্বামীতেই তৃপ্ত, এরকমটি ভাবার অবকাশ কম। কারণ, পরবর্তীকালে দ্রৌপদী যখন শুনলেন যে কর্ণ আদতে জন্মসূত্রে আর পাণ্ডব, তিনি মনে মনে কর্ণকেও কামনা করেছিলেন।

সুতরাং ত্রিকন্যার আলোচনায় সীতা দ্রৌপদী ও হেলেনের কাছ থেকে বহু দূরত্বে অবস্থান করছেন। স্বামীর কাছ থেকে সুবিচার পাননি। সমাজের কাছ থেকে তো নয়ই।

রামায়ণে যা স্পর্শ দোষ, মহাভারতে এবং ইলিয়াড-ওডিসিতে তা এক

বিকট হাস্যরসের কারণ হতে পারে মাত্র। দুঃশাসন কেশসমেত দ্রৌপদীর বিভিন্ন অঙ্গে তাঁর থাবা বসিছেন। উল্লসীত দুর্যোধন নিজের ঊরু দেখিয়ে দ্রৌপদীকে সেখানে এসে বসতে বললেন। আর জয়দ্রথের সঙ্গে দ্রেপেদীর টানাহেঁচড়ার যে আখ্যান-বয়ান আমরা পাই তাতে মনে হবে জয়দ্রথ বুঝি সেখানে ধর্ষণ করতে উদ্যত হয়েছিলেন। দ্রৌপদীর বাহুবলও কম নয়। তাঁর এক ধাক্কায় জয়দ্রথের মতন বলবানও একবার কুপকাৎ হয়েছিলেন। অবশ্য তিনি দ্রৌপদী-হরণে সফলও হন। দ্রৌপদীকে নিয়ে উত্তেজক ঘটনা মাঝে মাঝেই ঘটেছে। এমনকী বনবাসকালে কীচকও তাঁর পিছনে লেগেছিল। অতশত বিচিত্র ও দুঃসাহসিক কর্মকাণ্ড সত্বেও দ্রৌপদী যে কী কারণে সতী-সাধ্বিদের তালিকায় প্রথম কয়েকজনের একজন হয়ে রইলেন, রসজ্ঞ ব্যক্তিদের কূটাভাসে বার বার সেই প্রশ্ন উঠে এসেছে।

সেই নিক্তিতে সীতার অত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা এককথায় অকল্পনীয়। অমন এক স্ত্রীর প্রতি স্বামী রামচন্দ্রের যে ব্যবহার, আধুনিকোত্তরবাদ তাকে একবিন্দুও সমর্থন করে না। রাজধর্মের বর্মেও রাম এখানে আত্মরক্ষায় অসমর্থ। এই যুগে শিক্ষিত ও মুক্ত মন গঠিত হয় যে ভাববীজ নিয়ে, সেখানে ওই যুক্তি পত্রপাঠ খারিজ হয়ে যায়। সীতার ওপর মানসিক অত্যাচারের স্বপক্ষে রামের ব্যাখ্যা 'অঙ্কম্, আরোপ্য তু পুরা রাবণেন বলাদ্ ধৃতাম্।' অর্থাৎ ওহে সীতা, তোমাকে তো রাবণ কোলে তুলে নিয়ে গিয়ে তাঁর রথে চাপিয়েছিল। সুতরাং তোমার সতীত্ব তো প্রশ্নাতীত নয়।

এর প্রত্যুত্তরে সীতা এক চিরন্তন অসহায়া রমণী। রাবণ যে আমাকে কোলে তুলে নিয়ে রথের ওপর গিয়ে বসে, সেটা কী আমার দোষ? আমি তো আমার সাধ্যানুসারে ঈপ্সিত প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করেছি। আমি নিরবচ্ছিন্নভাবে রাবণকে আঘাত হানার চেষ্টা করেছি। সমানে গলা ফাটিয়ে ডেকেছি স্বামী ও দেবরকে। আর তুমি তো জানো, প্রাকৃতিক নিয়মেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীর তুলনায় পুরুষ অধিকতর শারীরিক শক্তির অধিকারী হয়ে থাকে। আমার কী সাধ্য যে রাবণের মতন অতি বলবান পুরুষের গ্রাস থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারি?

আশ্চর্য, সীতার এই আর্তি মর্যাদা পায়নি রামের কাছে। রামের যথাযথ চরিত্রায়নের পর এ যুগের কোনও কন্যা বোধহয় রামের ন্যায় এক ব্যক্তিকে জীবনসঙ্গীরূপে গ্রহণ করতে দ্বিধা করবে। এটা কোনও পুনরাবিষ্কৃত তত্ত্ব নয়। বহু পূর্বসূরীর গ্রন্থনায় এই ভাবনাই উদ্ভাসিত।

হেলেনের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কী হয়েছিল, তার বর্ণনা ও ব্যাখ্যা একমাত্রিক নয়। এইরকম বলা হয়েছে যে দেবতা জিউসের খুব বাসনা জেগেছিল হেলেনকে ভোগ করবার জন্য। কিন্তু হেলেন ততদিনে স্পার্টার রানী এবং তিনি একটি কন্যা সন্তানের জন্মও দিয়েছেন। স্পার্টা থেকে ফুঁসলে বা অন্য কোনও উপায়ে হেলেনকে নিয়ে আসবার জন্য জিউস নিয়োগ করলেন ট্রয়ের যুবরাজ প্যারিসকে।

প্যারিস ছদ্মবেশে হাজির হলেন স্পার্টায়। যেহেতু স্পার্টার নিরাপত্তা ব্যবস্থা বেশ আঁটোসাটো, তাঁকে ট্রয়ের একজন দূত হিসেবে প্রাসাদে প্রবেশ করতে হয়েছে। যথাকালে তাঁর হেলেন-দর্শনও ঘটে এবং স্পার্টার রানীর অসামান্য রূপ ও যৌবনের ঢল দেখে স্বয়ং মোহিত হন। তাঁর সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত। চিত্তের নির্মল বিকাশ কামনার দ্বারা আচ্ছন্ন। তিনি অনৈতিকতার কাছে আত্মসমর্পণে বাধ্য হলেন। তিনি যে স্বয়ং জিউসের হয়ে কাজ করতে এসেছেন, তা বিস্মৃত হলেন।

অন্যদিকে হেলেনও প্যারিসের সুঠামদেহ ও উজ্জ্বল দুই চক্ষুর প্রভাবে বিচলিত। তাঁর বিবাহিত জীবনে স্বামীর প্রতি যে একনিষ্ঠ অনুরাগ ছিল, তা টাল খায়। তিনি নারী হিসেবে তাঁর যে জন্মগত নিজস্ব অধিবিদ্যা, তাকে কাজে লাগালেন। তাঁদের মধ্যে বাক্যবিনিময় হল। নিভৃতে ও নির্জনে। হেলেনের দেহ থেকে নির্গত নির্যাস প্যারিসকে এতই উত্তেজিত করে তোলে যে তিনি একসময় প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়েও হেলেনকে আলিঙ্গন করেন। তৎপরে ধর্ষণও করেন। অর্থাৎ হেলেন অতদূর যেতে অস্বীকৃত ছিলেন। প্যারিসকে বাধাও দিয়েছিলেন। এটা অবশ্য ঐতিহাসিক হেরোডেটাসের অভিমত। কবি সাইপ্রা [Cypria] কিন্তু বলেন, 'ঘটনাটা আদৌ ধর্ষনের অভিধা পেতে পারে না। কারণ প্যারিস ও হেলেন দু'জনই এমন কামাসক্ত হয়ে পড়েছিলেন তখন যে উভয়ই অত্যন্ত সক্রিয়তার সঙ্গে পরস্পর পরস্পরের দেহ থেকে চরম সুখ টেনে নেবার কাজে ব্রতী হন।' তাঁরা উভয়ই তখন নৈতিকতার বলয় থেকে বেরিয়ে এসেছেন। তৈত্তিরীয় উপনিষদের বাচন ঃ 'যান্যনবদ্গ্যানি কর্মানি। তানিসেবিতব্যানি। নো ইতরানি। যান্যস্মাগজং সুচরিতানি। তানি স্বয়োপাক্ত্যানি।'

যে সমস্ত কর্ম নিন্দনীয় নয়, সেইগুলিকে সম্পাদন করুন। যে কর্ম অবশ্যই গর্থিত, সেই সকল কর্ম থেকে অবশ্যই নিজেকে দূরে রাখবেন। যাতে আপনার অধিকার নেই, তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া পাপ। ইত্যাকার মন্দ কর্ম, মন্দ আচরণ করলে কপালে দুঃখ আসবেই।

হেলেন ও প্যারিস যুগ্মভাবে ওই নৈতিক অনুজ্ঞাকে লঙ্ঘন করেন। তাই ট্রয়ের যুবরাজ স্পার্টার রানী হেলেনকে অপহরণ করেননি। হেলেন স্বেচ্ছায় প্যারিসের সঙ্গে পলায়ন করেন। স্বামীর জন্য ভাবনা দূরের কথা, নিজের নাবালিকা কন্যার কথাও ভাবেননি হেলেন।

Some say a hod of horsemen others of infantly and others of ships, is the most beautiful thing on the dark earth, but I say, it is what you love. Full easy is to make this understood of one and all ; for she that far surpassed all mortals in beauty, Helen her most noble husband, deserted and went sailing to Troy, with never a thought for ther daughter and also her dear prents. [Cypria]

এখানে হেলেনকে কোনও মতেই সীতা, এমনকী দ্রৌপদীর পাশে এনে বসানো যায় না। সীতা কদাচ লঙ্কারাজ রাবণের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েননি, তথা রাবণের কোনও কুপ্রস্তাবে ইতিবাচক সাড়া দেননি। দ্রৌপদীর মন পরবর্তীকালে কর্ণের প্রতি কিঞ্চিৎ ঢলে পড়লেও তিনি তাঁর প্রতি কামার্ত দুর্যোধন, জয়দ্রথ ইত্যাদিদের সঙ্গ কদাচ কামনা করেন নি। তথাপি এই তিন মহাকাব্যিক নায়িকার একটি বিষয়ে বিশেষ সাদৃশ্য। তিন রমণীরত্নকে কেন্দ্র করে তিন-তিনটি মহারণের সূত্রপাত—যার ফলশ্রুতিতে তিন-তিনটি রাজশক্তির নির্মম বিলুপ্তি।

রাবণ সীতার পূর্বজন্মেও তাঁকে লাভের জন্য মত্তাবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। সুতরাং ফলভোগ তাঁকে করতে হতই। তবে লঙ্কার ধ্বংসের পিছনে রাবণভগ্নী শূর্পণখার অবদানও অনস্বীকার্য। সঙ্গে সঙ্গে এটাও মানতে হয়, দোষটা একা শূর্পণখার নয়। সেখানে রাম তাঁর সঙ্গে যে ধরনের রসিকতা করেছিলেন, তা কিন্তু আচার্যসুলভ নয়। আচার্য তিনিই, যিনি সদাচারের শিক্ষা দিয়ে থাকেন এবং নিজের আচরণেও তার নিত্য প্রতিফলন ঘটান।

শূর্পনখা একজন যুবতী। রামের দিব্যকান্তি দর্শনে তিনি মুগ্ধ হন। তাঁর অন্তরে প্রেমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়। তিনি সরসারি রামের কাছে গিয়ে রামকে বিয়ে করার ইচ্ছাপ্রকাশ করেন। অসচরাচর ঘটনা ঠিকই ; কিন্তু রাম তাঁর সঙ্গে যে ধরণের রসিকতায় মেতে ওঠেন, তা কী শিষ্টাচারসম্মত ? একজন প্রেমপ্রত্যাশী নারীকে পরিহার করবার জন্য তিনি আচার্যের ভূমিকা গ্রহণ করলে সেটা হতো সুপ্রযুক্ত। তার পরিবর্তে তিনি শূর্পণখাকে ঠেলে দিলেন

লক্ষণের দিকে। লক্ষণ আবার রামের দিকে। পরিশেষে লক্ষণের আক্রমণে শূর্পণখার নাক কাটা যায় এবং রক্তাক্ত অবস্থায় তিনি তাঁর বড় ভাই লঙ্কারাজ রাবণের কাছে গিয়ে আছড়ে পড়েন। এই কাণ্ড রাবণের অন্তরকে রাম-লক্ষণের বিরুদ্ধে বজ্রগর্ভ করে তোলে। রাবণ-সীতাকে অপরহণ করে বদলা নেবার পরিকল্পনা করেন। সংঘর্ষও অনিবার্য হয়ে ওঠে।

ঘুরে-ফিরে বলতে হয়, তাঁকে যে অপহৃতা হতে হল এর জন্য সীতা হেলেনের মতন দায়ী নন। এটা একেবারেই ভবিতব্যের খেলা। তবে রাম যখন সীতাকে লক্ষণের জিম্মায় রেখে স্বর্ণমৃগকে শিকার করতে ছুটে গেলেন, সেই সময়ে সীতার আচরণে আমরা যে লোভ ও সন্দেহপ্রবণতা দেখতে পাই—তা কিন্তু কোনও মহীয়সীর অন্তরসম্পদ হতে পারে না।

প্রথমত, তিনি নারীর চিরন্তন স্বর্ণলালসাকে জয় করতে ব্যর্থ হন। স্বামী ও দেবরের সঙ্গে যখন তিনি বনবাসের কঠিন জীবন নির্বাহ করছেন, তখন স্বর্ণমৃগের প্রতি অতখানি অন্বিষ্ট হয়ে পড়াটা সীতার সাধারণ নারীসত্তাকেই প্রকাশ করে—যা যুগ যুগান্তরে বহু মহীয়সীর মধ্যে আমরা অনড় ও অপরিবর্তীয় অবস্থায় দেখি।

সীতার অপর একটি অনুচিত কর্ম হল লক্ষণের চরিত্র সম্পর্কে সন্দেহপ্রকাশ। রাম ও সীতার প্রতি লক্ষণের আনুগত্য যে প্রশ্নহীন, এটা যে সীতা অনুধাবন করতে পারেননি, ভাবলে অবাক হতে হয়। মায়াবী মারিচ যখন রামের স্বরকে অনুসরণ করে লক্ষণকে ডাকছেন, লক্ষণ তা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি সীতাকে একা রেখে কুটির থেকে বেরিয়ে আসতে চাননি। তখন বিচলিত সীতা লক্ষণের চরিক্রকে কলুষিত করে যে কথাগুলি বলেছিলেন, একজন সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ মানুষের চলার পথে সেটা কোনও দিন পাথেয় হতে পারে না। মানসিক দিক থেকে বিপর্যস্ত লক্ষণ সীতাকে একা ছেড়ে যেতে বাধ্য হন। ওৎ পেতে থাকা রাবণ সেই সুযোগ গ্রহণ করেন।

তিন সহস্রাব্দ দূরত্বে বসে কবি তাঁর কাব্যে মনুষ্য চরিত্রের যে সকল ওঠা-পড়া এঁকেছেন, আজও তার অন্তঃসার সমকালীন বাস্তবতার সঙ্গে মিল খুঁজে পায়। মহাভারত আরও অনেক পরবর্তীকালের রচনা হওয়ায় সেখানকার চরিত্রগুলি অনেক বেশি বাস্তবমুখী ও সহিষ্ণু।

শূর্পনখাকে নিয়ে রাম যে রকম আচরণ করলেন, ভীম কিন্তু হিড়িম্বাকে নিয়ে তা করেননি। হিড়িম্বাও রাক্ষসী অর্থাৎ অনার্য। হিড়িম্বার দাদা হিড়ম্বও রাবণের ন্যায় পঞ্চপাণ্ডবকে নিকেশ করবার উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং ভীম

তাঁকে হত্যাও করেন। তথাপি ভীমের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে হিড়িম্বা যখন ভীমের কাছে অবারিত প্রেম নিবেদন করে চলেছেন, ভীম কিন্তু হিড়িম্বাকে নিয়ে ইঁদুর-বেড়াল খেলা খেলেননি। মহাভারতীয় মানুষ অন্তত এটা বুঝতে শিখেছে যে, নারীর প্রেম বড় মহার্ঘ এবং যখন তা ঝোড়ো হাওয়ার মতন দুরন্ত হয়ে ওঠে, সংশ্লিষ্ট পুরুষকে তখন তাতে সাড়া দেওয়াটাই কর্তব্য।

লক্ষণীয় বিষয় হল, ভীমকে পতিরূপে লাভ করবার মানসে হিড়িম্বা সরাসরি পাণ্ডবজননী কুন্তির কাছে গিয়ে দরবার করেন। কুন্তিকে হিড়িম্বা বলেছিলেন, 'আপনি একজন মেয়ে হয়ে নিশ্চয় বুঝতে পারছেন আমার অবস্থাটা। একজন নারী যখন কোনও নির্দিষ্ট পুরুষের প্রতি প্রেমাসক্ত ও কামাসক্ত হয়ে পড়ে, তার পক্ষে কী আর তখন সম্ভব সংযমের কৃষ্ণবিবরে লুকিয়ে থাকা? তাই আমার কাতর অনুরোধ, আপনি স্বয়ং উদ্যোগ নিন আপনার পুত্র ভীমের সঙ্গে আমার বিবাহের।'

'....আর্যে জানাসি যদ্দুঃখম্ ইহ স্ত্রীণামনঙ্গজম্.....।'

রামায়ণ যেন বলতে চায়, কতগুলি নীতিনির্দেশকে শাশ্বত বলে মেনে নিতে হবে পুরুষশাসিত সমাজের অস্তিত্বকে অভঙ্গুর রাখতে। মেনে নিতে হবে যে খণ্ডকালের বিপ্রতীপে এইগুলিই মহাকালের মহাসত্য। সেখানে যুক্তি তর্ক বিশ্লেষণের কাটাকুটি মহাসন্দর্ভ রূপে বর্জিত হওয়া উচিত।

অন্যদিকে মহাভারত যেন বলছে, তুমি সার্বিকভাবে মানুষ নিয়ে আলোচনায় বসেছ। সেখানে লিঙ্গভেদের বিবেচনাকে প্রত্যাখ্যাত হওয়াটা জরুরি। সময়ের প্রতিটি সন্ধিপর্বে নারীর গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সেই অমূল পরিবর্তিত পরিস্থিতি হয়েছে উদার ও মানবিক। উদারতা আছে বলেই যথার্থ মূল্যবোধ গড়ে ওঠে। যুক্তি, তর্ক, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের নিরন্তর বিচ্ছুরণের মধ্য দিয়ে ন্যায়ের দিকে ধাবিত হয় কাল। মহাভারতের অনেককাল পরে রচিত ইলিয়াড ও ওডিসিতে মহাভারতীয় যুক্তিগুলিই যেন কাহিনীর পরতে পরতে স্বীকৃতি পেয়েছে। ধর্মের চরিত্রায়ণ সবসময়ই ছিল। ধর্মের চিত্র যে জীবনের বিকাশকে পূর্ণতা দেওয়া, এই সত্য সর্বকালে মান্যতা পেয়েছে। আবার ধর্মের মধ্যে ইন্দ্রিয়াতীত একটা ভাব সৃষ্টির প্রয়াসও যে রয়েছে, তা অনস্বীকার্য। ইন্দ্রিয়াতীত ভাবকে আনবার চেষ্টা মানুষকে যথাসম্ভব সুস্থিত রাখতে। ওই সুস্থিতভাব দৃঢ়তা পায় যখন মাতৃত্বকে সম্ভ্রমতার সঙ্গে গ্রহণ করা হয়। মাতৃত্ব সর্বদাই সৃষ্টির প্রতীক। মাতৃযোনি একটি সৃষ্টিমুখী প্রতীক। মাতৃযোনি থেকে নির্গত ডিম্বও একটি বড় প্রতীক। প্রাচীন গ্রীসের সৃষ্টিবয়ানে ডিম্বর খুব

প্রাধান্য। হেলেনও ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন একটি ডিম্বকে চূর্ণ করে। মানুষের হয়ে ওঠার ইতিহাস ঘাঁটালে দেখা যাবে আদিম মানুষের যে সামাজিক পরিসর, সেশানে নারীদেরই প্রাধান্য। এমনকী যে শৈব ধর্ম, তাও মাতৃপূজার বিপ্রতীপে নয়। জীবনের সমগ্রতা বোঝাতে মাতৃদেবীর সঙ্গে জুড়ে দেবার চেষ্টা হয়েছে যৌনতাকে। কিন্তু সেটা ব্যাপক হয়নি। রয়ে গেছে অংশত। তাই আমরা দেখি, কুমারী পূজার মতন অনুষ্ঠান। প্রাচীন ভারতে, গ্রীসে, রোমে এমন কিছু দেবী রয়েছেন, যাঁরা বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করেননি। এঁদের যৌনজীবন সম্পর্কে কোনও উচ্চবাচ্য নেই। এইসকল দেবীর উদ্দিষ্ট লক্ষ্যই হল যেন যৌনচেতনাকে সম্পূর্ণ দমন করত অধ্যাত্মজগতের প্রবেশদ্বারকে উন্মুক্ত করা।

যাই হোক, এই বিষয় নিয়ে অধিক অগ্রসর হবার অবকাশ এখানে কম। লেখকের অন্তর্বয়ন সেই তিন নারীকে কেন্দ্র করে—সীতা, দ্রৌপদী এবং হেলেন। তিন মহাকাব্যিক নায়িকা।

ত্রিনারীর ত্রিধারা

সীতার জীবনানুভবে বিধৃত যে আখ্যান, সেখানে বেদনার গাঢ়তা আমাদের অবধারিতভাবে ক্ষুব্ধ করে। অতখানি একনিষ্ঠ পতিপ্রেম ও সেবাব্রতী মানসিকতা নিয়েও সীতা ক্রমাগত অবিচার ও লাঞ্ছনার জঙ্গল থেকে নিষ্ক্রমণের উপায় খুঁজে পাননি। সহজ কথায় রামচন্দ্রের প্রতি সীতার বিকশিত প্রেমের কোরক সুবিচারকে প্রতিষ্ঠার পথে সঞ্চালিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি রাজরাণী হবার সৌভাগ্য থেকে বার বার বঞ্চিত হয়েছেন। স্বামীর সঙ্গে বনবাসকালে প্রথমে স্বচ্ছন্দে থাকলেও সেই সুখে কোনও সুনির্দিষ্ট আকল্প উন্মোচিত হয়নি। তাঁর অবশিষ্ট জীবন স্বল্পায়ু সুখ থেকে প্রলম্বিত বেদনায় উত্তরণের কাহিনি হয়ে দাঁড়িয়েছে। রামায়নের তাবৎ অনবদ্যকর্ম ও ইতরকর্মের মধ্যে যে কয়েকটি রক্তক্ষরণের স্থান, সীতা তাদের মধ্যে প্রধান। বাকিগুলি হল বালি বধ ও তারার হাহাকার, যজ্ঞাগারে ইন্দ্রজিতের নিধন, বৃদ্ধ জটায়ুর আত্মত্যাগ ইত্যাদি। মাতৃরূপেও সীতা অনন্যা। তাঁর মাতৃত্বের আধারও আধেয় দুই-ই এক স্নেহাতুরা মানুষীর আদর্শ দৃষ্টান্ত। লব ও কুশকে বাল্মীকির সহায়তায় তিনি যেভাবে সময়োপযোগী শিক্ষায় সংলগ্ন রাখেন, সেটাও এক আদর্শ দৃষ্টান্ত। বেদনা এই যে, মৃত্তিকার কন্যা হয়েও তিনি মৃত্তিকার ওপর দাঁড়িয়ে সুবিচার পাননি। তাঁকে মৃত্তিকাগর্ভেই লীন হতে হয়েছে। সীতার জীবনে আনন্দ ও সুখের সেরা সময় পিতৃগৃহেই। সেখানে কস্মৈ বেদায় হরিষা বিধেয় ঃ— ওই জীবনেই বুঝি নিজস্ব তাৎপর্য ও তার বিচ্ছুরণ।

সীতার বিবাহ আসলে রামের আবির্ভাবপূর্ব কানে নির্দিষ্ট। রামকর্তৃক হরধনু ভঙ্গও যেন একটি যান্ত্রিক প্রক্রিয়া। এমনকী সেই আসরে রাবণের ব্যর্থতাও যেন একটি গৌণ ঘটনা। সবসময় মনে হয়, এরকমটা তো হবারই কথা।

তুলনায় বেদনা তথা অপূর্ণতার দ্যোতক ভীষণভাবে নাড়া দিয়ে যায়, যখন দ্রৌপদীর স্বামী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে কর্ণ দ্রৌপদীর দ্বারা অপমানিত হন। দুর্যোধন ও কর্ণ—দ্রৌপদীর দ্বারা অপমানিত এই দুই ব্যক্তিত্বের নিবিড় বন্ধুত্বের গ্রন্থনা ছিল অনিবার্য। তবে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণকালে

মহাভারতের অধিকাংশ 'বীরপুরুষ'দের কাণ্ডকারখানা দেখে স্তম্ভিত হতে হয়। ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রমুখের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা একপ্রকার পাপাচারেরই একরৈখিকতার দৃষ্টান্ত। একমাত্র বিদুর ছিলেন ন্যায় ও বিবেকের সঙ্গে পূর্ণ সম্পৃক্ত। তাঁর ধিক্কারবাণীই মহাভারতের মহান কণ্ঠস্বর। যিনি বিবেকবান, অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ সম্পর্ক-নিরপেক্ষতাতেও সরবে ধ্বনিত হবে। দ্রৌপদী সেই ঘটনামন্থনজাত বিড়ম্বনা ও বিষয়কে অবশিষ্ট জীবনভর বহন করেছেন। নারীর প্রতিশোধস্পৃহা বড় ভয়ঙ্কর। ছায়ার মতন সেই স্পৃহা সংশ্লিষ্ট অপরাধীকে ছায়ার মতন অনুসরণ করতেই থাকে।

দ্রৌপদী কিন্তু শেষপর্যন্ত এই আশায় ছিলেন যে, আর যাই হোক, তাঁকে প্রকাশ্য রাজসভায় টেনে নিয়ে গিয়ে অপমান করা হবে না। কারণ সেখানে তাঁর খুড়োশ্বশুর ধৃতরাষ্ট্র নিশ্চয় দুর্যোধনকে নিষেধ করবেন পারিবারিক কেচ্ছাকে আর ব্যাপ্ত না করতে। নিশ্চয় দ্রোণ তাঁর ছাত্রদের সংযত আচরণের পরামর্শ দেবেন। আর সর্বোপরি ন্যায়-নীতির প্রতিভূ পিতামহ 'ভীষ্ম অবশ্যই কুলবধূর অসম্মান হতে দেবেন না। এইরকম তর্ক-বিতর্কের জন্ম দেবার জন্যই দ্রৌপদী দুর্যোধনের দূতকে বললেন, 'আমার জুয়াড়ি স্বামী যুধিষ্ঠির আমাকে জুয়ায় বাজি রেখেছেন, জানলাম। কিন্তু তার আগে আমাকে জানতে হবে, জুয়ায় কাকে প্রথমে কাকে রাখা হয়েছিল ? যুধিষ্ঠির কী নিজেকে আগে দানে চড়িয়েছিলেন, নাকি আমকে ?'

দ্রৌপদী ভেবেছিলেন, এই 'পাত্রাধার তৈল অথবা তৈলাধারা পাত্র' প্রশ্নের উত্তর খুজঁতেই সকলে হন্যে হয়ে যাবেন। তাঁকে আর সর্বসমক্ষে হেনস্থা করার সুযোগ পাবেন না সবান্ধব দুর্যোধন।

প্রকাশ্যে না হোক, অপ্রকাশ্যে দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা তো অনিবার্যই ছিল। তবুও সেটা মন্দের ভালো।

কিন্তু দুর্যোধন এমন এক লোক—যিনি যুক্তি-তর্কের ধার ধারেন না। দ্রৌপদীর পাঠানো প্রশ্নকে তিনি যেভাবে ও যে ভাষায় উড়িয়ে দিলেন, তার জুড়ি মেলা ভার। যে ব্যক্তি নারীকে সম্মান দিতে জানে না, সে তো কোনও দিন অন্তর্দীপ্তিতে উজ্জ্বলও হতে পারে না। তার পতন হবেই।

দ্রৌপদীর সমাপ্তিবিহীন বস্ত্রহরণ পুনরুচ্চারণের অনুপযুক্ত অপরাধ। প্রতিবাদ এসেছিল মাত্র দুজনের কাছ থেকে—বিদুর ও দুর্যোধনভ্রাতা বিকর্ণ। আর সকলেই নীরব—যে নীরবতা পাপেরই শামিল—যে নীরবতায় তৈত্তিরীয় উপনিষদের নৈতিক অনুজ্ঞা ভূলুণ্ঠিত।

আসলে পাশা খেলায় যুধিষ্ঠির আগে নিজেকেই দান রাখেন ও পরাজিত হন। এখানেই তাঁর জুয়াড়ি প্রবৃত্তির ওপর ইতি টানাটা ছিল স্বাভাবিক।

কিন্তু ধূর্ত শকুনি জানতেন, তাঁর বড় ভাগ্নে কোন দানে বাজিমাৎ করতে পারলে সবচেয়ে বেশি তৃপ্ত হবেন।

শকুনি তাই তখন ম্লান বিষণ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বললেন, 'বাছা যুধিষ্ঠির, তোমার কিন্তু এখনও বেরিয়ে আসবার পথ আছে। তুমি দ্রৌপদীকে দানে বসাও নিজেকে ছাড়িয়ে আনবার শর্তে। গভীর অভিনিবেশ সহকারে নিজের বিদ্যাকে প্রয়োগ করো। জিততে পারলে তুমিও মুক্ত, দ্রৌপদীও মুক্ত।'

যুধিষ্ঠির শকুনির ফাঁদে পা দিলেন। এরপর যা ঘটল, আমার সকলেই তা সবিস্তারে জানি। দুর্যোধন যেভাবে তাঁর উরুর ওপর দ্রৌপদীকে বসাতে চাইলেন, তা উগ্র শরীরী আকাঙ্ক্ষার চিহ্নায়ক।

শ্রীকৃষ্ণের সহায়তা ব্যতীত দ্রৌপদীর সেদিন রেহাই পাওয়া সম্ভব ছিল না। কৃষ্ণ প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন পিতামহ ভীষ্মের ভূমিকায়। অত বড় ন্যায়বান বীর কতগুলি ছেঁদো ও কাকতালীয় যুক্তির আড়ালে আত্মগোপন করে রইলেন—ভাবা যায় না!

নারীর রূপ-যৌবন যেরকম বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে, দ্রৌপদী তার উৎকৃষ্ট প্রমান। অধিকাংশ তরুণ, যাঁরাই দ্রৌপদীকে চাক্ষুষ করেছেন, মোহিত না হয়ে পারেননি। পাঁচ স্বামীর সকলেই, এমনকী যুধিষ্ঠিরও স্বীকার করেছেন যে দ্রৌপদীর রূপ ও যৌবন তাঁকে প্রগাঢ় সুখ ও প্রশান্তি এনে দিয়েছে।

ওই রূপানলেই ধ্বংস হয়ে গেলেন কিচকের মতন মহাবীর।

কিচক বলবান পুরুষ। দ্রৌপদীকে দর্শনমাত্র তাঁর ভেতর কামবোধ তীব্র হয়ে ওঠে। ইতিপূর্বে তিনি বহু গহির্তকর্মে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছেন। দ্রৌপদীর প্রতি অগ্রসর হওয়াটা যে কতটা পিজ্জনক হতে পারে, সেই ভাবনা তাঁর ছিলই না। কিচককে সামনে দেখেই দ্রৌপদী তাঁর পাঠোদ্ধার করতে সমর্থ হন। তাই শুরুতেই কিচকের দিকে তর্জনি তুলে জানিয়ে দেন, 'আমি পঞ্চপাণ্ডবের ঘরণী। আমার পঞ্চস্বামীর একজন ভীম কিন্তু দুর্দান্ত বলবান।' কিচক সহাস্যে বললেন, 'আমি রানী সুদেষ্ণার ভাই ও বিরাট রাজার সেনাপতি। আমার চেয়ে বলবান ত্রিভূবনে কেউ আছে বলে জানা নেই। যেহেতু কেউই আমার সমকক্ষ নয়, তাই আমার জীবনে উদ্বেজনক মুহূর্ত বলতেও কিছু নেই। তুমি অতীব সুন্দরী। দরিদ্র পাণ্ডবরা তোমার

উপযুক্ত নয়। তুমি আমার কাছে সমর্পিত হও। সুখ, আনন্দ, স্বচ্ছলতা সবই পাবে।'

কিচকের সঙ্গে দ্রৌপদীর সেই সাক্ষাৎকার ঘটেছিল দ্রুপদরাজার রাজ্যে দাঁড়িয়ে। সেখানে কিচক একজন মানবীয় অতিথি।

দ্রৌপদী কিচককে বললেন, 'আমি আর নতুন করে প্রেমে পড়তে পারব না। আমি আমার পঞ্চস্বামীর আলয়ে খুব সুখেই দিনাতিপাতি করছি। আপনি বরং অন্য কোনও সুন্দরীর সন্ধান করুন।'

কিচক তখন বুঝলেন যে, প্রেমের মিষ্টি কথায় দ্রৌপদীকে কাছে টানা যাবে না। এর জন্য দরকার বিশেষ কৌশল ও প্রয়োজনে বলপ্রয়োগ।

কিচক তাঁর দিদি রাণী সুদেষ্ণাকে গিয়ে ধরলেন। ছলে-বলে-কৌশলে যেভাবেই হোক দ্রৌপদীকে তাঁর চাই। দ্রৌপদীকে না পেলে তিনি পাগল হয়ে যাবেন। সুদেষ্ণাও ভ্রাতৃপ্রেমে বিগলিত। তিনি ভুলে গেলেন প্রাপনীয় ও অপ্রাপনীয় বিধিনিষেধগুলি। দ্রৌপদীতে সম্মোহিত কিচককে মদত দিতে তিনি সক্রিয় হয়ে উঠলেন। কিচককে কথা দিলেন, কৌশল করে দ্রৌপদীকে তিনি তাঁর কক্ষে পাঠাবেন। সুদেষ্ণার ঈশ্বরভক্তি থাকলেও সেই মুহূর্তে রানী ভুলে গেলেন যে জগৎ ও জীবের বাইরে কিন্তু ঈশ্বর থাকে না। উপনিষদের অনুসৃতিও লঙ্ঘিত হল। রাণী সুদেষ্ণা দ্রৌপদীকে ডেকে পাঠালেন। দ্রৌপদী এলে তিনি তাঁকে বললেন, 'দ্রৌপদী, তুমি একটিবার আমার ভাই কিচকের ঘরে যাও। ওর কাছ থেকে খানিকটা সোমরস নিয়ে এসো আমার জন্য। আমার মন খুব চাইছে কিছুটা সময় সোমরসে মজে থাকতে।'

দ্রৌপদী রানী সুদেষ্ণাকে বিশ্বাস করেছিলেন। তাঁর আস্থা ছিল মহীয়ান ঈশ্বরের ওপরও। কিছু বিচার ও জ্ঞানের দ্বারাও যে ঈশ্বরকে জানা সম্ভব, এই বোধটুকু সেইসময় তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন। তদেজতিতন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে। তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বসাম্য বাহ্যতঃ। বাস্তবের পরিসরে যে কতরকমের প্রতারণা থাকতে পারে, দ্রৌপদী তা আর একবার বুঝতে পেরেছিলেন কিচকের ঘরে ঢোকা মাত্র।

উগ্র শরীরী আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কিচক দ্রৌপদীর উপর হামলে পড়লেন। দ্রৌপদী কোনও ক্রমে সেই ঘর থেকে আত্মরক্ষার জন্য সমানে ছুটতে থাকেন। তাঁকে ধরবার জন্য ধাবমান কিচকও। সে এক অবাক করা দৃশ্য। দ্রৌপদী আত্মরক্ষার জন্য কোথায় লুকোবেন, বুঝে উঠতে পারছিলেন না। ছুটতে ছুটতে শেষমেশ ঢুকে পড়লেন বিরাটরাজ্যের পরিপাটি করে সাজানো

রাজসভায়। সেই সময় সভায় এমন অনেক বিশিষ্টজন উপস্থিত, যাঁদের দেখলে তাবড় ব্যক্তিরাও হীনমন্যতাতে ভুগতে পারেন। যেমন রয়েছেন তরুণ নক্ষত্র, তেমনি রয়েছেন আদ্দিকালের মানুষও। উপস্থিত রয়েছেন স্বয়ং যুধিষ্ঠিরও। লম্বা লম্বা পা ফেলে প্রথমে ঢুকলেন দ্রৌপদী। তাঁর খোঁপা খুলে যাওয়ায় মেঘবরণ চুল ছড়িয়ে পড়েছে পিঠময়। আর ছুটবার শক্তি তাঁর নেই। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আছড়ে পড়লেন তিনি।

তখনই ঢুকলেন প্রত্যাখ্যাত কামতপ্ত কিচকও। ঢুকেই এমন একটি কাণ্ড করলেন, যা অতি রদ্দি মানুষরাই করে থাকেন। তিনি দ্রৌপদীকে লাথি মারলেন। দ্বিতীয়বার আঘাত হানতে উদ্যত হওয়া মাত্র রাশভারী বিরাটরাজ কিচককে হুঁশিয়ার করে দিলেন, 'সাবধান কিচক, আমার সামনে তুমি নারী নির্যাতন করছ। এর পরিণতি কিন্তু ভালো হবে না।'

দ্রৌপদী উঠে দাঁড়িয়ে রাজাকে সবিস্তারে তাঁর লাঞ্ছনার কথা জানালেন। যুধিষ্ঠিরের দিকে আঙুল তুলে বললেন, 'ওই মহান পুরুষ আমার স্বামী। আমার স্বামী বাকি চার পাণ্ডবও। আমার মনের পাত্রটি এদের প্রতি প্রেম ও নিষ্ঠায় কানায় কানায় পরিপূর্ণ। কিন্তু এই হতভাগা কিচক সমস্ত রকম অনুরোধ-উপরোধ নস্যাৎ করে আমার সতীত্ব নষ্ট করতে একরকম মরিয়া। আমি যদি কুমারী কন্যা হতাম, হয়তো এই প্রকারের ছুঁৎমার্গ আমার থাকত না। কিন্তু আমি পাণ্ডবকূলের ঘরণী।'

যুধিষ্ঠিরসমেত পঞ্চপাণ্ডবের আত্মমর্যাদার দড়িতে টান পড়ল। বিরাট রাজা নিকটজন কিচকের আচরণে ব্যথিত হলেন। এই ধরণের প্রবৃত্তির যে অধিকারী, তাঁর পৃষ্ঠপোষণ অনুচিত। রাজা কিচককে ভৎর্সনা করলেন, যার মর্মার্থ এইরকম, 'সমস্ত চেনামহলে তোমার এই আচরণ আমারও মাথা হেট করলল। তুমি যত বড় বীরই হও না কেন, আমি আর তোমাকে মানত্য দিতে পারব না। এই মুহূর্তে তুমি আমার সভাস্থল ত্যাগ করবে।'

কিচক বিরাট রাজার সভা ত্যাগ করলেন বটে, কিন্তু তাঁর মনে বিবেক ও নীতিবোধ স্থান পেল না। তিনি তখনও দ্রৌপদীকে ভোগ করতে ও সাংঘাতিকভাবে পীড়ন করতে উন্মুখ হয়েই থাকলেন। সভাস্থল ত্যাগ করবার পর ওৎ পেতে রইলেন পরবর্তী সুযোগের সন্ধানে।

সেই রাতেরই নিঝুম পরিপার্শ্বে পঞ্চপাণ্ডব একত্রিত হলেন শলা পরামর্শ করতে। উদ্দেশ্য একটাই—কিচক বধ। পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে সবচেয়ে উত্তেজিত ভীম। দ্রৌপদীর প্রেমে তিনিই সর্বাধিক মগ্ন-বিভোর। তবে পরামর্শদাতা রূপে

সহদেব তুখোড়। আর রণকুশলতায় অর্জুন তো অদ্বিতীয়। ভীমের দাবি, তাঁর ওপরই অর্পিত হোক কিচকবধের দায়িত্ব। কিন্তু কীভাবে কিচককে ভীমের মুখোমুখি এনে ফেলা যাবে, সে ব্যাপারে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন হল। ছকটাও তৈরি হয়ে গেল। দ্রৌপদীই হবেন কিচককে একাকী টেনে আনবার সেরা টোপ।

দ্রৌপদী পরিকল্পনা অনুসারে আবার এসে গেলেন কিচকের দৃষ্টিপথে। এবার তাঁর কুলপ্লাবী যৌবনের লীলাময়তা আলো-আঁধারিতে আরও মায়াময়।

নিভৃতে দাঁড়িয়ে দ্রৌপদী কিচককে বললেন, 'আপনি এত অধৈর্য কেন?'

—কারণ আমি তোমাকে যে কোনও মূল্যে পেতে চাই।

—আপনি কী নিজেকে এই দুনিয়ার সর্বোত্তম ব্যক্তিত্ব বলে ভাবেন?

—অবশ্যই। আমি রণকুশলী। আমার মতন শক্তিশালী পুরুষ স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে দ্বিতীয় কেউ নেই। আর তুমি সবচেয়ে সুন্দরী নারী। সুতরাং তোমাকে আমার চাই।

দ্রৌপদী বললেন, 'আমি ভেবে দেখলাম, আপনাকে প্রত্যাখ্যান করাটা অনুচিত। অন্ততঃ আমরা একবার মিলিত হতে পারি। সেইরকম একটি নিভৃত স্থানের সন্ধানও রয়েছে আমার কাছে।'

কিচক আনন্দে-উল্লাসে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন, 'বলো বলো সুন্দরী, আমাকে কোথায় যেতে হবে?' লাস্যময়ী দ্রৌপদী বললেন, 'আপনি কিন্তু একা আসবেন। অন্য কোনও পুরুষ বা মহিলা যেন আপনার সঙ্গে না থাকে।'

'আমি একাই আসব। ওই সময় আবার কেউ সঙ্গী নিয়ে যায় নাকি?'

দ্রৌপদী সেই গোপনস্থানের ভূগোল কিচককে জানিয়ে ফিরে গেলেন পঞ্চপাণ্ডবের কাছে। স্থানটি এক নৃত্যশালা। বিরাটরাজ ও অন্যান্য বিশিষ্টদের সেখানে তৃপ্ত করবার জন্য মাঝে মাঝে নাচের আসর বসে। অন্যসময় স্থানটি নির্জন।

নিজেকে কামনায় নিষিক্ত করে কিচক অন্ধকার মঞ্চে উঠে নোঙর পাতলেন অসহনীয় কামনা ও উত্তাপকে শীতল করতে। দ্রৌপদী যে শেষাবধি এভাবে মুক্তপথের সন্ধান দেবেন, তিনি আশা করতে পারেননি।

অত্যন্ত পুলকিত হলেন এই দেখে যে, অদূরে আলোছায়ায় তাঁরই জন্য অপেক্ষমান রূপসী দ্রৌপদী।

আসলে যিনি অপেক্ষমান, তিনি দ্রৌপদী নন। তিনি দ্রৌপদীর ছদ্মবেশে স্বয়ং ভীম।

কিচক যখন তা বুঝতে পারলেন, তখন আর পালাবার পথ নেই। সেখানে তখন কেবল জয়-পরাজয় নয়, রয়েছে অনিবার্য জীবন অথবা মৃত্যুর সংস্থান।

ভয়াবহ যুদ্ধ হল নাচঘরে। পরিণামে ভীমের হাতে নিহত হলেন কিচক।

মেধাবী, অনুভবী, তীক্ষ্ম বুদ্ধিমতী দ্রৌপদীর জীবনে বার বার দুর্দমনীয় পুরুষরা হানাদারের ভূমিকা পালন করতে এসেছে এবং পরিমাণে চূড়ান্ত শাস্তিও পেয়েছে ভীমের হাতে। জীবনমরণের অখণ্ডপ্রবাহ সেটা নয়। অবশ্যই এক-একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা। লক্ষণীয় এই যে, প্রতিবারই দ্রৌপদীর লাঞ্ছনাকারীর মৃত্যু হয়েছে ক্রুদ্ধ ভীমের হাতে। এই ঘটনাগুলিই পথ নির্দেশ করে যে দ্রৌপদীর প্রতি সবচেয়ে অধিক প্রেমাসক্ত ছিলেন ভীম। ভীমের হাতে এভাবেই মারা যান কিচক, জয়দ্রথ, দুঃশাসন প্রমুখ। দ্রৌপদীকে উরুর ওপর স্থাপন করবার বাসনা প্রকাশ করেছিলেন যে দুর্যোধন, তাঁরও উরুভঙ্গ ঘটে সেই ভীমেরই গদাঘাতে। এই প্রসঙ্গেই জয়দ্রথ কর্তৃক দ্রৌপদীহরণের ঘটনা এসে যায়।

অনর্গল পরিভ্রমণের মধ্য দিয়ে দ্রৌপদীকে নিয়ে পঞ্চপাণ্ডব তখন উপস্থিত হয়েছেন কামাখ্যা অরণ্যে। এখানকার শান্ত বনজ শোভায় তাঁদের মন প্রশান্তিতে পরিপ্লুত। সংসারের কূটচক্র ও বিষয়-আশয় নিয়ে ভাবনা তখন আর তাঁদের মনকে অধিকার করে নেই। আরও ভালো লাগল সেখানকার বনবাসী তপস্বীদের কুলপ্রদীপ ধৌম্যমুনির আশ্রমে প্রবেশ করে। তাঁদের মনে হয়েছিল, এই সেই স্থান—যেখানে দুর্যোধনদের আধিপত্য থাকবে না। দ্রৌপদীকে সেই আশ্রমে রেখে পাঁচ পাণ্ডব মৃগয়ায় বের হলেন। তার তখনই যেন অমোঘভাবে ঘনিয়ে এলে আর এক দৈবদুর্যোগ।

পাঁচ স্বামী বনের গভীরে চলে যাবার পর দ্রৌপদী আশ্রমের চারিদকটা ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকেন। সবুজ অরণ্যে তাঁর ঝাঝালো রূপ যেন আগুন ধরিয়েছে। মনও খানিক উচাটন দীর্ঘকাল বনবাসী হয়ে থাকবার দরুণ। যদিও পঞ্চস্বামীর সান্নিধ্যে উষ্ণতার অভাব নেই, তবুও রাজপ্রাসাদের জাঁকজমকপূর্ণ দিনগুলি তাঁকে এখন টানে।

ঠিক ওই সময় বনপথ ধরে শল্যদেশের উদ্দেশ্যে চলেছেন জয়দ্রথ। বৃদ্ধক্ষাত্রের তেজস্বী ও বলবান পুত্র। অপরিমিত বিত্ত সম্পদের অধিকারী। এর ওপর দুর্যোধনের ভগ্নী ও মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের আদুরে কন্যা দুঃশলার পতি হওয়াতে তাঁর একেবারে সোনায় সোহাগা। কাউকে আশ্বস্ত করেন, কাউকে

চমকান। আর সুন্দরী নারী দেখলেই তাঁর চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। আবার পত্নী দুঃশলার সঙ্গে যখন দীর্ঘ খেজুরে আলাপ চালান, তখন যেন তাঁর মতন স্ত্রৈণ দ্বিতীয়টি হয় না।

এহেন জয়দ্রথের দৃষ্টিপথে দ্রৌপদী চলে এলেন। এরকম সুন্দরীকে দেখলে হিমঘরে রক্ষিত মৃত পুরুষও বুঝি জেগে উঠবে। সর্বাঙ্গে রূপ-যৌবনের ঢল নেমেচে। মেঘকুণ্ডলীর মতন ঘন চুল। নিজের পারিবারিক পরিচিতি, দ্রৌপদীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, চক্ষুলজ্জা ইত্যাদি সবই ভুলে গিয়ে জয়দ্রথ সরাসরি গিয়ে দ্রৌপদীকে প্রস্তাব দিলেন তাঁর সঙ্গে পালিয়ে যেতে। কী আছে আর পাণ্ডবদের ? প্রায় নিঃস্ব হয়ে পথে পথে ঘুরছেন পাঁচভাই। অন্যদিকে ঐশ্বর্যে ফুলে ফেঁপে উঠেছেন জয়দ্রথ। একমাত্র জয়দ্রথই পারেন দ্রৌপদীর মতন রমণীরত্নকে উপযুক্ত মর্যাদা দিতে।

জয়দ্রথের এই অন্যায় দাবিকে নস্যাৎ করে দ্রৌপদী নানান যুক্তি সাজিয়ে এমন এক ভাষণ দিলেন, যার ফলে অনেকটা সময় কেটে গেল। সেই অনেক কথার মধ্যে দ্রৌপদী জয়দ্রথকে এ কথাও স্মরণ করিয়ে দিলেন যে তাঁকে অপহরণ করবার সামর্থ্য স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রেরও নেই। কারণ, ইন্দ্রও জানেন, দ্রৌপদীকে অপহরণ করতে গেলেই প্রবল হইহল্লা সৃষ্টি হবে। অর্জুনের মতন মহাবীর তাঁকে তাড়া করবেন। একা অর্জুন নন। সঙ্গে থাকবেন তাঁর অকৃত্রিম বান্ধব শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের বিরাগভাজন হওয়া মানে তো নিজেরই মরণবৃত্তান্ত রচনা করা। সুতরাং হে জয়দ্রথ, তুমি তোমার পত্নী দুঃশলার নিকট ফিরে যাও। পঞ্চপাণ্ডবের ঘরণীকে পাবার জন্য লালায়িত হও না। এটা খুব বড় মাপের পাপ।

এত কথা শোনার পরও জয়দ্রথ অনড়। কামনা ও আত্মসুখ ভাবনায় উন্মাদ হয়ে তিনি তাঁর এক সহযোগীর সাহায্যে দ্রৌপদীর শরীরকে শূন্যে তুলে আনবার চেষ্টা করলেন। দ্রৌপদীর প্রাণান্ত প্রত্যাঘাতে জয়দ্রথের মুষ্ঠি শিথিল হয়ে পড়লেও জয়দ্রথের বেষ্টনি থেকে তিনি কিছুতেই নিজেকে মুক্ত করতে পারছেন না। তাঁর মনজোড়া তখন ঘৃণা, ক্লিষ্টতা ও বেদনাবোধ। দ্রৌপদীকে টেনে ও হিচড়ে রথের ওপর তুলতে চলেচেন জয়দ্রথ। দ্রৌপদীর আর্তনাদ খুব বেশি তীব্র না হলেও শান্ত বনভূমিতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে, সেখানকার জীবকূলও অনুভব করতে পারে—এই প্রথম কামাখ্যা অরণ্যের জীবনপ্রবাহ অন্য খাতে গড়িয়ে চলেছে।

ইতিমধ্যে পাণ্ডবদের মৃগয়াপর্ব সমাপ্ত। তাঁরা আশ্রমে ফেরার পথ ধরেছেন। কিন্তু বনভূমির প্রশান্তিতে যেন ছন্দপতন লক্ষ্য করলেন যুধিষ্ঠির।

তাঁর প্রসন্ন মুখশ্রীতে চিন্তার ভাঁজ ফুটে ওঠে। তিনি তাঁর ভাইদের বললেন, 'দ্যাখো, বনের পশুরা কেমন ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। নিশ্চয় খারাপ কিছু ঘটছে এই সময়। আমাদের এখনই রথে চড়ে আশ্রমের দিকে যাওয়া উচিত।'

রথে উঠে বসলেন পঞ্চপাণ্ডব।

ঘোড়াগুলি দ্রুত বেগে ধাবিত হয়।

জঙ্গল-গ্রাম-ডহর পেরিয়ে রথ পৌঁছে গেল আশ্রমের কাছাকাছি।

ওই সময় দ্রৌপদীকে নিয়ে জয়দ্রথও ছুটিয়ে দিয়েছেন তাঁর রথ। দিশাহারা দ্রৌপদী তারস্বরে চিৎকার করে চলেছেন। প্রার্থনা করছেন মুনি ধৌম্যের সহায়তা। মুনি যখন ছুটে এলেন, জয়দ্রথের রথ তখন দৃষ্টিসীমার বাইরে। অশুভ শক্তির বলে বলীয়ান জয়দ্রথ নিজেরই মৃত্যুক্ষণ রচনায় ব্রতী।

ভিটেছাড়া পঞ্চপাণ্ডবও মরিয়া। দ্রৌপদীর আর্তনাদ তাঁরা শুনতে পেয়েছিলেন। তাঁরা শঙ্কিত হলেন, এই মুহূর্তে অপহরণকারীকে ধরতে না পারলে দ্রৌপদীর চূড়ান্ত সর্বনাশ অনিবার্য হয়ে উঠবে। ধৌম্যমুনির কাছে সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত শুনে মহাবলী ভীম গর্জে উঠলেন, 'আমি জয়দ্রথকে উদ্দেশ্য হাসিল করতে দেব না। তার আগেই সে আমার হাতে নিহত হবে।'

যুধিষ্ঠির ভীমের মুখের দিকে তাকিয়ে তখন এমন কতগুলি কথা বললেন—যা ভাবীকালের জন্য অগ্রগণ্য বার্তা হয়ে থাকল। অনেকের কাছে যুধিষ্ঠিরের এই ক্ষমাসুন্দর নির্দেশের তাৎপর্যকে অনুধাবন করাটাই দুষ্কর। কিন্তু আবার এখানেই যুধিষ্ঠির অনন্য।

যুধিষ্ঠির বললেন, 'ভীম, তুমি পাপিষ্ঠ জয়দ্রথকে অবশ্যই শাস্তি দেবে। কিন্তু সেই সঙ্গে মনে রাখবে জয়দ্রথের স্ত্রী দুঃশলা সম্পর্কে তোমার ভগ্নী হয়। সেই ভগ্নী যাতে অকাল বৈধব্যে পতিত না হয়, সেটা দেখাও তোমার কর্তব্য।'

অচিরে জয়দ্রথের মুখোমুখি হলেন পাণ্ডবরা। জয়দ্রথ তো ভেবেছিলেন, তাঁর রথ গিয়ে থামবে একেবারে তেপান্তরের অপর পারে। কিন্তু বাস্তবে তার অনেক আগেই সদলবলে মুখোমুখি হলেন পাণ্ডবদের। সংঘাত ও সংঘর্ষ দুই-ই হল সাংঘাতিক। পরাজয় অবশ্যম্ভাবী বুঝে দ্রৌপদীকে রথ থেকে নামিয়ে দিয়ে জয়দ্রথ পালালেন। তাঁর অনুগামীরা তখন সকলেই পরিস্থিতির শিকার। 'কিছু মৃত, কিছু আহত, কয়েকজন ক্ষণিকের জন্য সংজ্ঞাহীন।' ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধে দ্রৌপদী তখন ফুঁসছেন।

তিনি চাইছেন, জয়দ্রথের মতন পাপাচারিকে মেরে পাণ্ডবরা নারীর সম্মান রক্ষার পক্ষে এই দুনিয়াকে অন্ততঃ কিছুটা সুফ-সুতরো করুন। তিনি তাঁর পঞ্চস্বামীর মধ্যে দুজনকে বেছে নিলেন এই কাজ করাবার জন্য। তাঁরা হলেন অর্জুন ও ভীম। দুজনকেই খুব তাতালেন দ্রৌপদী। অর্জুন ও ভীম ক্রোধে তপ্তও হলেন খুব। কিন্তু দ্রৌপদীর আশাভঙ্গের কারণ হয়ে দাঁড়ালেন যুধিষ্ঠির। তিনি শান্তভাবে অর্জুন ও ভীমকে বললেন, 'জয়দ্রথ মহাপাপ করেছেন। সে অত্যন্ত চিত্তচাঞ্চল্যের দাস। নিষ্করুণ শাস্তি তার প্রাপ্য। কিন্তু আমি যখন ভগ্নী দুঃশলা ও তার জননী গান্ধারীর কথা ভাবি, তখন নিরুপায় বোধ করি। ক্ষমতাবানদের দৌড়ে এই দুই নারীর দুঃখে বুক ফেটে চৌচির হোক, আমি তা চাই না। তোমরা অন্ততঃ জয়দ্রথকে প্রাণে মেরো না।'

যুধিষ্ঠিরের এই কথায় দ্রৌপদী অপ্রসন্ন হলেন। কিন্তু বুদ্ধিমতী নারী প্রকাশ্যে বিরোধিতা করলেন না। ম্লানমুখে ভীম ও অর্জুনকে কেবল বললেন, 'আমি তোমাদের স্ত্রী। আমি জয়দ্রথের দ্বারা লাঞ্ছিতা। তোমরা এর প্রতিবিধানে যা করবে, তা যেন একটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে।'

রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে ভীম অর্জুনকে নিয়ে চললেন জয়দ্রথকে পাকড়াতে। জয়দ্রথর তখন যুদ্ধ করবার সাহস নেই। একটি পলায়ন তৎপর সারমেয়ের সঙ্গে তাঁর তখন চমৎকার সাদৃশ্য। ভীম তাঁকে পরিশেষে পাঁকড়ালেন ও হত্যায় উদ্যত হলেন। তখনই অর্জুনের স্মরণে এল উদবর্তন যুধিষ্ঠিরের সতর্কবার্তা—ভগ্নী দুঃশলার অকাল বৈধব্যের কারণ যেন তোমরা না হও। তাই জয়দ্রথের ওপর উত্তরোত্তর পীড়নে ব্রতী ভীমকে অর্জুন বললেন, 'দাদার নির্দেশ, জয়দ্রথের মৃত্যুর কারণ যেন আমরা না হই। পরিবর্তে আমরা ওকে এমন শাস্তি দেব, যাতে ওর সমস্ত অহমিকা ও অমানবিক আচরণ করবার স্পর্ধা চিরকালের মতন নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তাছাড়া মানুষ মরণশীল। সুতরাং হত্যার পরিবর্তে উপযুক্ত শাস্তিপ্রদানই কাম্য।'

ভীম আদপেই জয়দ্রথকে প্রাণে বাঁচিয়ে রাখবার পক্ষে ছিলেন না। তবুও যুধিষ্ঠিরের নির্দেশকে মান্যতা দিয়ে জয়দ্রথের মাথার পাঁচটি অংশকে নেড়া করে সর্বসমক্ষে তাঁকে এনে দাঁড় করালেন। সেখানে দাঁড়িয়ে করজোড়ে জয়দ্রথ শপথ নিয়ে বললেন, 'আমি আজ থেকে পঞ্চপাণ্ডবের দাস। আমৃত্যু এটাই হবে আণার একমাত্র পরিচয়।' দ্রৌপদী মোটামুটি খুশি হলেন শাস্তির ওই বহরে।

মহাভারতের সর্ববিষয়ে প্রাজ্ঞরা চর্চা করে গেছেন, একথা বলা যায় না। তবে যতখানি ও যত রকমের বিশ্লেষণ হয়েছে, তার মধ্যে বিশেষ আকর্ষনীয়

হল দ্রৌপদীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্কের বিষয়। এখানে অভ্যন্তরমুখী টানাপোড়েন লক্ষণীয়। বিভিন্ন কোণ থেকে বিচার করলে দেখা যাবে, এই বিশাল মহাকাব্যে কয়েকটি কেন্দ্রিক চরিত্র রয়েছে—যাঁরা যেন মহাকালকে নিয়ন্ত্রণ করছেন বা প্রভাবিত করছেন। অবশ্যই এই সকল চরিত্রের মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ হলেন শ্রীকৃষ্ণ ও দ্রৌপদী। এই দুই চরিত্র টালমাটাল সময়ে যেন হৃদয়ের টানেই একে অপরের কাছাকাছি চলে এসেছেন। মহাকাব্যিক উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করতে এঁরা একে অপরের পরিপূরক হয়ে উঠেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ ভাবতেন দ্রৌপদী তাঁর বান্ধবী (সখী)। আর দ্রৌপদীও ভাবতেন, শ্রীকৃষ্ণ এমন একজন লোক—যাঁর কাছে নিজের মনের কথা উজাড় করে বলা চলে।

আবার শ্রীকৃষ্ণ ও দ্রৌপদীর পরস্পরের প্রতি আচরণে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে ভাই ও বোনের মধ্যকার সম্পর্ক। এই সম্পর্ক শ্লথ নয়, গতিশীল। দ্রৌপদীর নির্ভরতা সর্বাধিক শ্রীকৃষ্ণের ওপর। আবার দ্রৌপদীকে রক্ষা করবার জন্য কৃষ্ণের বাধ্যবাধকতাও লক্ষণীয়। পরস্পরের প্রতি এই টান ক্রমেই গতি বাড়িয়েছে। একদিন কৃষ্ণের একটি আঙুল আঘাতপ্রাপ্ত হয় ও সেখান থেকে রক্ত ঝরতে থাকে। দ্রৌপদী তা দেখে তৎক্ষণাৎ নিজের শাড়ির একাংশ ছিড়ে ওই ক্ষতস্থানটিকে বেঁধে দিলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ কবুল করেছেন, 'দ্রৌপদীর সেই আচরণে ছিল প্রেম ও মমত্ব। আমি ওর কাছে ঋণী। পরবর্তীকালে যখনই দরকার হবে, আমি দ্রৌপদীর পাশে গিয়ে দাঁড়াব।'

কৃষ্ণের এই আশ্বাসবার্তা আদৌ অন্তঃসারশূন্য নয়, বরং অত্যন্ত কার্যকরী, দ্রৌপদী তাঁর জীবনের সবচেয়ে সংকটময় সময়ে তা দেখেছেন। দুর্যোধন, দুঃশাসন প্রমুখ যখন প্রকাশ্য রাজসভায় তাঁকে বিবস্ত্র করতে ব্রতী, শ্রীকৃষ্ণের মহিমায় তিনি চূড়ান্ত লজ্জার হাত থেকে রক্ষা পান। ভ্রাতা ও ভগ্নীর 'রক্ষাবন্ধন' উৎসবের সৌন্দর্য ও অলংকরণ সেই ঘটনাতে পরিস্ফুট।

দ্রৌপদীর সুখ্যাতি ও তাৎপর্য যাতে বিস্তারিত হয়, শ্রীকৃষ্ণ সেই ব্যাপারে সচেষ্ট থাকতেন। ছোটবড় কয়েকটি ঘটনা যেন করিডর দিয়ে এসে দ্রৌপদীর অলৌকিক শক্তিকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। প্রতিটি ঘটনার পিছনে কৃষ্ণের অপ্রত্যক্ষ প্রভাব।

যেমন সেই দুর্বাসা মুনির কাণ্ড। দুর্বাসা যখন যেখানে গিয়ে হাজির হয়েছেন, তখন সেখানে উপস্থিত সকলে অনিবার্যভাবেই দেখতে পেয়েছেন অশনিসংকেত। অত্যন্ত বদমেজাজি মুনি। অহঙ্কারও খুব। সবসময়

পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করে দেখেন, কেউ তাঁর প্রতি অবজ্ঞা দেখাল কি না কিংবা কোথাও তিনি তাঁর প্রার্থিত সুবিধা পেলেন কি না? যদি সেই বিশ্লেষণ ইতিবাচক না হয়, তাহলেই সর্বনাশ। অভিশাপে বিষজর্জর হয়ে উঠবেন মুনির অপছন্দের লোকেরা।

পরিস্থিতির প্রবাহে পাণ্ডবরা এহেন দুর্বাসা মুনির কোপে পড়বার পরিবেশে পৌঁছে গিয়েছিলেন একবার। দুর্ভাগ্য ও অবিবেচনার দায় বহন করতে চলছে তাঁদের দীর্ঘ বনবাস। সুখ থাকলেও স্বাচ্ছন্দ্য প্রায় অপসৃত। ওই সময় এক মধ্যদিবসে দুর্বাসা মুনি তাঁর একদল শিষ্যকে নিয়ে হাজির হলেন পাণ্ডবদের পর্ণকুটিরে। গগনচুম্বী অহমিকা ও ক্রোধের অধিকারী দুর্বাসা পাণ্ডবদের বললেন, 'আমি দুর্বাসা। এই মুহূর্তে আমি ও আমার শিষ্যরা অতীব ক্ষুধার্ত। আমরা নদীতে স্নান সেরে আসছি। তোমরা, আমাদের আহারের বন্দোবস্ত কর।'

পাণ্ডবদের মুখ শুকিয়ে গেল। এর চেয়ে বড় বিপদ বুঝি আর কিছু হতে পারে না। দুর্বাসার আগমনের কিছু পূর্বেই পঞ্চপাণ্ডব তাঁদের মধ্যাহ্নের ভোজন সমাপ্ত করেছেন। তাঁদের আস্তিনে এমন কোনও লুক্কায়িত তাস নেই—যার সাহায্যে তাঁরা এই বিপদের হাত থেকে উদ্ধার পেতে পারেন। রন্ধনশালায় ঢুকে দ্রৌপদী দেখলেন, হাঁড়িতে মাত্র এককণা অন্ন অবশিষ্ট রয়েছে। এখনই স্নান সেরে সদলবলে দুর্বাসা এসে হাজির হবেন। দৈবের নিকট নতিস্বীকার ব্যতিত আর উপায় বুঝি কিছু নেই।

নিরুপায় বিপন্ন সকাতর দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণের শরনাপন্ন হলেন। দ্রৌপদীর আর্তি শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় স্পর্শ করে। তিনি তৎক্ষণাৎ দ্রৌপদীর সামনে এসে দাঁড়ালেন। দ্রৌপদীর মুখে যাবতীয় বিবরণ শুনে বললেন, 'দুশ্চিন্তার কারণ নেই, সখী। দুর্বাসা যাতে আস্ফালনের সুযোগ না পান, তার ব্যবস্থা অমি করছি। তুমি ভাতের হাঁড়ি খুঁজে দেখ সেখানে এক কণা ভাতও লেগে আছে কিনা। যদি থাকে সেই দানাটি নিয়ে এস।'

দ্রৌপদী হাঁড়ি থেকে ঠিক এক কণা ভাতই খুঁজে পেলেন। আর সেই এক কণা তণ্ডুলের সাহায্যেই শ্রীকৃষ্ণ ঘটালেন যেন এক নিঃশব্দ বিস্ফোরণ। তণ্ডুলটিকে তিনি দু'ভাগ করলেন। এক ভাগ নিজে খেলেন। অন্য অংশটিকে নিবেদন করলেন সমগ্র জীব জগতের জন্য। সেই মুহূর্তে পৃথিবীর সকলেরই মনে হল, তারা প্রকৃতই ভোজনতৃপ্ত। এমনকী দুর্বাসা ও তাঁর শিষ্যরাও আর ক্ষুধার্ত থাকলেন না। এমন অবস্থায় আহারের সন্ধান কেবলমাত্র অর্বাচীনরাই

করে থাকে। প্রশান্তিতে স্থিতিশীল দুর্বাসা পঞ্চপাণ্ডবের কাছে বললেন, 'আমি লজ্জিত। আমাদের সকলের উদর পরিপূর্ণ। অকারণে তোমাদের ব্যতিব্যস্ত করেছি। তোমাদের মঙ্গল হোক।'

দ্রৌপদী ও শ্রীকৃষ্ণের যে সম্পর্ক, সেখানে রন্ধ্রে-রন্ধ্রে এই রকম স্নেহ, প্রীতি ও আস্থার নিটোল বন্ধন। দুর্যোধন প্রমুখের দ্বারা অপমানিত দ্রৌপদীর চোখে জল দেখে কৃষ্ণ বলেছিলেন, 'কৃষ্ণা, তোমার অশ্রুপাতের জন্য যারা দায়ী, তাঁদের কপালে জুটবে ভয়াবহ শাস্তি। এইরকম অনাচার, অপরাধ, নারী নির্যাতন দেখেও যাঁরা প্রতিবাদ জানাবার পরিবর্তে নৈর্ব্যক্তিক থাকলেন, তাঁরা যতই বয়োবৃদ্ধ ও মান্য হোন না কেন, মহাকালের নিকট তাঁদের এমত আচরণ কদাপি সহনীয় হবে না। কুলবধূর শ্লীলতাহানিকে তামাশাস্বরূপ জ্ঞান করবার অপরাধের সমান তাঁদের ওই নীরবতা। ফলে যথাকালে তাঁদের বীর্য ও প্রতিপত্তিও জীর্ণ ও খণ্ডিত হবে মহাকালের অমোঘ বিধানে।'

এইভাবে সীতার কারণে রাবন, দ্রৌপদীর কারণে কুরুবংশ এবং হেলেনের কারণে সমৃদ্ধ ট্রয়রাজ্যের বিনষ্টি। শক্তি-সামর্থ্যে এরা যতই প্রবলপ্রতাপ হোক না কেন, বহুবিধ হুলুস্থুলু ঘটনার মধ্য দিয়ে তাদের বিলুপ্তি অনিবার্য হয়ে ওঠে।

অনেক বিষয়ে এই তিনি নারীর মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে। আবার ভিন্নতাও বিস্তর। একটি বড় সাদৃশ্য হল তিন রমণীরই বিবাহ হয়েছিল স্বয়ম্বরসভার মাধ্যমে। এই বিষয়ে সীতা ও দ্রৌপদীর প্রসঙ্গ আগেই আলোচিত হয়েছে। এবার আসা যাক হেলেনের স্বামী নির্বাচনের কাহিনিতে।

হেলেনর রূপ-যৌবন, শিক্ষা ও ব্যক্তিত্বের কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। গ্রীসের বেশিরভাগ রাজ-রাজড়ারা লালায়িত ছিলেন হেলেনকে স্ত্রীরূপে লাভ করতে। তাঁদের নিরন্তর প্রয়াস ছিল নিজের নিজের শক্তি ও সম্পদের বার্তা হেলেন ও তাঁর জনক টাইনডেরাসের কানে এমনতরোভাবে পৌঁছে দেওয়া, যাতে অনুপমা নারীসম্পদ হেলেন সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর দিকে ঢলে পড়েন।

হেলেনকে বিয়ে করবার জন্য সমাগত আবেদনকারী বা Suitor-দের সংখ্যা নেহাৎ কম ছিল না। অনেকেই অতুল বৈভবের অধিকারী। অনেকে আবার নামজাদা বীর। আবার এরকমও হয়েছে, কিছু প্রার্থী সূচনাতেই হতাশ হয়ে ফিরে যান। তাঁরা বুঝে গিয়েছিলেন, হেলেনকে জয় করে নেবার সুবর্ণ সুযোগ তাঁরা পেতেই পারেন না।

হেলেনকে বিয়ে দেওয়া হবে—এই খাস সংবাদ পেয়ে যে সমস্ত প্রার্থী শেষ অবধি দৌড়ের মধ্যে ছিলেন, তাঁদের নাম-ধাম-পরিচয় নিয়ে বিভ্রান্তি ও বিতর্ক রয়েছে। তাঁরা প্রত্যেকেই নজর-কাড়া ভারি সুন্দর সুন্দর সমস্ত উপঢৌকন নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। হেলেনের স্বপ্নে মশগুল ওই সমস্ত জবরদস্ত প্রার্থীদের সামাল দেবার দায়িত্বে ছিলেন হেলেনের দুই বড় ভাই ক্যাস্টর ও পোলাক্স। উত্তেজনার সুতোয় নিজেদের বেঁধে প্রার্থীরা সব ঝুলে আছেন। পরস্পর পরস্পরের শত্রু। হেলেন যাঁর গলায় মালা দেবেন, তিনি যে নিশ্চিন্তে নববধূকে নিয়ে স্বস্থানে ফিরে যাবেন, অমন সম্ভাবনা খুবই কম। বরং সৃষ্টি হাতে পারে ভয়ঙ্কর হানাহানি। বইতে পারে রক্তগঙ্গা। বিয়ের আসরেই হেলেনকে অপহরণ করতে পারেন উপস্থিত যে কোনও খলনায়ক। প্রার্থীর তালিকায় রয়েছেন শক্তিশালী রাষ্ট্র স্পার্টার রাজা মেনেলিউসও। তবে তিনি স্বয়ং আসেননি। প্রতিনিধি হিসেবে বিস্তর উপহার সামগ্রী নিয়ে এসেছেন তাঁর অনুজ আগমেমনন।

সখীবৃন্দপরিবৃতা হেলেন কয়েকবার দূর থেকে দেখেও গেলেন চাঁদের হাঁট। ইতিউতি অন্বেষণের পর আমার হাতে এল উপস্থিত বিশিষ্ট প্রার্থীদের তিনটি তালিকা। তিনটি তালিকাই চিত্রাঙ্কিত। পরিচিতির ব্যাপ্তি দেখে যে কোনও কন্যারই হৃদয় হিল্লোলিত হবে। প্রেম ও মায়াপ্রসূ দৃষ্টিতে তাকাতে পারেন সকল প্রার্থীর দিকেই।

তালিকা তিনটিকে রচনা করে গেছেন যে তিন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি, তাঁদের নাম (১) পেসিউডো অ্যাপেলো ডোরাস, (২) হাসিতদ এবং (৩) হিগিনাস। পেসিউডো অ্যাপেলো ডোরাসের তালিকায় রয়েছে ৩১ জন Suitor-এর নাম। হাসিতদ লিখেছেন ১২ জন প্রার্থীর নাম এবং হিগিনাসের তালিকা থেকে পাচ্ছি ৩৬ জন পানিপ্রার্থীর বিবরণ। বিবরণ মানে পিতৃপুরুষের ঠিকুজি নয়। পূর্বাপর যৎসামান্য পরিচিতি। হেলেনকে লাভের বাসনা নিয়ে বহুজনের পৃথক পৃথক মোচ্ছব।

হেসিডোস এই নিয়ে কবিতা লিখেছেন। কিন্তু তাঁর কবিতায় সকল পানিপ্রার্থীর নাম নেই। বিশেষত একলিসের নাম বাদ যাওয়াটা বিস্ময়কর। হেসিডোস নিজে কবুল করেছেন, 'আমিও যখন হেলেনকে পাবার জন্য হাজির হয়েছি, বয়স তখন আমার খুবই কম। সুতরাং প্রতিযোগীদের মধ্যে কারুর কারুর নাম বাদ যেতেই পারে।'

এত যুগ বাদে গবেষক বা বিশ্লেষকরাও কেউ কারুর দিকে তর্জনী তুলে নস্যাৎ করবার অবস্থায় নেই। আমরা কেবল এখানে তিনটি তালিকাতেই

রয়েছে এমন প্রার্থীদের নিয়ে আলোচনা করব। কৌতুকাবহ বিষয় হল, এঁরা প্রত্যেকেই পরবর্তীকালে হেলেনকে উদ্ধার করবার জন্য ট্রয় আক্রমণে অংশ নেন। ইলিয়াডের পাতায় তাঁদের গৌরব, বীরত্ব ও প্রাচুর্যের কিছু বর্ণনা আমরা পাই।

তিনটি তালিকাতেই রয়েছে নিম্নোক্ত পানিপ্রার্থীদের নাম ঃ

* অ্যাজাক্স ॥ এঁর পিতার নাম ওয়েলাস। ইনি পরে ট্রয় অবরোধে সক্রিয় অংশ নেন। হেলেন উদ্ধার সম্ভব হবার পর নিজের অধীনস্থ ৪০টি যুদ্ধজাহাজ নিয়ে ফিরে আসছিলেন। কিন্তু সামুদ্রিক ঝড়ে তাঁর সলিল সমাধি ঘটে।
* এলিফেনর ॥ বাবার নাম চ্যালকোডন। হেলেনের এই প্রত্যাখাত প্রাণিপ্রার্থীও পরবর্তীকালে প্যারিসের হাত থেকে স্পার্টার রাণী হেলেনকে উদ্ধার করবার মানসে ৫০টি জাহাজ সেনা নিয়ে ট্রয় আক্রমণ করতে ছোটেন। ভয়াবহ যুদ্ধে তিনি মারাও যান।
* মেনেলিউস ॥ তিনি স্পার্টার সম্রাট। পিতার নাম অ্যাট্রিউস। তিনি স্বয়ং উপস্থিত হননি হেলেনকে স্ত্রীরূপে পাবার জন্য। কিন্তু বাসনা ছিল ষোল আনা। মন্থরভাবে শুরু করেও ক্রমশ তীব্র হয়ে ওঠে বাসনা। শেষমেশ নিজের ছোটভাইকে পাঠান আর্জি জানিয়ে। হেলেন প্যারিস কর্তৃক অপহৃত হবার পর যাঁর হৃদয় ও মান-ইজ্জত সবচেয়ে বেশি দুলে ওঠে, তিনি মেনেলিউস। ৬০ জাহাজ সৈন্য নিয়ে তিনি ট্রয়ের ওপর হামলে পড়েন। অতি দীর্ঘ যুদ্ধের অনৈতিক কৌশলের সাহায্যে ট্রয়ের পতন ঘটান তিনি। অসংখ্য যোদ্ধার তরল রক্তস্রোত মাড়িয়ে হেলেনকে নিয়ে যেন পা টিপে টিপে নিজের জাহাজটিতে উঠে বসেন স্পার্টায় ফিরে আসবার জন্য।
* মেনেস্থিউস ॥ ইনি রাজা পেটিয়োসের পুত্র। তিনি যে প্রার্থীদের মধ্যে অন্যতম নক্ষত্র ছিলেন, সে ব্যাপারে তিলমাত্র সন্দেহ নেই। হেলেনের কৃপাদৃষ্টি লাভের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষামান ছিলেন। প্রত্যাশা পূর্ণ হয়নি। কিন্তু পরে ট্রয়ের যুবরাজ প্যারিস হেলেনকে নিয়ে চম্পট দিলে সমগ্র গ্রীক জাতির সম্মানরক্ষার্থে তিনিও হেলেনের স্বামী মেনেলিউসের সঙ্গে হাত মেলান এবং নিজের রাজ্য এথেন্স থেকে ৫০টি রণতরী নিয়ে পড়ন্ত বেলার পাতলা আঁধারে রওনা দেন ট্রয়কে অবরোধ করতে। যুদ্ধে জয় হবার পর হেলেন যখন আবার

মেনেলিউসের বক্ষলগ্না, মেনিস্থিউস সেই ৫০ খানা অক্ষত রণতরী নিয়ে ফিরে এলেন স্বদেশে।

* ওডভসেসাস আর একজন পরাক্রমশালী বীর॥ যিনি আটঘাট বেঁধে এসেছিলেন হেলেনকে স্ত্রী রূপে পাবার আশায়। প্রত্যাশা পূরণ না হওয়ায় যারপরনাই হতাশ হন। কিন্তু পরে হেলেন ট্রয়ের যুবরাজ প্যারিস কর্তৃক অপহৃত হলে তিনিও তাঁর রাজ্য লেটিটস থেকে এক ডজন যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে গিয়েছিলেন ট্রয়কে ধ্বংস করতে। ট্রয় ধ্বংস হল। হেলেনও উদ্ধার হল। কিন্তু ওডভসেসাস সোজা দেশে ফিরে এলেন না। দশ বছর ধরে বহুদেশ ঘুরে তারপর নিজের রাজ্যে ফিরে এলেন।

* ফিলোকটেটেস্॥ ইনি রাজা পোয়েসের ছেলে। তুখোড় তিরন্দাজ। হেলেনকে না পাওয়ায় তাঁর প্রচ্ছন্ন ঈর্ষা ও ক্রোধ ছিল মেনেলিউসের ওপর—যিনি সকলের নাকে ঝামা ঘষে দিয়ে হেলেনকে বিয়ে করে সন্দর্পে ফিরে গিয়েছিলেন স্পার্টায়। তবুও হেলেন উদ্ধার অভিযানের শামিল হতে তিনি দ্বিধা করেননি। যুদ্ধের প্রথম দিকে ট্রয়ের প্রতিরোধ ভাঙতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছে। সাত জাহাজ সৈনিক নিয়ে ফিলোকটেটেস্ বার বার নাকাল হয়েছেন অধস্তনদের তুষ্ট রাখতে। যুদ্ধের রেখাচিত্র রচনায় অংশ নিয়েছেন ও পইপই করে সাবধান করে দিয়েছেন সহযোদ্ধাদের মুখোমুখি লড়াইটা যতটা সম্ভব এড়িয়ে যেতে। দুর্ভোগ কম হয়নি। কিন্তু শেষ হাসিটা শেষ অবধি সবচেয়ে বেশি হেসেছেন ফিলোকটেটেসই যেহেতু তাঁর নিক্ষিপ্ত তিরে ভূমিশয্যা নেন হেলেনের অপহরণকারী যুবরাজ প্যারিস। লক্ষণীয়, কাব্যে ফিলোকটেটেস্ প্রার্থিত গুরুত্ব ও প্রশস্তি পাননি।

* প্রোটিসিল্যান্স॥ ইনি রাজা ইপিসেলসের পুত্র। তাঁর সম্পদ-বৈভব প্রচুর হলেও বীরত্ব সম্পর্কে প্রথমে তেমন লেখাজোখা হয়নি। হেলেনকে স্ত্রীরূপে লাভের জন্য যে জমায়েত হয়েছিল, তার উপান্তে বসে যেন কর গুনছিলেন। প্রত্যাখাতের যন্ত্রণা নিয়ে ফিরে আসেন স্বদেশে। কিন্তু ট্রয়ের যুবরাজ প্যারিস হেলেনকে ফুঁসলে নিয়ে পালিয়েছেন, এখবর তাঁর কানে যেতেই প্রোটিসিল্যান্স গ্রীকদের সম্মান রক্ষার খাতিরে মহাকাব্যিক যুদ্ধের শামিল হলেন। তিনি ৪০ খানা যুদ্ধজাহাজ ভর্তি সেনা নিয়ে ট্রয়কে আক্রমণ করেন।

রণক্ষেত্রে প্রভূত বীরত্ব দেখান। যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জনও দেন। যুদ্ধে গ্রীকরা জয়ী হলে প্রোটিসিল্যান্সের জাহাজগুলি শোকজ্ঞাপক সাদা ও হলুদবর্ম পতাকা তুলে ফিরে আসে।

হেলেনকে বিবাহ করবার প্রস্তাব নিয়ে আগত বহু বীরদের মধ্যে এই সাতজনের নাম আমরা একাধিকবার পাচ্ছি। সমবেত মহারথীদের দেখে হেলেনের পিতা টাইনডেরাস রীতিমতন শঙ্কিত হয়ে পড়েন। এঁরা সকলেই যোগ্য। সুতরাং এঁদের মধ্যে কোনও একজনকে বেছে নিলে অন্যান্য সকলে ছেড়ে কথা বলবেন না। বিবাহবাসর রক্তধারায় প্লাবিত হতে পারে। যাঁরা এসেছেন, তাঁদের প্রত্যেকের হাতে বহু মূল্যবান সমস্ত উপহার। কে কাকে কতটা চমক দিতে পারেন, সেই বর্ণময় ক্যানভাসে তারও প্রতিযোগিতা চলেছে। অনেকেরই ধারণা, বৈভবের চাকিচিক্যে অন্যদের কাত করতে পারলেই হেলেনের হৃদয় জয় করা সম্ভব হবে। দারুণ এক উত্তেজনার আবহে টলমল করছেন সমাগত দিকপালরা। পর্দার মিহি আস্তরণের আড়ালে দাঁড়িয়ে হেলেন নিশ্চয় খুব উপভোগ করছিলেন মুহূর্তগুলিকে।

অবশ্য ব্যতিক্রমও আছে। তিনি ওডভসেসাস। তিনি অনেক খোঁজ খবর নিয়ে অঙ্ক কষে প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন। অন্য সব নামকরা প্রার্থীদের মতন উপহার-টুপহার নিয়ে হাজির হননি। তিনি জানতেন, সুতোটা রয়েছে হেলেনের হাতে। এই কন্যা যেদিকে হেলবে, সেটাই হবে মুখ্য বিবেচ্য। উপহারের বহর দেখে গাঁইগুঁই করবার পাত্রীও নন হেলেন। অতএব অকারণে তড়পে কোনও লাভ নেই। অপেক্ষা করো ও কৌশলী হও। এহেন ওডভসেসাসকেই দেখা গেল ত্রাতার ভূমিকা নিতে।

টাইনডেরাসকে সুযোগ মতন হাতের কাছে পেয়ে বললেন, 'আমি যদিও আপনার কন্যার একজন পানিপ্রার্থী হয়ে এসেছি তবুও এখানে যা হতে চলেছে, তা অনুধাবন করে রীতিমতন শঙ্কিত।'

'শঙ্কিত আমিও। কিন্তু করণীয়টা কী?'

'আপনি একটি ঘুরন্ত আগ্নেয়গিরির মুখে বসে আছেন। যে মুহূর্তে হেলেন তাঁর পছন্দের জনকে বেছে নেবেন, এ যাবৎ উদ্দামতায় টগবগে 'বাজা ও বীরের দল সমবেতভাবে ঝাঁপিয়ে পড়বেন সেই আপাত বিজয়ীর ওপর। বিজয়ী খুন হবার পর আপনার মেয়েকে নিয়ে টানাটানি শুরু করবেন ক্ষুধার্ত শেয়ালদের মতন। আমার আশঙ্কা, তখন হেলেনকেও প্রাণে বাঁচানোটা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।'

'ঠিকই বলছেন। আমাকে উদ্ধারের পথ দেখান।'

ওডভসেসাস মুচকি হাসলেন। তাঁর চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বলতর হয়। একটু নীচু গলায় বললেন, 'আপনার দুই পুত্রকেও ডাকুন। ওঁদেরও এই শলাপরামর্শে থাকাটা দরকার।'

হেলেনের দুই দাদাও এলেন।

ওডভসেসাস তখন ভাবলেশহীন মুখে বললেন, 'আমি জানি, এই রাজ্যের রাজকুমারী হেলেন কখনও আমার বক্ষলগ্না হতে চাইবেন না। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও সত্যি যে, হেলেনকে কেন্দ্র করে এমন ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটতে পারে, যার দায় গিয়ে বর্তাতে পারে আপনাদের ওপর। অর্থাৎ আপনারা কোনও মতে ধাতস্থ হবার সুযোগ পাবেন না।

এই পরিস্থিতির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার উপায় আমি বাতলে দেব। কিন্তু নিঃস্বার্থভাবে নয়। আমি হেলেনকে লাভের আশা একরমক ছেড়েই দিয়েছি বলতে পারেন। জমায়েত বহু তাবড় বীরদের তুলনায় আমি হয়তো একজন বেঁটে বাঁটকুল। তাই হেলেনকে ছেড়ে ঝুঁকে পড়েছি আইকারিয়াসের রূপবতী কন্যা পেনিলোপের দিকে। আপনারা যদি নিজেদের প্রভাব খাটিয়ে পেনিলোপের সঙ্গে আমার ভাব ভালবাসা গড়ে তুলতে সাহায্য করেন, আমিও প্রতিদানস্বরূপ এমন এক ব্যবস্থার দিকে আপনাদের নিয়ে যাবে, যেখানে হেলেন তাঁর পছন্দমাফিক স্বামী পাবেন, কোনও রকম দাঙ্গাহাঙ্গামা হবে না, আপনারাও নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমোতে পারবেন।'

টাইনডেরাস ও তাঁর দুই পুত্র সানন্দে তখন ওডভসেসাসকে সাহায্য করলেন পেনিলোপের সঙ্গে সখ্যতা গড়ে তুলতে। পরিবর্তে ওডভসেসাস সকল পানিপ্রার্থীর সঙ্গে দেখা করে তাঁদের সম্মত করলেন একটি সভায় একত্রিত হতে।

সভা বসল।

ওডভসেসাস সকলকে উদ্দেশ্য করে বলতে শুরু করলেন, 'আমার সকলে এখানে এসেছি হেলেনকে স্ত্রীরূপে লাভ করবার জন্য। আমরা কারা? আমরা গ্রীসের এক-একজন স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব। কিন্তু শক্তিমান হলেও ন্যায় ও নীতির প্রতি আমাদের সংবিৎ সর্বদাই অটুট। অথচ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই মুহূর্তে আমরা একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী। এক অপরিসীম বিপদের মুখে এসে দাঁড়িয়েছি আমরা।

হেলেন অনন্যা রমণীরত্ন। কিন্তু তিনি তো আর এতজন পুরুষকে বিয়ে করতে পারেন না। বিয়ে তিনি একজনকেই করবেন। ফলে অন্যদের মধ্যে

জ্বলে উঠতে পারে ঈর্ষানল। প্রত্যেকের নিজস্ব আক্ষেপ আর স্বগতোক্তির মধ্যে আবদ্ধ থাকবে না। হেলেনকে কেন্দ্র করে আচম্বিত হানাহানি শুরু হয়ে যাবে।

তাই সেই পর্যায়ে পৌঁছে যাবার আগে আমাদের খুঁজে নিতে হবে সঙ্কটমোচনের উপায়কে।

উপায় একটাই।

তাহল, আমাদের সমবেতভাবে একটি শপথ নিতে হবে।

আমরা শপথ নেব যে, হেলেন যদি আমাদের মধ্যে কাউকে পছন্দ করে জীবনসঙ্গীরূপে বরণ করে নেন, আমরা সেটা মেনে নেব। দুঃখ বা হতাশা যতই হোক, ওঁদের জীবনের রংমশাল আমরা নিভিয়ে দিতে যাব না। ওঁরা অন্তহীন সুখে দিনাতিপাত করুন—এটাই হবে আমাদের সমবেত শুভেচ্ছা। আমরা গ্রীক জাতির প্রতিনিধি। আমাদের কেউই অহঙ্কারের সুড়ঙ্গ বেয়ে আসেনি। আমাদের বিবেক ও নীতিবোধ যথেষ্ট। সুতরাং এই শর্ত মেনে নিতে আমাদের মধ্যে কারুর নিশ্চয় অসুবিধে হবে না।'

ওডভসেসার তাঁর গলায় আবেগ আনলেন। তাঁর উচ্চারিত শব্দের ডেসিবেল বাড়তে থাকে। প্রভাবিত হলেন সকলে। প্রত্যেকের স্পেলভিক স্পাকনিক নার্ভগুলিও নিয়ন্ত্রণে থাকে। পরিণামে উপস্থিত পানিপ্রার্থীরা ওই শর্তকে মান্যতা দিতে রাজি হয়ে গেলেন। তবে থম মেরে ছিলেন অনেকেই। মানভঙ্গের প্রশ্ন উঠল না। স্পার্টার শক্তিশালী ও বিশাল বৈভবের অধিকারী রাজার দিকে যখন ঢলে পড়লেন হেলেন, আর সকলে হতাশ হলেও নিশ্চুপভাবে মেনে নিলেন সেই সিদ্ধান্তকে।

এবার একটু অন্য দিকে দৃষ্টিপাত করতে হচ্ছে। কাহিনিপ্রিয় পাঠকদের হয়তো এটা ভালো লাগবে না। কিন্তু আমি নাচার। আমাদের দেশে বাল্মীকির রামায়ণ কিংবা ব্যাসদেবের মহাভারতকে অবলম্বন করে অনেক গাথা-উপগাথা রচিত হলেও মূলস্রষ্টা অর্থাৎ বাল্মীকি ও ব্যাসদেবকে কেউ নস্যাৎ করে দেবার স্পর্ধা দেখাননি। গ্রীসের বেলায় ব্যাপারটা কিন্তু খানিক বিপরীত। সেখানে হোমারের গতিমান কাব্যকে সপাটে আঘাত করলেন দিও ক্রিসোসটম। বললেন, হোমারের লেখায় অনেক ধৃষ্টতাপূর্ণ ত্রুটি বড় পীড়াদায়ক। যে কথাটা সোজাসাপটা বলা উচিত ছিল, তিনি সেটা ঘুরিয়ে অন্যভাবে দেখালেন। মেনেলিউসের সঙ্গে হেলেনের বিয়েটা আসলে একটা রাজনৈতিক চাল। মেনেলিউস তো হলেন স্পার্টার অধিপতি—যাঁর সামরিক ও আর্থিক প্রতিপত্তি অন্য সকলেক টেক্কা দিচ্ছিল। হেলেনর পিতারূপে টাইনডেরাস পাত্রনির্বাচনে

নিজের অন্তর্ভুক্ত অধিকারকে প্রয়োগ করেছিলেন। বাস্তবতার বিচারে সেটা যুক্তিযুক্তও ছিল। তৎকালীন গ্রীসে স্পার্টার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে পারলে মহিমা ও নিরাপত্তা দুটোই বৃদ্ধি পেত।

অর্থাৎ রাজকন্যা হেলেন মোটেই মেনেলিউসকে স্বামীরূপে পছন্দ করেননি। তিনি দাবার বোর্ডে রাণি হয়ে বসেছিলেন মাত্র। না, ঠিক বসে থাকা নয়। হেলেন তখন অন্তঃপুরে বসে যে সমস্ত কীর্তি করে চলেছেন, সেরকম যথেচ্ছাচার একজন স্বৈরিনীর পক্ষেই সম্ভব। সবচেয়ে রোমহর্ষক ঘটনা হল, ঠিক ওই সময়ে প্রাসাদের অন্তঃপুরে ঢুকে পড়েছেন ট্রয়ের যুবরাজ প্যারিস। অনুপ্রবেশ করতে তাঁর কোনও দুর্ভোগও হয়নি, যেহেতু প্যারিসকে দেখেই হেলেন একেবারে প্রেমবিগলিত হয়ে পড়েন। তিনি তখন গিয়ে আবদার করেন তাঁর পিতা টাইনডেরাসের কাছে—আমি প্যারিসকে চাই। অন্য কোনও পুরুষের দিকে আমি তাকাতেও চাই না। তুমি ব্যবস্থা করো।

হেলেনের ওপর তাঁর বাবা ও দাদাদের প্রশ্রয় ও স্নেহ ছিল অসীম। বরাবারই খুব ঢিলেঢালা নজরদারির মধ্য দিয়ে হেলেন তাঁর যৌবনে পা রেখেছিলেন। তংার মন পছন্দ পুরুষ স্পার্টার রাজা মেনেলিউস নন, যদিও রাজা টাইনডেরাস ততক্ষণে ঘোষণা করে দিয়েছেন, হেলেন তাঁর বরমাল্য মেনেলিউসের গলাতেই ঝুলিয়ে দিতে চলেছেন। হেলেন তাঁর বক্তব্য আশানুরূপ সময়ে টাইনডেরাসের সমীপে উপস্থাপিত করেন নি। এটা যদি আগে জানা যেত, ঘটনার ওপর কত সহজেই পর্দা টেনে দেওয়া যেত। অত দীর্ঘ প্রতিশোধস্পৃহাসূচক ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের প্রয়োজনই হতো না। অবশ্য ট্রয় ধ্বংসের মতন ট্র্যাজিক ঘটনার ঘনঘটা আমাদের শিরদাঁড়াকে টানটান করেও রাখতে পারত না।

বিব্রত টাইনডেরাস তাঁর দুই পুত্রকে ডেকে এনে জানালেন হেলেনের কীর্তি। ইতিমধ্যে হেলেন কয়েকবার মিলিতও হয়েছেন প্যারিসের সঙ্গে। মন যখন উদ্দাম, দেহ যেখানে সাড়া না দিয়ে পারে না।

অর্থাৎ পরিবারে যাঁরা তাঁর অভিভাবক, তাঁদের সম্মতি নিয়েই হেলেন প্যারিসের বক্ষলগ্না হয়ে উড়াল দিলেন। পিছনে পড়ে রইলেন গ্রীসের তাবড় রাঘববোয়ালারা। এঁদের মধ্যে মেনেলিউস তো খবরই পেয়ে গিয়েছিলেন যে পরিজনদের সম্মতির দৌলতে হেলেন তাঁর বৈধ স্ত্রী হয়ে গেছেন। এখন কেবল জাহাজে তুলে স্পার্টায় নিয়ে যাবার অপেক্ষা।

প্যারিস জলপথে হেলেনকে নিয়ে প্রাথমে যান ক্রেনাই দ্বীপে। আশ্চর্য সুন্দর সেই জায়গা। আরও মোহময় ছিল তাঁদের সেখানে উপস্থিত হবার

সময়টুকু। চরাচরময় সূর্যাস্তের লালিমা। সমুদ্রের উচ্চকোটি উদ্দাম ও মানুষের ক্ষুদ্রতার প্রতি বিদ্রূপ তখন স্তব্ধ। হোমার ইলিয়াডে লিখেছেন, প্রকৃতির সেই অনাবিল আবহে ছিল কেবলই মিলনের আহ্বান। দুনিয়ার কে কোথায় অপ্রসন্ন হলেন, কোন অপমানিত মনঃক্ষুণ্ণ শক্তিমান পুরুষ ধেয়ে আসতে পারেন তাঁদের দিকে—এই সমস্ত ভাবনাকে আমল দেবার মতন অবস্থায় ছিলেন না পরস্পরের প্রতি প্রেমাপ্লুত হেলেন ও প্যারিস।

হেলেন ও প্যারিসের মধুচন্দ্রিমা চলে তিন দিন ধরে। ওই তিনদিনের প্রতিটি মুহূর্ত তাঁরা উপভোগ করেছেন। তারপর ক্রেনাই দ্বীপ ত্যাগ করে চললেন ট্রয়ের দিকে।

কিন্তু প্যারিস হেলেনকে নিয়ে আদৌ ট্রয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন কিনা, এই বিষয় নিয়েও বিতর্ক আছে। তিন তাবড় পণ্ডিত টেসিকোরাস, হেরোডোটাস এবং ইউরিপিডিসের তত্ত্বকে যদি মেনে নিতে হয়, তা হলে কিন্তু আমার অভিপ্রায় থাকুন না থাকুক, ইলিয়াডের গল্পটাকেই অন্তত আশি ডিগ্রি বদলে দিতে হবে। এঁরা বলছেন, হেলেনের প্রেমের তাপে প্যারিস একেবারে গলে যান ও হেলেনর ইচ্ছানুসারে তাঁরা দুজন ট্রয়ের বদলে পালিয়ে যান মিশরে। গ্রীকরা কিন্তু হেলেন ট্রয়েই রয়েছেন, এই ধারনার বশবর্তী হয়ে ট্রয়কে আক্রমন করে। যুদ্ধের এক মোক্ষম সময়ে প্যারিস ট্রয়ে চলে আসেন জন্মভূমিকে রক্ষা করবার জন। কিন্তু হেলেন সেই দশ বছর ব্যাপি রক্তক্ষয়ী অস্থির-উচাটনপূর্ণ যুদ্ধের সময় মিশরে অবস্থান করেছিলেন। সময় থেকে সময়ান্তরে ভয়াবহ যুদ্ধের বিভিন্ন দুভার্গ্যজনক বার্তা তাঁর কানে আসত। কিন্তু হেলেন কোনও দিন মেহেরবানি দেখিয়ে তাঁর প্রেমিকের জন্মভূমি ট্রয়ের বুকে পা রাখেননি।

ঐতিহাসিক হেরোডোটাস বলেছেন, 'ট্রয়ের যুদ্ধ ইতিহাসসিদ্ধ ঘটনা। আমি সূত্র ধরে উপস্থিত হই মিশরে। সেখানে অনেক বৃদ্ধও প্রাজ্ঞ পুরোহিতদের সঙ্গে আমি কথা বলি। তাঁরা আমাকে জানান, ট্রয়ের যুদ্ধ যতদিন ধরে চলছিল, হেলেন মিশরেই অবস্থান করেছিলেন। ট্রয় ধ্বংস হয়। প্যারিস সহ রাজপরিবারের সকলে মারা যান। গ্রীকরা তখন জানতে পারে, হেলেন রয়েছেন মিশরে। মেনেলিউস তখন সদলবলে মিশরে ঢুকে হেলেনকে নিয়ে স্পার্টায় ফিরে যান।'

যেহেতু তিনি হেরোডোটাস, তাই তাঁর বৃত্তান্তে তাৎপর্য থাকবেই। তবে সেই সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে, হেরোডোটাস এই সমস্ত কথা লিখেছিলেন

ট্রয়যুদ্ধ হয়ে যাবার সাতশত বছর বাদে। তাই প্রত্যয়সিদ্ধ মানসিকতা নিয়ে তাঁর বৃত্তান্তকেই বা কীবাবে ধ্রুব বলে মেনে নিতে পারি?

বরং হোমারের প্রতি এই সমস্ত পণ্ডিতদের অমন ক্রোধী হতে দেখে আমি স্তম্ভিত। হোমারের কাব্যসুধা তাঁদের কেতাবি ব্রিলিয়ান্সকে তথা চাপা বিদ্বেষকে অতিক্রম করে এত দূর বিস্তৃত যে পরবর্তী সকলের দর্পচূর্ণ করবার পক্ষে তা যথেষ্ট।

আমরা আবার সেই ইলিয়াডেই ফিরে যাচ্ছি।

মেনেলিউস খবর পেলেন, তাঁর স্ত্রী হেলেন অপহৃতা হয়েছেন। অপহরণকারী ট্রয়ের যুবরাজ প্যারিস। এই সংবাদ যেন রাতচরা পাখির কর্কশ ডাকের চেয়েও ভয়ঙ্কর।

মেনেলিউস অস্থির প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি বেশ ধীরে সুস্থে প্রতিশোধের রাস্তায় পা রাখলেন। রাজ্যের জ্ঞানী-গুণী জ্যোর্তিময় ব্যক্তিদের সঙ্গে শলা করে এক জ্বালাময় আবেদন রাখলেন গ্রীসের সেই সমস্ত রাজপুরুষদের সমীপে—যাঁরা প্রত্যেকে হেলেনের পানিপ্রার্থী হয়েছিলেন।

জাত্যাভিমানের প্রশ্ন ও আবেগ সর্বদাই রেট্রোস্পেক্টিভ। সকলেরই অবয়ব ক্রোধে-উত্তেজনায় গনগনে।

ফলে শুরু হল এক দীর্ঘস্থায়ী রক্তশ্রাবী যুদ্ধের সূচনা। সেই যুদ্ধের অনুপুঙ্খ পরিক্রমণ আমার লক্ষ নয়।

আমি এখানে কেবল খোঁজার চেষ্টা করছি ওই ভয়াবহ বিধ্বংসী প্রেক্ষাপটে বসে ট্রয়ের রাজপ্রসাদে অবস্থান রত বর্ণময়ী হেলেনর তখন কী অবস্থা?

সেই বিবরণীও আমি কখনও ইলিয়াড, কখনও অন্য উৎস থেকে তুলে আনবার চেষ্টা করেছি।

প্রত্যেক গ্রীক বীর অনেকগুলি করে জাহাজ নিয়ে হাজির হয়েছিলেন। প্রতিটি জাহাজে শত শত যোদ্ধা। জমায়েত যখন ক্রমশ সংবদ্ধ হচ্ছে, সমুদ্র ছিল তখন ঈষৎ অশান্ত। বাতাসের দাপটে ঢেউ স্ফীত, বিস্ফারিত। কিন্তু যুদ্ধ জাহাজগুলি যখন মাত্র যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছে, ঝুপ্ করে পড়ে গেল বাতাস। অদ্ভুত এক দমবন্ধ অবস্থা। বাতাস না থাকায় প্রতিটি জাহাজের পাল নেতিয়ে পড়েছে। জাহাজ যাবে না।

কেন এমন হল?

কারণ, প্রকৃতির দেবী আর্টেমিসের মেজাজ বিগড়েছে।

গ্রীকরা তাঁর প্রতি যথাযথ সম্মান দেখায়নি। বা তাঁর সন্তুষ্টির জন্য যা করা দরকার, তা করেনি।

আর্টেমিসের ক্রোধ কমাবার মহৌষধি হলেন এগমেমনের রূপসী কন্যা ইফিজিনিয়া। ইফিজিনিয়াকে আর্টেমিস ঈর্ষা করেন। এখন যদি আর্টেমিসকে ভালোভাবে বোঝানো না যায়, ওই প্রেক্ষিতেই ইফিজিনিয়াসের সর্বনাশ অনিবার্য হয়ে উঠবে।

আর্টেমিসের ক্রোধ অবশ্য প্রশমিত হল।

বাতাসের প্রবাহ স্বাভাবিক হবার সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হল যুদ্ধের পদচারণাও। বহু যোদ্ধা, বহু রাজা সেনাপতি ও দু-একজন বিরল চরিত্রের বোহেমিয়ান বীরকে নিয়ে ট্রয়ের অভিমুখে তরতরিয়ে অগ্রগামী হয় গ্রীক যুদ্ধ জাহাজগুলি।

তবে গ্রীকরা প্রথমেই একরকম খাঁচায় আটক হেলেনকে উদ্ধারের জন্য যুদ্ধ শুরু করে দেননি। সন্ধির শর্ত নিয়ে একটি মিশন উপস্থিত হয়েছিল ট্রয়ে। কথাও হয়েছিল ট্রয়ের রাজা প্রেয়মের সঙ্গে। বৃদ্ধ রাজাকে বোঝান হল, স্পার্টার রাণি হেলেনকে নিয়ে প্যারিস ট্রয়ে ঢুকে পড়ায়, ট্রয়ের মহাবিপদ সমাসন্ন। সমস্ত গ্রীস আজ একতাবদ্ধ হয়েছে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে। গ্রীসের বিভিন্ন রাজ্যের যেমন সমস্ত জাঁদরেল বীর রয়েছেন, যাঁদের কাছে ট্রয়কে ধ্বংস করে ফেলাটা কোনও ব্যাপারই নয়। এই মহাবিপদ অন্তর্হিত হতে পারে একটি মাত্র উপায় অবলম্বন করলে। তা হল, স্পার্টার রাজার হাতে হেলেনকে তুলে দেওয়া।

এখানে একটা ব্যাপার লক্ষণীয়। হেলেনের সঙ্গে ইতিমধ্যে প্যারিসের শারীরিক মিলন একাধিকবার হয়েছে জেনেও কিন্তু মেনেলিউস হেলেনকে ফিরে পেতে আগ্রহী ছিলেন। অন্যদিকে রামায়নে রাম জানতেন যে, সীতা রাবণ কর্তৃক ধর্ষিতা হননি। তথাপি সীতার ওপর কঠিন মানসিক নির্যাতন চালানো হয়েছিল রামেরই সম্মতিতে। প্রাচ্যের তুলনায় পশ্চিমে নারীরা বরাবরই অধিক স্বাধীনতা ও সম্মান ভোগ করে এসেছেন।

যাই হোক, গ্রীকদের মিশন ব্যর্থ হল।

সঙ্কটমোচনের আর কোনও পথই খোলা রইল না।

ট্রয় ও গ্রীসের দাপুটে যোদ্ধারা নিজের নিজের হিম্মত দেখালেন রণক্ষেত্রে।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়েছিল আঠারো দিন ধরে।

আর ট্রয়ের যুদ্ধ চলেছিল দশ বছর ধরে।

এই দশ বছরে মেনেলিউস প্রৌঢ়ত্বে পা দিলেন। হেলেনকে নিয়ে প্যারিসেরও চিত্তচাঞ্চল্য প্রশমিত প্রায়। হোমার লিখেছেন, অবরুদ্ধ ট্রয়ের হারেমে আবদ্ধ হেলেন তখন এক নির্মম বিচ্ছন্নতাবোধে আক্রান্ত। তিনি ঠিক দিগনির্ণয় করতে পারছেন না, কী ঘটতে চলেছে। যে প্যারিসের তারুণ্য ও

উন্মাদ প্রেম একদা তাঁকে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য করে তুলেছিল, সেই প্যারিসের কাছেই তিনি যেন এক ঠুঁটো পুতুল।

কথাই বলতে চান না, সোহাগ জানানো দূরের কথা।

বাইরে ধুন্ধুমার যুদ্ধ চলেছে। আর ভেতরে চলছে প্যারিস ও হেলেনের মন কষাকষি। কেউই পিঠটান দিতে রাজি নন।

ওইকালে অধিকাংশ সময়ে মৌনী থাকা হেলেন দু'জনের কাছে মানসিক আশ্রয় পেয়েছিলেন।

একজন ট্রয়ের বৃদ্ধ ও স্থিতধী রাজা প্রেয়ম। অন্যজন প্যারিসের দাদা হেক্টর। প্রেয়মের কাছে স্নেহ পেয়েছিলেন হেলেন। তংার হেক্টরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের রসায়ন যে শেষাবধি কোন দিকে মোড় নিত, অনুমানের বিষয়। আমরা কেবল জানি, মহাবীর হেক্টর সাড়ম্বরে হেলেনকে এসে শোনাতেন যুদ্ধের হালহকিকৎ। হেক্টরের বীরত্বের কাছে নিষ্ফল হয়ে যাচ্ছে গ্রীকদের সমবেত আক্রমণ। হেক্টরের বর্ণনা শুনতে শুনতে হেলেনের মুখ চোখ এমন উজ্জ্বল হয়ে উঠত যে মনে হত তিনি সত্যি সত্যি গ্রীকদেরই সমূলে বিনাশ চান।

সেই হেক্টর যেদিন রণক্ষেত্রে প্রাণ দিলেন, দুঃখে পাষাণ হয়ে গিয়েছিলেন হেলেন। মনে হল, এর চেয়ে মর্মান্তিক সংবাদ এই বিশ্বে আর কিছু হতে পারে না। অথচ হেক্টরের শেষকৃত্যে যোগ দিতে গিয়ে ট্রয়বাসীদের হাতে খুবই হেনস্তা হন হেলেন। তিনি তখন ট্রয়ের সবচেয়ে নিন্দিতও ধিকৃত নারী। অথচ, ঠিক ঠিক বিচারে বসলে আমরা কী হেলেনের দিকে আঙুল তুলে বলতে পারি—'তুমিই ট্রয়ের ধ্বংসের জন্য দায়ী?

আমরা কী সীতার দিকে আঙুল তুলে অভিযোগ জানাতে পারি, 'সোনার লঙ্কা যে ছারখার হয়ে গেল, তুমিই এর জন্য দায়ী'?

আমরা কী দ্রৌপদীকে তাক করে অভিযোগের সায়ক নিক্ষেপ করতে পারি, 'ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের নিধন তোমারই চক্রান্তের ফল'?

না, পারি না।

ধ্বংসের পিছনে নারী উপলক্ষ্য মাত্র। ধ্বংসের বীজ পুরুষের মধ্যেই নিহিত থাকে। প্যারিস, রাবণ, দুর্যোধন—এই চরিত্রগুলিই যুগে যুগে ধ্বংসের কারণস্বরূপ আবির্ভূত হয়েছেন। আমরা বরং হেলেনকে সমবেদনা জানাই—যে হেলেন ট্রয়ের প্রাসাদে দাঁড়িয়ে কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে বলছেন ঃ

Wherefore I wail alike for Thee and for my hapeless self with grief at heart, for no longer have I anyone beside in broad Troy That is gentle to me or kind but all men shudder at me.

ইলিয়াডের হেলেন, রামায়নের সীতা, মহাভারতের দ্রৌপদী —আরও কিছু দর্শন ও অনুভব

তিন মহাকাব্যের তিন নায়িকাকে এই ছকে আঁকতে যাওয়াটা বেকুফের কাজ। তিনটি মহাকাব্যেরই এত প্রকারের শাখা-প্রশাখা যে তাদের একত্রিত করে একটি বিন্যস্ত গাথা রচনা করা দুস্কর। কাহিনির সূত্র ধরে সমাপ্তির দিকে অগ্রসর হতে গিয়ে কেউ যদি নাকাল হন, মেজাজও রুক্ষ ও তিরিক্ষে হয়ে ওঠে সেটাকে সহজভাবে মেনে নিতে হবে।

যেমন সীতার দিনপঞ্জীকে পর্বে পর্বে অনুধাবন করবার সময় কোথায় যেন অপূর্ণতা অনুভবে এল। এ অপূর্ণতার হেতু খুঁজতে গিয়ে পেয়ে গেলাম স্বয়ং বশিষ্ঠমুনি রচিত যোগাবশিষ্ঠ রামায়ণকে। বলা হয়, যাঁরা যোগাবশিষ্ঠ রামায়ণের ধারপাশ দিয়ে না গিয়ে রামায়ণী চরিত্রায়নে ব্রতী হয়েছেন বা হচ্ছেন, তাঁদের কাজ যথার্থ মহৎ হয়ে উঠতে পারে না।

যোগবশিষ্ঠ রামায়ণে রাম একের পর এক প্রশ্ন করে গেছেন এবং ঋষি বশিষ্ঠ তার উত্তর দিয়ে গেছেন যুক্তির দৃঢ়তায়। ঋষির অভিমত রাজা রামচন্দ্র নতমস্তকে মেনে নিয়েছেন। যুক্তি-তর্কের ঝড় সেখানে ওঠেনি।

বিদ্যতে ত্বয়ি সঞ্চৈব প্রচ্ছকস্য গুণাবলী।
বক্তুর্গনানী চ ময়ি রত্ন শ্রীর্জ্জল ধৌ যথা॥

বশিষ্ঠ রামকে বলছেন, 'রাম, আমি তোমার শুভাকাঙ্খী, যেরূপ তুমি প্রজাসাধারণের শুভাকাঙ্খী। প্রভেদ এই যে, আমি তোমাকে উপদেশ দিতে পারি। আর তোমাকে নিজস্ব আচরণের মধ্য দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। সমুদ্রে যেমন ভুরি-ভুরি সম্পদ নিয়ে লক্ষ্মী অবস্থান করছেন, এখানে তোমার ও আমার মধ্যে এত গুণাবলী রয়েছে যে আমরা দু'জন আদর্শ প্রশ্নকারী ও উত্তরদায়ক হতে পারি। তত্ত্বকথা কখনও অপাত্রে দান করতে নেই। আর তোমার চেয়ে সুপাত্র আমি কোথায় পাব?'

অতঃপর রাম একটির পর একটি কঠিন থেকে কঠিনতর প্রশ্ন ক'রে গেছেন এবং বশিষ্ঠ প্রতিটি প্রশ্নের সুচিন্তিত উত্তর দিয়েছেন নিজেকে সুনিয়ন্ত্রিত রেখে।

এ সকলের নেপথ্যে ছিল শ্রীরামচন্দ্রের বিবেকদংশন। সীতাকে হারিয়ে রাম অবশ্যই পর্যুদস্থ। বশিষ্ঠের নিকট তিনি নীতি ও শান্তি উভয়ের হদিশ চান।

প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে উৎসারিত হয়েছে অমূল্য সমস্ত তত্ত্বজ্ঞান যথা উৎপত্তি প্রকরম, বৈরাগ্য প্রকরণ, মুমুক্ষু আচরণ, স্থিতির রহস্য, উপশম প্রকরণ এবং নির্বাণ প্রকরণ। সমস্ত পর্বে পর্বে বিভক্ত। এইগুলিকে পাঠ না করে রাম ও সীতা সম্পর্কে লেখার ওপর যতি টানব—এটা যে ঘোর অসমীচীন।

যোগবশিষ্ঠ রামায়ণে আছে ৩২ হাজার শ্লোক। ইত্যাকার শ্লোকগুলির সঙ্গে পরিচিত না হয়ে যিনি রামায়ণ পাঠ সমাপ্ত করবেন, তিনি ওই মহাকাব্যের প্রতিটি ঘটনার তাত্ত্বিক দিকটিকে অনুধাবনে অসমর্থ হবেন।

কিন্তু ঋষির সেই জ্ঞানভাণ্ডারের স্বাদ পেতে হলে সংস্কৃত ভাষার ওপর দখল চাই। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, 'ভারতবর্ষের চিরকালের যে চিত্ত তাহার আশ্রয় সংস্কৃত ভাষায়। এই ভাষার তীর্থপথ দিয়া আমরা দেশের চিন্ময় প্রকৃতির স্পর্শ পাব' [উৎস ঃ আশ্রমের রূপ ও বিকাশ]।

প্রণম্য মনীষী ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ও লিখেছেন, 'Indian life and thoughts and Indian literature in ancient, medieval and modern times (until very recently) have remain imbedded in the Upanishads, the Ramayana, the Mahabharata, and the Purans. Without a knowledge and appreciation of these, no knowledge and appreciation of Indian literature, even for the modernage, is possible.

Their great works have exercised a tremendous fascination on the Indian mind for some 2000 years and more, and left a profound influence on all Indian literatures. Infact, these works are India : and in all the languages of India and their literatures.

It is the content and the spirit of the Ramayana and the Mahabharata, and the Purans, with the Upanishads and the Dharmashastras in the background, they have found and are still finding their full play and their natural abode.

They have moulded the life and literature of India and constitute the greatest literary heritage of the country, the

cultural unity of India, ancient medieval and modern has been primarily nurtured through them.'

[Cultural Heritage of India, Volume–V]

বশিষ্ঠ তাত্ত্বিক দিক থেকে সুস্পষ্ট হয়েও মানবিক বিষয়ে সংবেদনশীল। বৈরাগ্য-প্রকরণে তিনি যে ১৫ শত শ্লোক রচনা করেছেন, সেখানে তাঁর নমনীয়তা পরিস্ফুট। যাঁর বৈরাগ্য আসেনি, আধ্যাত্মিক ভুবনে তাঁর বিচরণ যে সম্ভব নয়, বশিষ্ঠ তা জানিয়েছেন।

বশিষ্ঠের মুমুক্ষ প্রকরণে শ্লোকের সংখ্যা এক হাজার। বশিষ্ঠ এখানে বলেছেন, তিনিই মুমুক্ষের পথে অগ্রসর হতে পারেন, যাঁর বৈরাগ্য এসেছে। বাসনা আছে, পিছু টান রয়েছে—এ রকম ব্যক্তি মুমুক্ষের সত্যিকারের প্রত্যাশীও হন না। তিনি বার বার তাঁর পরিচিত পরিমণ্ডলে ফিরে আসতে প্রলুব্ধ হন। এক প্রত্যাশা থেকে অপর প্রত্যাশায় চলে যান ও সেই পার্থিব প্রত্যাশা পূরণের টানে পুনরায় ফিরে আসেন পরিত্যক্ত বৃত্তে।

যে মানুষের মুক্তির বাসনা প্রবল, তিনি আর কিছুর প্রত্যাশী থাকেন না। এরপর বশিষ্ঠ রামের কাছে ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর উৎপত্তি প্রকরণকে। এই প্রকরণে রয়েছে সাত হাজার শ্লোক। বশিষ্ঠ এখানে 'আমি' তথা 'আমরা', 'তুমি' তথা 'তোমরা' শীর্ষক যে ভ্রমাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী সাধারণ মানুষ লালন করে থাকেন, তাকে আক্রমণ করেছেন। বিশেষত যিনি প্রজাপালক, তাঁর এমত দৃষ্ঠিভঙ্গী প্রায়শ ধ্বংসাত্মক হয়ে থাকে। যুগপৎ স্থাবর ও জঙ্গম নিয়ে যাঁরা ভাবিত, তাঁরা কেবল আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তিই হাতড়ে বেড়াবে সারাটা জীবন। গূঢ় সত্যের ভুবনে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হবে। চার দেয়ালের সীমায় আবদ্ধ সংসার বার বার ভ্রমাত্মক স্বপ্ন ও সংকল্পকে উপাচার হিসেবে উপস্থিত করে। এইগুলি মুখ্যত শূন্যগর্ভ, গন্ধর্ব নগরের মতন তুচ্ছ, দ্বিতীয় চন্দ্রের ন্যায় মিথ্যা ও পিশাচের সৃষ্টি মোহের সমান। এই অবস্থার হাত থেকে মানুষ যখন মুক্ত হয়, তখন আসে সে-ধৈর্য, সে-স্থৈর্য।

স্থিতি প্রকরণে ৩ হাজার শ্লোকের বুদ্বুদ। এই প্রকরণ চেনাচ্ছে জগত আসলে কী, কোথায় তার অলীকত্ব, কোথায় তার ভ্রম? জীবনের দৃশ্যগুলি পর পর দেখে যাও। তাহলে বুঝতে পারবে, ভ্রান্তি কোথায়, নিজের প্রতি কোথায় কতটা তুমি বঞ্চনা করেছ। ভ্রান্তিময় এই ভুবনই কতগুলি পরিত্যাজ্য সরল নিয়মে আকারে বাড়তে থাকে।

ওই ভ্রান্তি ও বঞ্চনার হাত থেকে উদ্ধার পাবার দিশা দিয়েছেন মুনি বশিষ্ঠ তাঁর উপশম প্রকরণে। সেখানে শ্লোকের সংখ্যা ৫ হাজার। মানুষ-মানুষীর

দেহ ও সংসারে শ্রেষ্ঠত্ব লাভের বাসনা—এই দুই বোধ অপরিহার্য উপাচার নিয়ে আসে। অন্তর ও একাগ্রতার নিরিবিলিতে তাদের অতিক্রম করবার শক্তিও কিন্তু রয়েছে মানুষেরই ভিতর। নিজেকে শান্ত রাখা, সহনশীলতায় মুড়ে রাখা, আধ্যাত্মিক মধুরতায় আপ্লুত থাকা সমস্তই জ্যোৎস্নাময় ঢেউ। সেই অর্জিত বোধকে নিয়তির নিষ্ঠুর খেলাও অতিক্রম করতে পারে না।

বশিষ্ঠের পরবর্তী বিশ্লেষণ হল নির্বাণ প্রকল্প। এইটি যেন মুনিপ্রবরের বৃহৎ জয়লেপন। শ্লোক সংখ্যা বিস্তর—সাড়ে ১৪ হাজার। তথাপি আধিক্যের দোষে দুষ্ট নয়। উদ্দেশ্য অবিদ্যার মূলোচ্ছেদ। বেশিরভাগ মানুষ অবিদ্যার ফেনসিং টপকাতে ব্যর্থ হয়। এর কারণ মানুষ স্বভাবত কল্পনাপ্রবণ। কল্পনা আনে সুদূর উচ্চাশা। উচ্চাশা পূরণ হয় না, কারণ উচ্চাশা যে সীমাহীন। ফলে মানুষ প্রোথিত হয়ে থাকে অপ্রাপ্তির কর্দমে। অন্যদিকে কল্পনা শক্তি যোগায় বলেই মানুষ একটার পর একটা কর্মে ব্রতী হয়।

কিন্তু মানসপটে এই কল্পনার যখন অবসান ঘটবে, তখন ছোট-বড় সুখ ও দুঃখের গাথাগুলিও বায়বীয় হয়ে উঠবে। তখন আসে ব্রহ্মভাব। এই ব্রহ্মভাবে ভরপুর হবার লক্ষ্যেই অগ্রগামী হওয়া উচিত রামের ন্যায় রাজাসনে শোভিত ক্ষমতাবান ব্যক্তিরও। পার্থিব দৃশ্য ও দর্শনকে এইরূপে উৎখাত না করতে পারলে বিশুদ্ধ নির্বাণ কুত্রাপি অর্জিত হয় না। বশিষ্ঠ বলছেন, অবিদ্যার এক খণ্ডাংশ হয়েই ছিল এই জগৎ। বিদ্যা ও অবিদ্যার ঐকতান রচনার বহু প্রয়াস হয়েছে। চিন্ময় যে আকাশ সে দৃষ্টিনন্দিত কল্পিত আকাশকেও প্রাধান্য দিতে গিয়ে যে ভ্রমের সৃষ্টি হয়েছিল, তাকে এইবার বিনষ্ট করতে হবে। যদি রাম তা পারেন, তবেই তিনি হবেন অবতার।

রাম বশিষ্ঠের মুখে উক্ত সকল প্রকরণ ব্যাখ্যা শুনতে শুনতে নিজের অগ্রতুলতাকে অনুভব করতে পারছিলেন।

রামের প্রশ্ন, আমি রাজা। আমার কাছে প্রজাসাধারণের ইচ্ছা-অনিচ্ছাই সর্বাধিক গুরুত্ব পাবে। তাই না?

বশিষ্ঠের উত্তর, আপাতত তোমার নিকট যা আবশ্যিক কর্তব্য বলে হচ্ছে, সেটার গুরুত্ব হয়তো ততটা নয়। এখানে তোমার নিজস্ব বিচারবুদ্ধির চেয়েও অনুভবকে অধিক প্রাধান্য দিতে হবে। সাধারণ মানুষ সর্বদা পরিপাটি করে সব কিছু বলতে পারে না। বহু তত্ত্ব বহু মত হামাগুড়ি দেয়। তখন যিনি রাজা, তাঁকে নিজস্ব অনুভবের কাছে করণীয় পন্থার খোঁজ করতে হবে। সেই মুহূর্তে রামের অন্তরকে অধিকার করে নেয় তাঁর স্ত্রী সীতা। সীতার বিষয়ে

রাম যে সকল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, সেইগুলিতে কী তাঁর অনুভব ও বিবেকের সম্মতি ছিল ? একজন রাজারও কী উচিত কিছু সংখ্যক সন্দেহপ্রবণ কিংবা নিন্দুক প্রজার মুখ বন্ধ করতে একজন নিরপরাধের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত নিষ্ঠুর হয়ে ওঠা ? একে কী রাজধর্ম বলে ?

অন্য দিকে রাম তো কেবল রাজা নন, তিনি স্বামীও। কার স্বামী ? সীতার স্বামী। সীতা কেমন রমণী ? সীতা পরমাসুন্দরী, কিন্তু অত্যন্ত অনুগতা। অতি সুন্দরী রমণীদের মধ্যে এই রকম আনুগত্য নিতান্ত অসচরাচর। সীতার ন্যায় রমণীকে আমরা স্নেহের ভগ্নী কিংবা কন্যার সঙ্গে তুলনা করি। সীতা হলেন আদর্শ ভারতীয় স্ত্রী। গৃহী পুরুষরা এইরূপেই নিজের নিজের স্ত্রীকে দেখতে পেলে খুশি হন। প্রচণ্ড দুর্দ্দশা কিংবা প্রলুব্ধ হবার মতন সম্পদও এই চরিত্রের রমণীকে কক্ষচ্যুত করতে পারে না। সিস্টার মেইড হুগস তাঁর 'Epic women East and West' গ্রন্থে এ ভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন '... We met gentler women like Sita and Andromache, Emer and Madhair. They are beautiful yet faithful, gentle yet strong, patient and enduring. They stand out from the epic canvas in warm, glowing colours ; they are the sort of women we would like our younger sisters and daughters to be. Sita is the model Indian wife, faithful to her husband in the most difficult and trying circumstances, sharing the hardships of exile voluntarily, enduring the ignomity of captive by Ravana.'

কিন্তু রাজা রাম, স্বামী রামের কাছ থেকে সীতা যে ব্যবহার পান, এই যুগের ঘটনা হলে তা আদালত অবধি গড়াত কিংবা মিডিয়ার কল্যাণে রাজরাজেন্দ্র রামের সার্বিক ভাবমূর্তিই কলুষিত হত নির্ঘাৎ। ছত্তিশগড়ের ভিলাই শহরে জনৈক মিতবাক উচ্চশিক্ষিত ভারতীয় ইস্পাত কর্তৃপক্ষের প্রাক্তন পদস্থ আধিকারিকের সঙ্গে স্থানীয় রামমন্দিরে এই নিয়ে দু'চার কথা হতেই তিনি তাঁর ডান হাতখানা উপরের দিকে তুলে সবিনয়ে বললেন, 'ভক্তি ও সমর্পনে যে শান্তি পাওয়া যায়, যুক্তিতে তা মেলে না। আমি শান্তিই চাই।' এটাই হল আম-জনতার মানসিকতা। চুলচেরা বিশ্লেষণে অনীস্পাটাই স্বাভাবিক। অন্যথায় সীতার তুলনায় রাম ছিলেন অস্থিরমনস্ক। তাঁর নিষ্ঠুরতাও সুবিদিত। নীচ বংশের হয়েও শম্বুক ব্রাহ্মণদের ন্যায় স্বয়ং পূজাআচ্ছা করছেন, এ রকম এক সংবাদে প্ররোচিত হয়ে রাজা রাম নিজ

হস্তে সম্বুকের মুণ্ডচ্ছেদন করেন। আবার দোসর সুগ্রীবের স্বার্থ রক্ষার জন্য নিজ অনুগতদের সমতিব্যাহারে রাম যে ভাবে বলিকে চোরাগোপ্তা আক্রমণে খুন করেন, তা দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে মুখ্য মানবিক গুণগুলিকেই তিনি আত্মস্যাৎ করতে পারেন নি।

অন্যদিকে সীতা নির্দ্বিধায় স্বামীর সঙ্গে বনবাসে চলে যান। রামের গরিবখানাতেই তাঁর পর্যাপ্ত সুরভিত সুখ। রামের সঙ্গে তাঁর যতেক বাক্যালাপ, সবই অসামান্য শ্রুতিমাধুর্যে প্রতিভাত। রামকে বাদ দিয়ে সীতা তাঁর কোনও বাহ্য পরিচয়কে আমল দিতেন না। কিন্তু তাঁরও একটা বাহ্য পরিচয় ছিল। সেটা হল এই যে, সীতা নিজের রূপ ও যৌবন সম্পর্কে নীরবে সচেতন ছিলেন। তিনি বিলক্ষণ জানতেন, তাঁর রূপের ছটায় যে কোনও শক্তিমান পুরুষ দুর্বল ও আড়ষ্ট হয়ে পড়তে পারেন। এই বিশ্বাস তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীকে কেবল রহস্যাবরণ দেয়নি, সংকীর্ণতাও দিয়েছে। এর সবচেয়ে বড় অভিপ্রকাশ ঘটে রাবণকর্তৃক আপহৃত হবার কিছুক্ষণ আগে। স্বর্ণমৃগের ছদ্মবেশে মারিচ সীতাকে প্রলুব্ধ করেন। সীতার অন্তরে নিদ্রিত ছিল নারীর যে চিরন্তন বাসনা, সেটাই প্রবল হয়ে ওঠে। সীতার স্বর্ণবাসনা মেটাতে রাম ছুটলেন স্বর্ণ মৃগের পিছনে। রামের বানে বিদ্ধ হয়ে মারিচ রামের কণ্ঠস্বরে আর্তনাদ করে ডাকতে থাকেন লক্ষণকে। সেই ডাক শোনার পরও লক্ষণের কোনও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নেই দেখে অস্থির সীতার মনে যে বিষক্রিয়া ঘটে, তা কিন্তু সুশীলা সীতার বিমূর্ত প্রতিচ্ছবির সঙ্গে একেবারে মানানসই নয়। সীতার তখন বদ্ধমূল ধারণা, লক্ষণ নিভৃতে তাঁর পূজনীয় জ্যেষ্ঠভ্রাতার স্ত্রীকে কামনা করে থাকে। এ ধরনের সন্দেহ একজন সাধারণ নারীর পক্ষে যথেষ্ট যুতসই ; বিশেষত এই ভারিক্কি চরিত্রের দেবরটি বয়সে তরুণ হয়েও দীর্ঘকাল নারীসঙ্গ থেকে বঞ্চিত। সে ক্ষুধার্ত। ক্ষুধার্তরা সুযোগ সন্ধানী হতে পারে। সীতা সেই সময় লক্ষণকে যে সমস্ত গালমন্দ করেছিলেন, তার জন্য তাঁকে জীবনভর অনুতপ্ত থাকা উচিত ছিল। বাস্তবে আমরা সীতার কাছ থেকে সেই অনুভূতির অভিপ্রকাশ দেখতে পেলাম না।

কিন্তু একথা অনস্বীকার্য, দ্রৌপদী ও হেলেনের তুলনায় সীতা প্রকৃতই ভাগ্যহীনা। তাঁর জন্ম মাতৃগর্ভ থেকে নয়। তাঁর জন্মকে নিয়ে ঐশী ব্যাখার যতই বহিঃপ্রকাশ ঘটুক না কেন, সীতা যে নিঃসঙ্কোচে নিজেকে উচ্চজাতিকা রূপে দাবি করবার জায়গায় ছিলেন না, সেটা অনুমান করা যায়। তিনি যে রামের ঘরণী হবেন, সেটা ছিল নির্ধারিত নিয়তি। সীতার বিবাহের সঙ্গে

দ্রৌপদীর বিবাহের সাদৃশ্য প্রচুর, তবে বিবাহোত্তর জীবনে তাঁদের বৈশাদৃশ্য পর্বতপ্রমান। স্বয়ম্বরসভায় প্রবেশ করে রাম ও রাবণ উভয়ই সীতার রূপের ছটায় উদ্দীপ্ত হন। তাঁদের দুই চোখ আপনা-আপনিই আটকে যায় হরধনুর ওপর। রাজা জনক যদি ওইরকম একটি দুরূহ শর্ত না রাখতেন, বলদর্পী রাবণ অনেক বেশি আস্থাবান থাকতে পারতেন নিজের সাফল্য সম্পর্কে। কারণ, শিবের ধনুকের ছিলা পরানো যে তাঁর পক্ষে সহজ না হবারই সম্ভাবনা, লঙ্কেশ্বর এই বিষয়ে সন্দেহযুক্ত ছিলেন। অন্যদিকে রাম জানতেন, তাবৎ দেবদেবীর শুভেচ্ছায় তিনি আলবত এই কর্ম সাফল্যের সঙ্গে সম্পাদন করবেন।

সীতা তো পূর্বাপর রামের নিকট সমর্পিতা। রাম যদি হরধনু তুলতেও অসমর্থ হতেন, তথাপি সীতার পক্ষে সম্ভব ছিল না ভিন্ন কোনও পুরুষের গলায় বরমাল্য ঝুলিয়ে দেওয়া। সেই সম্ভাব্য ক্ষেত্রে আত্মহননের পন্থাই হতে পারত সীতার মুক্তিবলয়। সীতার সেই মাহাত্ম্য কিন্তু দৌপদীর ওপর বর্তায় না। দ্রৌপদী চেয়েছিলেন, তাঁর ভাবী স্বামী যেন অজস্রবার এমত বীরত্ব ও কৃতিত্ব দেখাতে সমর্থ পুরুষ হন। সেই পুরুষ যে ইন্দ্রের গুনবাহী অর্জুন হলেন, তা অমোঘ নিয়তি মাত্র। দ্রৌপদীর মানসিকতা অতটা নমনীয় ছিল বলেই তিনি এক মুহূর্তে রাজি হয়ে গেলেন পাঁচজন পুরুষের স্ত্রী হতে। সীতার মনের যে রসায়ন, সেখানে কিন্তু এই রকম কোনও সিদ্ধান্তকে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না।

দুর্ভাগ্য এই যে, পঞ্চ স্বামীর সোহাগে সিক্ত দ্রৌপদী তাঁর স্বামীদের কাছ থেকে যে ধরনের প্রশ্রয় ও নির্ভরতা উপভোগ করতেন, সীতা রামের কাছ থেকে তা পাননি। সীতার প্রতি রামের যে প্রেম ও স্নেহ, তাতে নাটকীয়তা আছে, কিন্তু বাস্তব ও ঘটনার কষ্টিপাথরে তা আসার রূপেই প্রতীয়মান হচ্ছে। রামের এন্তার স্তুতি তাঁকে দেবত্বের আসনে স্থাপিত করবার প্রয়াস। কিন্তু সারসত্য উন্মোচনে Dr. C. Bulcke তাঁর গবেষণামূলক গ্রন্থ Religious Hinduism-এ যা লিখেছেন, ফুৎকারে উড়িয়ে দেবার নয় ঃ

Sita's kidnapping filled Rama With sorrow, and at the false report of her death Ram appeared to be overwhelmed with grief, and fell to the earth as a tree falls when its roots are severed :

But when she was brought back he said that he suspected her fidelity and would not take her back... this sudden reversal

of Rama's feelings... is sufficient proof that the whole incident is clumsy interpolation.

রামের সন্দেহবাতিকতার বিষয় বেশ সচেতন ছিলেন সীতা। সবসময় যথাসম্ভব চেষ্টা করতেন অন্য পুরুষের সঙ্গে বাক্যালাপ পর্যন্ত না করতে। এই ভীতি ও অস্বস্তি তাঁর বুকে গন্ধমাদনের মতন চেপে বসে থাকত। তাই পুত্রবৎ হনুমান যখন চাইলেন মাতৃবৎ সীতাকে পিঠের ওপর বসিয়ে রাবণের রাজ্য ত্যাগ করে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে পিতৃবৎ শ্রীরামের সমীপে পৌঁছে যেতে, সীতা মনে মনে শিউরে ওঠেন। হনুমান যে পুরুষ। তাঁর পিঠে উঠে চলে আসাটা রাম নিশ্চয় মেনে নিতে চাইবেন না। সীতার আরও খানিক বিড়ম্বনা বাড়বে। রামের কাছে পৌঁছে গিয়ে যে হাফ ছেড়ে বাঁচবেন, এমন সুভাগ্য সীতার নয়।

দুর্ভাগ্য, স্বামীর ভয়ে ভীতা এহেন সীতাকেই অপহরণ করলেন লঙ্কেশ্বর রাবণ। দুনিয়া শুদ্ধ লোককে তা আবার ঢাকঢোল পিটিয়ে জানিয়েও দিলেন। সেই মুহূর্তে রাম পত্নীকে হারাবার জন্য প্রচুর অশ্রুবিসর্জন করলেও অতঃপর সতীত্ব কতটুকু অক্ষত থাকতে পারে, সেই বিষয়ে গাঁইগুঁই কম করেন নি। রাবণ বিরাট বিত্তশালী রাজা। সীতা রাজি থাকলে, বিস্তর সম্পদ তিনি সেই অপহৃতাকে উপহার দিতেন। যত্নআত্তির কোনও অভাব হবার কথাও নয়। সুদৃশ্য প্রাসাদে বিলাসিতার গহনে অবগাহন করতে পারতেন সীতা। কিন্তু সীতা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন রাবণের প্রতিটি লোভনীয় প্রস্তাবকে। এর কারণ রামের প্রতি তাঁর প্রশ্নাতীত ভালোবাসা। তিনি স্ত্রী হিসেবে, জননী হিসেবে আদর্শ। কিন্তু রাণীরূপে মাননীয়া হবার সৌভাগ্য তাঁর হয়নি—যার জন্য দায়ী অবশ্যই তাঁর স্বামী রাম।

সীতা অপহৃতা হবার পর রাম বেদনার্ত হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু রাবণ কর্তৃক সীতা ধর্ষিতা হননি—এ প্রত্যয় তাঁর ছিল না।

প্রশ্ন ওঠে, রাম লঙ্কা আক্রমণ করলেন কেন?

সাধারণ ও সরল উত্তর আসে—সীতাকে উদ্ধারের জন্য।

কিন্তু পূর্বাপর ঘটনাকে যুক্তি ও বাস্তবের পাথরে শান দেবার পর উত্তর আসে ভিন্ন দিশা নিয়ে।

রামের লঙ্কা আক্রমণের বিষয়ে যে কয়েকটি কারণ দেখা যাচ্ছে, সেখানে সীতা উদ্ধারের শপথটিই মুখ্য নয়।

প্রথমত, সীতা অপহৃত হওয়ায় রাম অপমানিত হয়েছিলেন। এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে তিনি বদ্ধপরিকর হন।

দ্বিতীয়ত, রাম আর্য। রাবণ অনার্য। অনার্যের আস্ফালনকে স্তব্ধ করে দেবার প্রয়োজনীয়তা ছিল।

তৃতীয়ত, সীতাকে উদ্ধার করে রাম প্রমাণ করতে চেয়েছেন, তিনি মহাবীর ও রাজমুকুট তাঁরই শিরে শোভনীয়। পৌরুষের সঙ্গে অহমিকার মিশেল। কিন্তু সেখানে নিষ্ঠুরতার সঙ্গে বলি দেওয়া হল প্রেমকে। বিশ্বাসকেও। বনবাসের বেশিরভাগ সময় সীতা ও রামের প্রেমপূর্ণ মিলন ছিল স্বাভাবিক। তখনও সীতা গর্ভবতী হনি নি। কিন্তু রাবণের খপ্পর থেকে মুক্ত হবার কিছু দিনের মধ্যেই জানা গেল, সীতা গর্ভবতী। কেবল কী কিছু সংখ্যক প্রজার সন্দেহকে গুরুত্ব দিয়েই রাম সীতাকে আবার বনবাসে পাঠান ও পরে সতীত্বের পরীক্ষা দিতে সীতাকে আগুনে ঝাপ দিতে বলেন ? নাকি, এই সন্দেহ তাঁর মনে এক বিষাক্ত রসায়নের সৃষ্টি করেছিল ?

সীতা তাঁর প্রতিবাদ, তেজ, ঘৃণা প্রকাশ করলেন একেবারে শেষ মুহূর্তে। সীতা যদি সেইক্ষণে তাঁর জননী পৃথিবীর অভ্যন্তরে নিজেকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে না যেতেন, প্রাচীন কবি এই মহিয়সীর প্রতি প্রচণ্ড অবিচার করতেন বলেই আমি মনে করি। শ্রেষ্ঠ কবিরা নারীর এই বিদ্রোহী চেতনকে মান্যতা দিয়েছেন অকুণ্ঠে। তাই দান্তের কলমে চিত্রিত হন বিয়াত্রিস এবং পেট্রাক পল্লবিত করে গেলেন লরা চরিত্রটিকে।

কিন্তু সীতার মাহাত্ম্যকে ব্যাপ্ত করে দেখাতে রামকে ক্রমাগত আঘাত করে যাবার বিপক্ষে প্রত্যাঘাতের আয়ুধও কিন্তু মজুদ। অনেক ধীমান বিলক্ষণ বলতে পারেন, সীতার প্রতি রামের আচরণের বিরুদ্ধে এতসব চোখা চোখা ওজর-আপত্তি তোলার আগে আপনি বৈদিক যুগ থেকে শুরু করে মহাকাব্যিক যুগ অবধি ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার চরিত্র নিয়ে বিশ্লেষণ করুন। তখন বুঝবেন, সীতার প্রতি ওইরকম অমানবিক আচরণ না করে রামের গত্যন্তর ছিল না। বৈদিক যুগেই দেখা যায় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। ঋগ্বেদে 'সভা' ও 'সমিতি'র উল্লেখ দেখতে পাই—যার সঙ্গে আধুনিক গণতন্ত্রের Parliamentary System-এর সাদৃশ্য দেখতে পাই। সভা ও সমিতিতে নাগরিকগণ মিলিত হয়ে রাজাকে তাঁর করণীয় বিষয় সম্পর্কে পরামর্শ দিতেন এবং রাজাও তদনুযায়ী নিজের ইতিকর্তব্য নির্ধারণ করতেন ঃ

ন সা সভা যত্র না ভাতি কশ্চিত্।
ন সা সভা যত্র বিভাতি চৈবঃ ॥

সভাতু স্বৈবাস্তি যথার্থরূপা পরস্পরঃ
যত্র বিভাস্তি সর্বে॥

এর অর্থ, সেই সভা সভাই নয় যেখানে উপস্থিত সকলে স্বগুরুত্বে বিশিষ্ট নন। যথার্থ সভায় সকলেই নির্ভীক ও স্বাধীন এবং তাঁরা নিজের নিজের অভিমত দ্বারা পরস্পরকে সমৃদ্ধ করেন।

ভক্তরা বলবেন, রাম ওইরূপ জনজমায়েতের নির্ভীক ও স্বাধীন অভিমতকে মান্যতা দিতে গিয়ে সীতার প্রতি বারম্বার নিষ্ঠুর আচরণ করতে বাধ্য হন।

কিন্তু রামায়ণকে আদ্যোপান্ত পাঠ করে আমি এ রকম কোনও দৃষ্টান্ত পাইনি, যেখানে রাম সভা বা সমিতিতে গৃহীত সিদ্ধান্তকে নিয়ে ভাবতে বসেছেন। পরিবর্তে তিনি এমন এক ভাব দেখিয়েছেন, যেন পঞ্চজনের অভিমতকে মর্যাদা দিতে গিয়েই পত্নীলাঞ্ছনায় সিদ্ধকর্ম হলেন।

কোথায় সেই পঞ্চজন?

কাদের বলে পঞ্চজন?

ঋগ্বেদের প্রতিটি মণ্ডলেই আমরা পঞ্চজনের উপস্থিতি দেখতে পাই। ঐতেরেয় ব্রাহ্মণে বলা আছে—দেব, মানুষ, গন্ধর্ব, সর্প ও পিতৃগণ এঁরা মিলে তৈরি করেছেন পঞ্চজন। পঞ্চজন থেকে এসেছে পঞ্চায়েৎ। কোনও পঞ্চায়েতে কী সীতার সতীত্ব নিয়ে অমানবিক সদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল? আমরা অবগত নই। দেশে বা সমাজে, এমনকী পরিবারেও কিছু এমন মানুষ থাকতে পারে—যারা ছিদ্রের অন্বেষণে আনন্দ পায় অথবা পরনিন্দায় বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়ে থাকে। এ হেন ব্যক্তিদের মতামতকে খণ্ডন করবার চেষ্টা না করে যে ক্ষমতাবান ব্যক্তি তাতেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে সায় দেন, তাঁর ন্যায়বোধ কিন্তু হাস্যোদ্দীপক হয়ে ওঠে।

আরও নিবিড় সমীক্ষায় আসা যাক। রাম যখন সীতাকে বিবাহ করে অযোধ্যায় ফিরে এলেন, তখন তিনি পত্নীপ্রেমে টইটম্বুর। তাঁরই ঐকান্তিক আবাহনে সীতা অযোধ্যার রাজগৃহে জীবনের সবচেয়ে আনন্দঘন সময়টুকু অতিবাহিত করেছিলেন। তারপর রামের সঙ্গে তিনি যখন বনবাসে যান, কৃচ্ছতা তাঁকে পীড়িত করে নি। কারণ রামের সঙ্গে সহবাসহেতু অরণ্যের পর্ণকুটিরও যেন বৈভবময় মঞ্জিল। স্বামীর প্রতি সসম্ভ্রবম প্রেম-সোহাগই তাঁকে সহনশক্তি ও সাহস জোগাত। রাবণের কবল থেকে সেই সীতাকে রাম যখন উদ্ধার করে নিয়ে এলেন, তাবৎ প্রজারা তাঁকে বাহবা জানাল—তাদের প্রণম্য

ও প্রিয় রাম খুব বড় বাজিমাত করেছেন। উক্ত স্তুতিপ্লাবনে রাম আপ্লুত। তিনি তখন খুব বর্হিমুখী। তিনি এমন কিছু কখনও করবেন না, যাতে তাঁর জনপ্রিয়তায় চোট লাগতে পারে। তাঁর ওইরকম দৃষ্টিভঙ্গীর বলি হয়েছিলেন সীতা। অপহৃত হবার আগের দিনগুলিতে সীতা যে রামকে চিনতেন, রাবণের খপ্পর থেকে বেরিয়ে এসে তিনি যেন এক ভিন্ন রামের মুখোমুখি হলেন। এই রাম তো তাঁর সেই পরিচিত রাম নন। ইনি কী তাঁকে সন্দেহ করছেন ? সীতার দৈহিক শুচিতা নিয়ে তিনি বোধহয় সন্দিহান। তাই কিছুজনের কুমন্তব্য ও রটনায় তিনি অতখানি প্রভাবিত ও বিচলিত। রাম তাঁর প্রজাদের প্রচুর ব্যক্তিস্বাধীনতা দিয়েছিলেন। কিন্তু অপরিমিত ভোজ্যের ন্যায় অবাধ স্বাধীনতাও যে ক্ষতিকারক হয়ে উঠতে পারে, ন্যায়-অন্যায় নির্ণয়ের শক্তি যে তখন অস্তামিত অবস্থায় আসবার জন্য প্রবল হয়ে ওঠে স্বেচ্ছাচারিতা, অতবড় রাজা হয়েও রাম কী তা বিস্মৃত হয়েছিলেন ? মেনে নেওয়া কষ্টকর। G. H. Mess-এর বিশ্লেষণ মনে আসে—

> The modern is blinded by the glamour of noble ideas in democracy and its social usefulness in the near past and nobody dares to proclaim.

নিজেকে জনপ্রিয় করবার বা নিজের জনপ্রিয়তাকে অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য ব্যক্তিবেশিষ যে নিজের নাক কেটে অপরের যাত্রাভঙ্গে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন না, আধুনিক গণতন্ত্রে তার বহু টাটকা নিদর্শন রয়েছে। রাজা রাম যে সেই বাসনা চরিতার্থ করতে গিয়েই সীতার ওপর খড়্গহস্ত হয়ে উঠেছিলেন— এ রকম একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে খুব একটা তুখোড় ও খরবুদ্ধির দরকার হয় না।

আদত রহস্য খুঁজতে বিশ্লেষক মনোবিদ্যার সাহায্যই নিতে চাইবেন। সীতাকে উদ্ধার করতে পেরে রাম কী সংশয়াতীত আনন্দোচ্ছ্বাসে নাগাড়ে ভেসে যাচ্ছিলেন ?

মোটেই নয়।

তাঁর বুকের মধ্যে এক ভগ্নদূতের অবস্থান বিলক্ষণ টের পাওয়া যায়। অপহৃতা হবার আগে সীতা রামের যে প্রসন্ন মুখ দেখতেন, লঙ্কা থেকে ফিরে আসবার পর তা আর বারেকের জন্যও দেখেছেন বলে মনে হয় না। সীতার নিকট রাম নিজেকে লুকিয়ে রেখেছেন, বলা চলে। সীতাকে যে আবার নির্বাসনে যেতে হবে এবং সেটা একাকীই,—এই নির্মম সিদ্ধান্তের কথা রাম

একবারের জন্যও জানতে দেননি। অথচ লক্ষণকে বলেছেন। সম্ভবত বলেছেন আরও অনেককে। তাঁদের নিশ্চিত হুঁশিয়ারও করে দিয়েছেন—এই সিদ্ধান্তের কথা সীতা যেন ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারে। রামের এ এক অদ্ভুত পলায়নী মনোবৃত্তি! অনিবার্য অপরাধবোধ!

সীতাকে সেই নিষ্ঠুর বিধান কে জানালেন?

দেবর লক্ষণ।

কোথায় জানালেন?

গভীর নির্জন অরণ্যভূমিতে পৌঁছবার পর।

তখন সীতার কী অবস্থা?

তিনি তখন সন্তানসম্ভবা।

আমরা জানি, শাসকের কোনও কোনও সিদ্ধান্ত উদ্দেশ্য ও আদর্শ থেকে বিচ্যুত হতে পারে। কারণ, শাসক যদি একজন সাধারণ মানুষ হন, তাঁর পক্ষে আত্মকেন্দ্রিক, অসহিষ্ণু ও সহানুভূতিহীন হওয়াটা স্বভাবিক। কিন্তু রাম তো সাধারণ প্রশাসক নন। তিনি কোন বিধি মেনে সীতাকে শাস্তি দিলেন? বিধি তো দ্বিবিধ। এক, দেশকে চালাবার জন্য সংবিধান। সংবিধান সচরাচর লিখিত আকারে থাকে। শাসক সংবিধানের গন্ডীর মধ্যে থাকেন বলেই স্বেচ্ছাচারি অথবা দামাল হয়ে উঠতে পারেন না। দ্বিতীয় বিধি হল, সামাজিক বিধি। সামাজিক বিধি অলিখিত। এই বিধি ভাঙ্গলে রাষ্ট্র ভঙ্গকারীকে শাস্তি দেয় না। কিন্তু সমাজ অপ্রত্যক্ষ শাস্তির দিকে ঝুঁকতেই পারে। সেই শাস্তি সাধারণত হয়ে থাকে প্রায়শ্চিত্ত। 'দমনার্থং দণ্ডঃ প্রায়শ্চিত্ত পাপক্ষয়ার্থ।'

রামের কোনও সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা ছিল না সীতাকে শাস্তি দেবার। লিখিত সংবিধান ছিল সে সময় এক অলীক ব্যাপার। তাই ধরে নিচ্ছি, রাম পরিচালিত হয়েছিলেন সামাজিক বিধি দ্বারা। অর্থাৎ তিনি মনে করেছিলেন সীতার মধ্যে রয়েছে অসৎ প্রবৃত্তি কিংবা তিনি কারুর অসৎ প্রবৃত্তির হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে অসমর্থ হয়েছেন। প্রশ্ন হল, তাঁর মনে যদি সীতা সম্পর্কে অতশত সংশয় জটিলতার সৃষ্টি হয়ে থাকে কেন তিনি অসাধারণ সমস্ত কান্ডকারখানা ঘটিয়ে রাবণকে মেরে সীতাকে উদ্ধার করে নিয়ে এলেন? কেবলমাত্র নিজের শৌর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে? সীতার প্রতি রামের প্রেম কী তবে প্রশ্নাতীত নয়? অথবা তিনি তাঁর প্রেম ও অনুরাগকে দমিয়েই রেখেছিলেন?

অন্যদিকে সীতার অন্তরে যে সারল্য ও আন্তরিক প্রেম ছিল, ক্রমশ তা আচ্ছন্ন হয়ে যায় ভীতি ও অসহায়তাবোধের প্রভাবে। অশোক কাননে যে

সীতা ছিলেন স্বামীর স্মৃতিতে প্রভাবিত ও নস্টালজিক, তিনিই রাবণের হাত থেকে মুক্তি পাবার পর এক কঠিন বিচ্ছিন্নতাবোধের দ্বারা আক্রান্ত হলেন। তাঁর কাছ থেকে প্রেমময় প্রগলভতা আর পাওয়া গেল না।

সীতার মাতৃরূপও অতুলনীয়। একজন স্বামী পরিত্যক্তা নারী অপরের আশ্রয়ে থেকে যে কষ্টে তাঁর সন্তানদের লালন-পালন করতে পারেন, যে রকম শাসনে ও প্রশ্রয়ে সন্তানদের সতেজ ও সবুজ এবং শিক্ষিত করে তুলতে পারেন, সীতা তাঁর দৃষ্টান্ত। অথচ তখনও তাঁর বিবৃতিতে কিংবা স্বগতোক্তিতে বার বার প্রকাশিত হয়েছে রামচন্দ্রের প্রতি তাঁর প্রেম ও আনুগত্য—অপ্রত্যাশিত আঘাতে রক্তাক্ত হয়েও তিনি নিজেকে সংশোধনের চেষ্টা করেন নি। এই যুগের পটভূমি হলে কবেই সেই আগল ভাঙত ও নতুন এক গাথার জন্ম হত।

মহাকাব্যিক নারীরা কেউই একরকম ছাঁচে গড়া নন। তাঁদের স্ত্রীরূপ, মাতৃরূপ, প্রেমিকারূপ ভিন্ন ভিন্ন। কোনও প্যাটর্ন বা ফর্মূলা প্রযুক্ত হয়নি তাঁদের চরিত্র-চিত্রণে।

মহাকাব্যিক রচয়িতাগণের চিত্তশুদ্ধির প্রথম ও প্রধান শর্ত ঘটনানিচয় ও সংঘাতের বৃহৎ প্রেক্ষিত থাকা সত্ত্বেও প্রতিটি চরিত্র যেন উজ্জ্বল হয়ে থাকে আপন আপন স্বকীয়তায়। বিশেষত নারীচরিত্রের রূপায়নে সম্পৃক্ত থাকবে রহস্যায়তার সঙ্গে পৃথক পৃথক গুণমান। নারীরা কাহিনির অঙ্গশোভা নন, তাঁরাই চালিকাশক্তি। নিরীক্ষকরা দেখছেন, নারীদের দ্বারাই বৃহৎ জাগরণের উৎপত্তি। সেই জাগরণ ধ্বংসাত্মক হতে পারে, আবার গভীর যত্নশীলতায় হয়ে উঠতে পারে পল্লবীত সৃষ্টিময়। যেমন অগত্য স্নেহ। মহাকাব্যিক নায়িকাদের মাতৃস্নেহের চরিত্র সমান নয়। ওই স্নেহের পরিণতিও একটির সঙ্গে আর একটির কণামাত্র সাদৃশ্য বহন করতে নারাজ। গান্ধারীর পুত্রস্নেহে আত্মস্থ হয়ে ছিল ধ্বংসের বীজ। স্বামী ধৃতরাষ্ট্র ও তিনি উভয়ই সন্তানদের ঔদ্ধত্য ও অত্যাচারকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। আবার কুন্তীর মাতৃস্নেহ গান্ধীরর থেকে আলাদা। কুন্তীর জীবন ও জীবনবোধও যে পৃথক। তাঁর প্রেমের ইতিবৃত্ত বর্ণময় ও যেন ঐন্দ্রজালিক। ফলে স্নেহে সিক্ত থেকেও পুত্রদের ব্যবহারিক জীবন সম্পর্কে তিনি ছিলেন আশ্চর্য উদার। গ্রীক মহাকাব্যের দুই নায়িকা অ্যাগ্রোম্যাচ ও পেনেলোপের অপত্য স্নেহ সেই অনুপাতে কিছুটা নিস্পৃহ। আর সীতা ও শকুন্তলার সন্তানপ্রীতি ছিল যেমন প্রগাঢ়, তেমনি সতর্ক—যা সদাই অন্বেষণ করেছে সন্তানের নিরাপত্তাজনিত নিশ্চয়তাকে। জননী সীতার কর্তব্যবোধে এতটুকু খামতি খুঁজে পাই না। যখন স্বামীর কাছে ছিলেন,

প্রেমের মোহনবাঁশি সমানে বেজেছে। বিপদ, বিপর্যয় এসেছে সমুদ্রের তরঙ্গের মতন। বুকের মধ্যে গুঞ্জরিত হয়েছে অনেক অভিমান। যতদিন পেরেছেন, সহ্য করেছেন। বিস্ফোরণ ঘটেছে একেবারে অন্তিমে। তখন আর রামের কিছু করবার নেই।

এই অবধি লেখার পর মনে হচ্ছে, শ্রীরামচন্দ্রকে সীতার প্রতি প্রেমহীনরূপে চিত্রিত করাটা অনুচিত। কিছুটা স্ববিরোধিতা সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে অপহৃতা সীতার খোঁজে তোলপাড় করেছিলেন ব্যাকুল বিহ্বল রাম। সত্যিকারের হৃদয়ের টান না থাকলে তা অসম্ভব। খুঁজতে খুঁজতে শেষাবধি বানরকুলের প্রধান সুগ্রীবের সমীপে উপস্থিত হয়ে কাতর কণ্ঠে বলেন, 'আপনি বানরকুলের প্রধান। আমি শ্রীরাম আপনার নিকট সাহায্যপ্রার্থী। আমি জানি, বিশ্বের সর্বস্থানের অবস্থিতি আপনার নখদর্পনে। তাই আপনিই চেষ্টার মধ্য দিয়ে আমাকে জ্ঞাত করাতে পারেন আমার অপহৃতা স্ত্রী সীতা এক্ষণে কোথায় কী অবস্থায় রয়েছেন?'

রাম সুগ্রীবের ওপর অতখানি আস্থা রাখবার হেতু রয়েছে। তিনি শুনেছিলেন, কী ভাবে তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা বালির তুলনায় অপারঙ্গমতা সত্ত্বেও সুগ্রীব বিশ্বপর্যটন করেন। সেই পর্যটন প্রাণের ভয়ে ও পুনর্বার বালির হাতে হেনস্থা হবার আতঙ্কে। যদিও আলোচনার আলোকবর্তিকা সীতা, তথাপি এখানে লক্ষ্যে একেবারে অনড় না থেকে সুগ্রীব ও বালির প্রসঙ্গে আমরা খানিক ঘুরে আসতে পারি। দানবদের মধ্যে বিশেষ প্রতিভাবান হলেন ময়দানব। নির্মানশিল্পে তিনি অনেক অনন্য প্রয়াসকে বাস্তবায়িত করেন। কিন্তু তাঁর দুইটি পুত্রই সৃষ্টিশীল পিতাকে আশাহত করবার পক্ষে যথেষ্ট। পুত্র দুইটির নাম মায়াবী ও দুন্দুভি। দুজনই অহঙ্কারে মত্ত। অকারণ অত্যাচারে উল্লসীত। কী যে তাঁদের লক্ষ্য, কী যে তাঁদের জীবনের ব্রত, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কেই বা তার ব্যাখ্যা করবে? তবে অপরের সম্পত্তি গ্রাসে, অন্যের স্ত্রীকে অপহরণ করে তাঁকে বিরহিনী করে তুলতে দুই ভাইয়ের জুড়ি হয় না। অবৈধ প্রতিনায়িকারাও অনেকে এসেছেন দুই ভাইয়ের জীবনে।

অন্যদিকে বানর কুলপতি বালির প্রতিপত্তিও ক্রমবর্ধমান। তিনি সৎ ও সত্যসন্ধ হলেও নিজের অধিকারের পরিধিকে বৃদ্ধি করতে বদ্ধপরিকর। সুতরাং সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

বিরোধ মুখ্যত বালি ও মাহষাকৃতি দানব দুন্দুভির মধ্যে। প্রায় সকল ধরাধামবাসীই জানে, যদি কেউ দুন্দুভিকে নিকেশ করতে পারে, সে হল বালি।

আর বালির হাতে দুন্দুভির যদি মৃত্যু ঘটে, তাতে জগতের উপকার বই অপকার হবে না। প্রথমে দুন্দুভি খুব লড়াই করলেন। তারপর বুঝলেন, বালির সঙ্গে শক্তিতে পেরে ওঠা যাবে না। তখন নিস্কৃতি লাভের আশায় পালালেন। উপস্থিথ হলেন মলয়পর্বতে। সেখানকার এক গুহায় আত্মগোপন করলেন। বালি কিন্তু তাঁর গতিবিধি সম্পর্কে বিলক্ষণ ওয়াকিবহাল। তাই তিনিও যেন অমোঘ নিয়তির টানে এসে উপস্থিত হলেন মলয়পর্বতে এবং অনুপ্রবেশ করলেন ঠিক সেই গুহাতেই—যেখানে আত্মগোপন করে আছেন দুন্দুভি।

বালিকে অনেকে পই পই করে নিষেধ করেছিলেন, ওই গুহায় ঢুকে দুন্দুভির মোকাবেলা করতে যাবেন না। কারণ, ওই গুহায় এমন কিছু অনতিক্রম্য প্রতিরোধ ব্যবস্থা দুন্দুভির রয়েছে যাদের সাহায্যে সেই দানব বালিকেই শেষ করে দিতে পারেন।

কিন্তু বালি ওই সমস্ত হুঁশিয়ারিকে গুরুত্ব দেবার পাত্র নন। তিনি তাঁর স্ত্রী তারার কাছ থেকে বিদায় নিলেন। তারার লাস্য জড়ানো মুখে তখন আশঙ্কার কালো মেঘ। চাপা ভ্রাতৃবিরোধের পুরানো কাসুন্দিকে না ঘেঁটে সুগ্রীবকে বালি সঙ্গে নিয়ে চললেন মলয় পাহাড়ের দিকে।

সুগ্রীব প্রসঙ্গটাকে টেনে এনে রামকে বললেন, ‘ দাদার মতন পুরুষদের কাছে শক্তি পরীক্ষা তীব্র মাদকতার সৃষ্টি করে থাকে। জিততে হবে। জিততে হবে। শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে এমন সাজা দেব যে তা এক যুগান্তকারী দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

দু'জন বলশালীর মুখোমুখি লড়াই। তৃতীয় পক্ষ কেউ নয়। এ রকম চাষাড়ে যুদ্ধ চাক্ষুষ করবার মধ্য দিয়ে মানুষের হিংস্র আনন্দ বহরে বাড়তে থাকে। মমত্ব, সহানুভূতি এই সমস্ত বোধগুলি অবিন্যস্ত হয়ে পড়ে। আমি জানতাম, সেই গুহাযুদ্ধে যে কেউ বাজিমাৎ করতে পারে। দাদাও জিততে পারেন ; দুন্দুভিও পারে। তাই লড়াইটা হবে দীর্ঘ। লড়তে লড়তে দু'জনই দারুণ নাজেহাল হয়ে পড়বেন। সারা শরীরের প্রদাহ সহ্য করেও ওই সময়ে যিনি নিজের ক্ষোভ ও হিংসায় অধিকতর ভাসমান অবস্থায় থাকতে পারবেন, তাঁরই জিত হবে। প্রতিপক্ষ বেশি ধুঁকছে, বেশি নিস্প্রভ হয়ে পড়েছে—সুতরাং, এই সময় সমস্ত শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করে হানো মোক্ষম আঘাত। অনেক সময়ের ব্যাপার। ধৈর্য ধরতে হবে।

গুহার বাইরে ধৈর্য ধরে বসে ছিলেন সুগ্রীব। তখন মৃদুমন্দ পবন বইছে। সরুচোখে সুগ্রীব দেখলেন, বিভিন্ন বৃক্ষে বিভিন্ন প্রকারের ও আকারের সুপক্ক

ফলাদি ঝুলছে। তিনি আর লোভ সামলাতে না পেরে তাদের কয়েকটিকে পেড়ে এনে ধারালো দাঁতে ফালা ফালা করে কেটে ভোজন করলেন। একেবারে অভূতপূর্ব এবং অশ্রুতপূর্ব সুস্বাদু। বনদেবতা যেন রাজভ্রাতা সুগ্রীবের জন্যই নৈবেদ্য সাজিয়ে রেখেছিলেন। ভরপেট সুগ্রীব কিছুক্ষণ তাঁর তর্জনী ও মধ্যমা তুলে কী এক মুদ্রা তুলে অদৃশ্য কাউকে যেন দেখাতে থাকেন। গুহার মধ্যে বালি ও দুন্দুভি কে কার ঘাড় মটকাতে পারলেন, তা নিয়ে সুগ্রীব আর শশব্যস্ত হওয়া দূরের কথা, ভাবিতই নন। তিনি নিদ্রার কবলিত হলেন ও ছিনে জোঁকের মতন একটি রহস্যময় স্বপ্ন তাঁকে অধিকার করে নিল। তিনি রণমত্ত মহাবলী জ্যেষ্ঠভ্রাতা বালির পত্নী তারাসুন্দরীকে দেখলেন। বাসনা বড় নাচার। ন্যায়-নীতি ভাঙ্গতে চায়। ঘুম ভাঙ্গল। বালি গুহা থেকে বেরিয়ে আসেন নি। সেই দিন গেল, তারপর দিন গেল, সপ্তাহ গেল, মাস গেল, বছর ঘুরে গেল। জীবনের পরিধি থেকে একটা অংশকে যেন ছেঁটে ফেলা হল। ফলহীন অপেক্ষা করতে করতে নাজেহাল সুগ্রীব। গুহার মধ্যে যে যুদ্ধ চলেছে, এত দিনেও কী তার দাঁড়িপাল্লা একদিকে হেলে পড়েনি? এভাবে ঠায় বসে থাকাটা যে কী বিসদৃশ ব্যাপার! ভেতরে ঢুকে দাদাকে যে সাহায্য করবেন, তারও উপায় গাস্তি। বালির বারণ—খবর্দার, ভেতরে ঢুকবি না। আমি একাই দুন্দুভিকে খুন করে এই পথেই ফিরে আসব। সেই অবধি তোকে এই চত্বরেই বসে থাকতে হবে আমার প্রতীক্ষায়। দাদাকে যমের মতন ভয় পান সুগ্রীব। তবুও একেবারে ঠায় বসে না থেকে তিনি ওই গুহার চারপাশটা ঘুরে ঘুরে দেখতেন। গুহার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে একটি জলাধার। প্রায় বছর খানেক কেটে যাবার পর ভ্রাম্যমান সুগ্রীব দেখতে পেলেন, সেই জলাশয়ের জল রক্তবর্ণ ধারণ করেছে। সুগ্রীব অনুমান করলেন, ওই গুহা থেকে নির্গত শোনিতধারায় জলাশয়ের রং বদলে গেছে। কার রক্ত? কে নিহত হলেন? দানব দুন্দুভি না তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা কপিকূলের আইকন বালি? সুগ্রীবের মনে হল, তাঁর দাদাই খুন হয়েছেন। বালির মৃত্যুর কথাই সুগ্রীবের মনে উদয় হল কেন—এরকম প্রশ্ন মাথায় আসতেই পারে। মনের গলি খুঁজিতে হরেক রকমের প্রত্যাশা ও বাসনা পুঞ্জীভূত হয়েছিল। রক্তের প্রবাহ দেখে সেইগুলিই যে বাসনাঘন্টি বাজাতে শুরু করে দেয়নি, তা কে হলপ করে বলতে পারে? বালি, সুগ্রীব, তারা, রাম, রাবণ, সীতা, হনুমান.... এঁরা সকলেই জাগতিক। কেবল জাগতিক নয়, অতীব মানবিক। লিখতে বসে অনুভব করছি, তাঁদের প্রত্যেকের মনে নানা প্রকারের রং খেলা করত—সাদা,

কালো, লাল, নীল, ম্যাজেন্টা ইত্যাদি। কাউকে একেবারে সাদা বলা যাবে না। কেউ আদ্যোপান্ত কালোও নয়।

বালির ছিল শ্লঘা। সুগ্রীবের ছিল ঈর্ষা, লোভ ও ভীতি। বালি খুন হয়ে গেলে সুগ্রীবের ব্যাপক প্রাপ্তিকে তখন নিবারণ করবেটা কে ? সিংহাসন তাঁর, ক্রমে হয়তো তারাও হবেন তাঁর। বালির মতন কঠোর ও বলদর্পী হবেন না সুগ্রীব। তিনি কূটনীতিটা ভালো বোঝেন। শৈশবের সীমানা পার হবার আগেই সুগ্রীবের মাথাটি ছিল বেশ পরিষ্কার। জটিল অঙ্ককেও সহজ ছকে নিয়ে আসতে পারতেন তিনি।

কিন্তু খুব বুদ্ধিমানেরও ভুল হয়।

সুগ্রীবেরও হল।

ওই শোনিত যে বালির না হয়ে দুন্দুভিরও হতে পারে, এটা তাঁর ভাবা উচিত ছিল। ভাববার মতন ফুরসতও তিনি নিজেকে দিতে চাননি। একদিকে সুখসম্ভাবনার টান, অন্যদিকে হলুদ ভয়। প্রত্যেক জীবেরই একটা নিজস্ব চরিত্র থাকে—যার সঙ্গে দুনিয়ার অন্য কোনও চরিত্রেরই মিল থাকে না। সেই চরিত্রেরই মার্জিমাফিক একটা প্রকাণ্ড পাথরকে অনেক মেহনত করে, কসরত করে গুহার প্রবেশদ্বারে এনে দাঁড় করালেন। সুগ্রীব তারপর তিনি যে সেটা আচ্ছাসে চুন-সুরকি দিয়ে গেঁথেও দিলেন অনুমান করা যায়। এ কপাট চূর্ণ করা মহাবলীর পক্ষেও প্রায় অসম্ভব। সুগ্রীব আশা করলেন, গুহার অভ্যন্তরে থাকা সদ্য বালিনিধনকারী দুন্দুভি নিশ্চয় এখনও খুব পরিশ্রান্ত, কাহিল ও আহত। এরপর যখন তিনি বেরিয়ে আসতে চাইবেন, বার বার ঠোক্কর খাবেন এই পাথুরে বদ্ধ কপাটে। এ যেন এক যন্তরমন্তর। কিছুতেই সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেও মুক্ত দুনিয়ার চৌহদ্দিতে বেরিয়ে আসতে অক্ষম। অনাহারে শীর্ণ হতে থাকবেন। সামনে বালির কঙ্কাল। ক্রমে দুন্দুভির দেহও কঙ্কালে রূপান্তরিত হবে। অন্তরের পুলক গোপন রেখে সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরে এলেন। একদিকে যেমন জ্যেষ্ঠভ্রাতা বালির জন্য তথাকথিত শোক প্রকাশ করলেন, অন্যদিকে ঘনিষ্ঠ ইয়ার-দোস্তদের সঙ্গে খানিকটা মশকরাও করলেন। সিংহাসনে তিনিই যে বসবেন, এ বিষয়ে কারুর মনে কোনও প্রশ্ন ওঠেনি। এক বৎসরের ওপর মলয় পাহাড়ের গুহামুখে অপেক্ষা করতে করতে সুগ্রীবের যত ক্লান্তি ও অবসন্নতা এসেছিল, সব মুছে গেল। আপন অধিকার ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জোরেই যেন কিষ্কিন্ধ্যার সিংহাসনে উপবেশন করলেন সুগ্রীব। অতঃপর যে রমণীরত্নের প্রতি তাঁর চাপা লোভ ছিল, বালিপত্নী সেই তারাকে লাভ করাটাও তার পক্ষে দুষ্কর হল না।

কিন্তু সুগ্রীবের সেই সুখসিক্ত জীবনঅধ্যায়টি দীর্ঘ হল না। কারণ কিছুদিনের মধ্যেই দুন্দুভির নিধনকারী শালপ্রাংশু বীরপঙ্গুব বালি ফিরে এলেন স্বভূমিতে।

এসে দেখলেন তাঁর সুন্দরী স্ত্রী সমেত রাজ্যপাট একেবারে লাটে উঠেছে। লোভী ও কামুক সুগ্রীব তাঁর মৃত্যুসংবাদ রটিয়ে দিয়ে কেবল তখতে উঠে বসেন নি, তাঁর রূপবতী স্ত্রী তারাকেও চুটিয়ে ভোগ করে চলেছেন। বালির উপলব্ধি হল, অনুজ সুগ্রীব অনেককাল ধরেই তারাকে মনে মনে কামনা করছিলেন ; সুযোগ বুঝে জ্যেষ্ঠকে গুহাবন্দী করে মুখ্যত ওই তারার লোভেই মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন সুগ্রীব। প্রেমের রুদ্ধদ্বার অরুদ্ধ হল। একরকম যেন বাধ্য হয়েই তারা সুগ্রীবের সেই ফাঁদে পা দিলেন। বালি আকাশ কাঁপিয়ে হাঁক দিলেন, 'সুগ্রীব, বিশ্বাসঘাতক, মিথ্যাচারী, লম্পট চূড়ামনি, আজ আমার হাতে তোর মৃত্যুকাল আসন্ন।' বালির সেই হুঙ্কার কানে ঢোকায় আতঙ্কে সুগ্রীবের দুই চক্ষুর অক্ষিগোলক স্ফীততর হয়। তিনি আর কালক্ষেপ না করে পালালেন। সম্ভাব্য অসম্ভাব্য সকল স্থানে তাঁর সেই পলায়ন অব্যাহত।

সুগ্রীব রামকে বলেছিলেন, 'আমি বুঝেছিলাম একবার বালির হাতে ধরা পড়লে স্বয়ং শিবও আমাকে বাঁচাতে পারবেন না। বালি ভয়ঙ্কর বীর। ভীষণ জেদিও। লঙ্কার রাজা রাবণকে লেজে বেঁধে সাতবার সমুদ্রের জলে খাবি খাইয়েছিল। এ হেন বালিকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে ভ্রাতৃহত্যার পথ থেকে তাকে সরিয়ে আনবে—এ রকম প্রতিশ্রুতি কেউ একগলা জলে দাঁড়িয়ে দিলেও আমি তাতে আস্থা রাখতে পারব না। আমি বুঝেছিলাম, এই পৃথিবী থেকে হয় বালি নতুবা আমি—এই দু'জনের একজনকে সরে যেতে হবেই। আমি তাই প্রাণাতঙ্কে বিশ্বময় ছুটে বেড়িয়েছি। পিছনে তেড়ে আসছে বালি। বালির ভয়ে স্বতঃপ্রণোদিত আন্তরিকতায় কোনও রাজা বা মহাবীর আমাকে আশ্রয় দিতে রাজি হননি। এই রকম মরিয়া পর্যটনের মধ্য দিয়ে আমি যেন গোষ্পদ তুল্য বিশ্বকে চিনে ফেললাম। মেরু ও মরু, পাহাড় ও সমতল, স্থলভূমি-মালভূমি, নদী ও সমুদ্র, জলপথ ও বনপথ সব চষে বেড়িয়েছি প্রাণের দায়ে। কেউ আমাকে আশ্রয় দিতে রাজি হননি, দেখভাল দূরঅস্ত। মনমরা অবস্থায় ক্ষীরোদ সাগরের তটরেখা ধরে হাঁটছি তো হাঁটছিই। দেখতে পেলাম যুগপৎ পর্বত ও সরোবর। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যাবে। কিন্তু সেখানেও ফ্যাসাদ। দেখলাম, পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে দুই কপি আমাকে নিরীক্ষণ করছে। পড়ি কি মরি ছুট শুরু হল আমার। ছুটতে ছুটতে পৌঁছলাম সদূর বিন্ধ্যাচলে।

সেখানেও বালির দূত। যাবো কোথায় ? তখন প্রখর বুদ্ধিমান হনুমান আমাকে বালির হাত থেকে রেহাই পাবার একটি দারুণ উপায় বাতলে দিলেন। খুবই কার্যকরী ফিকির। বললেন, 'আপনি জটাধারী মতঙ্গ মুনির আশ্রমে আশ্রয় নিন। বালি তখন তাঁর অগুন্তি সেনা নিয়ে এসেও আপনার কেশাগ্র করতে পারবেন না।'

হনুমানের পরামর্শ অমূল্য। আমাকে বালির হাত থেকে বাঁচবার সেরা উপায়টি বাতলে দিলেন। কেবল নিরাপদ নয়, মুনির তপোবনের কোনও একটি চাতালে ভরপেট ফল খেয়ে চিত হয়ে শুয়ে আরামে আকাশের শোভা দেখতে পাব।

মতঙ্গ মুনির আশ্রম এমন নিরাপদ কেন ?

কারণ, প্রথম যৌবনে আমার দাদা বালি একবার অকারণে চড়াও হয়েছিলেন ঋষ্যমূক পর্বতে অবস্থিত মতঙ্গ মুনির ফল-মূল পত্র-পুষ্পে সজ্জিত মনোরম তপবনে। সবান্ধব বালি সেখানে জেঁকে বসবার ফিকিরে ছিলেন। ফলে শুরু হয় তাঁদের বিবিধ খুচরো অত্যাচার। মুনি তাঁদের উৎপাতে এতই বিব্রত হয়ে পড়েন যে তিনি ঈশ্বরভাবনায় মনস্থির করতে পারছেন না। এমনকি, বালির চেলারা তাঁর সার্ফসুতরো পর্ণকুটিরকেও নোংরা করে পালাচ্ছে। মুনি তখন বালিকে হুঁশিয়ার করে দিতে চাইলেন। কিন্তু প্রত্যুত্তরে বালি সদম্ভে যে ভাষায় মতঙ্গ মুনিকে গালিগালাজ করতে থাকেন, সমাজে তা নেহাৎ বর্বরদের মুখেই শোভনীয়। মতঙ্গ মুনি এবার ক্রোধে অগ্নিশর্মা। তাঁর বৌদ্ধিক প্রশান্তি অপসৃত। তিনি তর্জনী তুলে বালিকে বললেন, 'তুমি অতিশয় দুর্বিনীত। শেষ অবধি তুমি তোমার শরীরী কসরত দেখাতে এলে আমার তপোবনে ! এখানকার নিবিড় শান্তিকে তুমি চূর্ণ করেছ। আমাকে উদ্দিষ্ট করে অকথ্য অশালীন গালিগালাজ উদ্গার করলে। ইচ্ছে করলে এই মুহূর্তে শাপাগ্নিতে তোমার নিধন ঘটাতে পারতাম। কিন্তু তা না করে লঘু শাস্তি দিচ্ছি। অতঃপর তুমি যদি আর কখনও আমার এই তপোবনে পা রাখ, তোমার দেহ শতদীর্ন হবে। তৎক্ষণাৎ তোমার মৃত্যু ঘটবে।

বালি সভয়ে মতঙ্গ মুনির আশ্রম থেকে দূরে সরে গেলেন। ঘটনাটা খুবই স্মরণীয় ও উপাদেয় রূপে প্রতিভাত হল পলায়নতৎপর সুগ্রীবের নিকট। তিনি সটান গিয়ে উপুড় হয়ে পড়লেন মতঙ্গ মুনির পায়ের ওপর। তপোবনের বাইরে বৃথাই তড়পাচ্ছেন বালি।'

তো সে যাই হোক, বালিকে অন্যায়ভাবে বধ করে রামচন্দ্র তখন সুগ্রীবের

একান্ত বান্ধব। সুতরাং রামের অনুরোধে তিনি তাঁর পূর্বের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে একটি বিশ্বমানচিত্র রচনা করলেন। তারপর তাঁর বানর বাহিনীকে দিকে দিকে প্রেরণ করলেন বন্দিনী সীতার সঠিক অবস্থান খুঁজে বের করতে। রাম আশ্বস্ত হলেন। অন্তত সীতা যে কোথায় আছেন, কীভাবে আছেন, তার সঠিক বিবরণ পাওয়া যাবেই।

তিরিশ দিন সুগ্রীবের আতিথ্যে পুষ্ট ও তুষ্ট রইলেন রাম ও লক্ষণ। কিন্তু কোনও বার্তা এল না।

রামের ভ্রুকুঞ্চন গভীর হয়। কোনও সূত্র থেকেই একবারও ইতিবাচক অথবা নিদেনপক্ষে ব্যতিক্রমী খবর আসছে না। রাম কান খাড়া করেই আছেন, এই বুঝি সঠিক খবরটি এসে গেল। সুগ্রীব অবশ্য নিশ্চিন্ত, তাঁর প্রেরীত দূতদের মধ্যে কেউ না কেউ ঠিক খুঁজে পাবেন অপহৃতা সীতাকে।

বানরদের মধ্যে একজন বীর বিনত। তিনি পূব দিক ধরে দুনিয়ার বহুলাংশ ঘুরে ফিরে এলেন বিরস বদনে। সুগ্রীবকে বললেন, 'বয়সের দোষে এখনও আমার দৃষ্টিবিভ্রম কিংবা শ্রবণবিভ্রম ঘটেনি। পাতি পাতি করে খুঁজেছি। অন্ততঃ পূর্ব দিকে দেবী সীতাকে কেউ কয়েদ করে রাখেনি।

উত্তরদিক চষে ফিরলেন আর এক কপি বীর শতবলি। তাঁর প্রতিবেদন এইরকম, 'আমি সকালে সন্ধান শুরু করতাম আর তা সাঙ্গ হতো সূর্য অপস্রিয়মান হলে। দুঃখের বিষয়, উত্তরে কোথাও সীতা বন্দিনী অবস্থায় দিনাতিপাত করছেন না।'

পশ্চিম দিক তোলপাড় করে ফিরে এলেন সুগ্রীবের বিশেষ আস্থাভাজন সুষেণ। তাঁরও চোখ-মুখে ব্যর্থতার ছাপ, 'পশ্চিমে মা সীতা যে নেই, এটা আমি হলপ করে বলতে পারি।'

তা হলে বাকি রইল দক্ষিণ দিক।

এবং দক্ষিণে গেছেন মহাবীর হনুমান। তিনি বিশেষ ক্ষমতাবলে বলীয়ান। শূন্যপথে চলেছেন লঙ্কার দিকে। আকাশ ও সমুদ্রের মেলবন্ধনে কী অপূর্ব ছন্দোবদ্ধ ললিত দৃশ্য!

হনুমান অশোক কাননে বন্দিনী সীতাকে দেখতে পেলেন। সীতা তখন গূঢ় ভাবনায় নিমজ্জিত। রামের জন্য ভাবনা। নিজের ভবিষ্যৎ নিয়েও তাঁর অন্তস্থলে ঘনীভূত আশঙ্কা।

হনুমান তাঁর মাতৃসমা সীতাকে কাঁধের ওপর স্থাপন করে সোজা রামের সমীপে নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন।

প্রস্তাব শুনে শিউড়ে উঠলেন সীতা। তিনি তাঁর স্বামীকে ভালোই চেনেন। হনুমানের কাঁধে চেপে ওই রকম বিশাল ও মনোরম দূরত্ব পার হয়ে এসেছে তাঁর স্ত্রী—এই ঘটনা নিশ্চিত রামকে নিয়ে যাবে জটিল ও পীড়াদায়ক আত্মরতির পথে। গবেষক মেইড হুগস সীতার জীবনব্যাপি ওই গতিশীল দুর্ভাগ্যের সঙ্গে মিল খুঁজে পেয়েছেন হোমার রচিত 'ওডিসি' মহাকাব্যের নারী চরিত্র পেনিলোপের সঙ্গে। তিনি তাঁর সুখ্যাত গ্রন্থ "Epic women : East and West"-এ সত্যাসত্য নির্ণয়ে এই কথাগুলি লিখেছেন, 'It is penelope whose presence, Overt or hidden, prevades all twenty four books of the epic.

She is the woman in home, the wife and mother whose separation is not from her children, in the company of her husband, as in the case of Draupadi, or with her children from her husband as happened to Sita, but whose husband is separated from her and from his home and sons. Penelopels struggle to be faithful to her husband perhaps only her husband's memory and to her son lasts the greater part of twenty years, and despite doubt and hesitation and well-high intolerable pressure, her fidelity triumphs and meets its reward. Here is a faithfulness that is comparable with Sita's devotation to Rama and Rama's sons.'

মনে হচ্ছে, রামায়ণ যখন রচিত হয়, সেই সময় গুণবতী নারীদের জীবনও মধ্যযুগের ন্যায় কালোগহ্বরে অতিবাহিত হত। খ্রীষ্টান জ্ঞানবাদীরা যাকে বলে থাকে 'হোলি গোষ্ট' অর্থাৎ স্ত্রী-শক্তি, খুবই একটা উপেক্ষার বস্তু হয়ে উঠেছিল। সেই কর্দমাক্ত উপেক্ষা এবং লজঝড়ে নীতিবোধ আজকের এই একবিংশ শতকেও লক্ষণীয়। অবিরত কন্যা ভ্রূণ হত্যা এবং প্রতিটি পুত্রের জন্মকে পরম পরিতোষিক গণ্য করা সেই ভয়াবহ পরম্পরারই নজির। কর্তারা রাজনৈতিক স্বার্থ ছাড়া নারীসত্তার স্বীকৃতি বড় একটা দেন না। যদিও নারীসত্তা এসেছে আদি সত্তা থেকে।

জ্ঞানবাদী খ্রীষ্টানরা বলে থাকেন, অধিকাংশ পুরুষ যতই নারীসত্তার মুণ্ডুপাত করুক না কেন, আদিসত্তাই হল মানবজন্মের মূল কথা। আদিসত্তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল 'হোলি গোষ্ট' বা স্ত্রীশক্তি। এই স্ত্রীশক্তিই সৃষ্টি করেছে খ্রীষ্টের ন্যায় মহান পুরুষসত্তা।

পুরুষসত্তা ও নারীসত্তা একত্রিত হয়ে তৈরি করে সোফিয়া বা প্রুনিকাস। সেই থেকে আসে দেহীসত্তা। পুরুষসত্তা ও নারীসত্তার মিলনে যে সন্তানের জন্ম, তাঁর নাম ইয়লদাবোথ্। ইয়লদাবোথ কয়েকজন পুংলিঙ্গ সন্তানের জননী হন। কিন্তু ইয়লদাবোথের মধ্যে ছিল অশুভ শক্তির প্রভাব—যার ফলে বিশ্বে মনুষ্য সমাজে নানাপ্রকার পাপকর্মের প্রাবল্য বাড়ে। আসে অহমিকা, হিংসার শ্বদন্ত এবং মাতৃজাতির প্রতি অবজ্ঞা। এইরূপ অন্যায় যখন ন্যায়ের শক্তিকে প্রায় অবশ করে এনেছে, তখন ন্যায়, সমতা ও মাতৃজাতির প্রতি শ্রদ্ধা জাগ্রত করবার জন্য ঈশ্বরপুত্র যীশু এলেন ধরাধামে।

হিন্দুধর্মের ভাষ্যে বা পুরানে যদিও তাঁর কোনও অস্তিত্ব নেই, তবুও যেন মনে হয় ইয়লদাবোথের সত্তাই এসে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল রামকে, যদিও ইয়লদাবোথ নিজে ছিলেন নারী।

রাবণের জবরদস্তির কাছে সীতা যে আত্মসমর্পন করেন নি, আমার মনে হয়, রাম এটা বিশ্বাসই করেন নি। বিশ্বাস করেননি বলেই তিনি অতঃপর সীতার নিকট অকপট ও প্রেমময় হয়ে উঠতে পারেন নি। কেবল কিছু ছিদ্রান্বেষী প্রজার ঘাড়ে দায় চাপিয়ে হাত ধুয়ে ফেলতে চাইলেও আমরা এই যুগের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে তা মেনে নিতে পারছি না। রাম যদি সীতার অন্তরঙ্গ হতেন, তা হলে নিশ্চয় সীতার কাছে ব্যাখ্যা করতেন পরিস্থিতির গুরুত্বকে। নিশ্চয় জানাতেন যে তিনি বাধ্য হয়েই অর্থাৎ তথাকথিত রাজধর্মের খাতিরেই সীতাকে নির্বাসনে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিতে চলেছেন। সমস্তটা দিব্যি গোপন করে গেলেন। এবং কখন?

যখন সীতা সন্তানসম্ভবা।

কী মর্মান্তিক চেতনাশূন্য অন্ধকার তখন শ্রীরামের পুরুষসত্তাকে গ্রাস করে বসে আছে! সন্তানসম্ভবা সীতাকে বিপদশঙ্কুল অরণ্যে রেখে আসবার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল লক্ষণের ওপর। অপরাধবোধে আক্রান্ত রামের সেই মানসিক বলই ছিল না যে স্বয়ং সীতাকে নিয়ে গভীর অরণ্যে ছেড়ে দিয়ে আসবার। অজুহাতটাই বা কী দেবেন? প্রজাদের তথাকথিত মনোরঞ্জন? হাস্যকর ছাড়পত্র। সীতা তাঁর সারাজীবনে সফট টার্গেটিই হয়ে রইলেন। কখনও রাবণের নিকট, কখনও বা রামের নিকট। এই দুই পুরুষের নিবদ্ধ বিপরীত বাসনার পেষণে তিনি কেবল হিমশিম খাননি, শেষাবধি এই পৃথিবী থেকেই নিজেকে সরিয়ে নিলেন। ফিরে গেলাম মাতৃক্রোড়ে। মনে হয়, সীতা যেন শেষ মুহূর্তে আর সহ্য করতে না পেরে আত্মহননের পথই বেছে নেন।

সীতাকে রাবণ পীড়ন করেছেন নিজের যৌন ক্ষুধাকে চরিতার্থ করবার মানসে। আর রাম নিজেকে আরও জনপ্রিয় ও করিশমাময় করে তুলতে বাজি রেখেছিলেন সীতাকেই। তাঁর ওই রঘুকুলরীতিকে নিয়ে যতই ন্যায়ের বংশীধ্বনি দিকে দিকে শ্রুত হোক না কেন, ব্যাপারটা যে নারী নির্যতনের একটি জ্বলন্ত উদাহরণ অস্বীকার করা যায় না। যে কাজ অমানবিক, তার উপর মেকি ঐশ্বরিক নামাবলী চাপাবার ধারাবাহিক প্রয়াস অব্যাহত।

বেচরি লক্ষণ।

কী সাংঘাতিক দোলাচলে তাঁকে ভুগতে হয়েছে বারবার। ইন্দ্রজিতকে বধ করবার সামর্থ অর্জন করবার জন্য চৌদ্দ বছর নারীমুখ দর্শন করেন নি। সর্বক্ষণ পায়ের দিকে তাকিয়ে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতেন। নারীসঙ্গ বর্জনের জন্য কোনও অছিলা নয়, যেন নিজের পৌরুষকেই পর্যুদস্ত করে রেখেছেন দীর্ঘকাল। সীতার চরিত্রে এটাই সবচেয়ে বড় কলঙ্ক যে এ হেন জলজ্যান্ত নীতিনিষ্ঠ শুদ্ধ পুরুষ দেবরকে তিনি অতি হীনবাক্যে জর্জরিত করেছেন।

তোমার দাদাকে ওখানে দানবটা মেরে ফেলছে, আর তুমি আমাকে পাহারা দেবার অছিলায় তারিয়ে তারিয়ে কল্পসুখ উপভোগ করছ! জেনে রেখ, আমি রামের সতীসাধ্বী সীতা। আমি নিজেকে খুন করে ফেলব, তবুও তোমার কুপ্রস্তাবে সায় দেব না।

অভাবনীয় অভিযোগের বন্যা বয়ে গেল লক্ষণের ওপর দিয়ে। যদি সেখানে তৃতীয় কোনও ব্যক্তি উপস্থিত থাকত, ওই ভয়ানক উক্তিগুলি চাউর হয়ে যেত দেশময়। হয়তো এর ফলে রামের পৌরুষ তৃপ্ত হত, কিন্তু সমাজে লক্ষণের অবস্থানটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াত?

লক্ষণ কিন্তু সীতার দ্বারা নিক্ষিপ্ত ওই সমস্ত বিষাক্ত বাণ হজম করেছেন। নিজের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন—এ কথা আমার মুখ দিয়ে কেউ কোনও দিন শুনতে পাবে না। যতই আহত হই না কেন, যতই ঝড়ঝঞ্ঝাট আছড়ে পড়ুক না কেন, আমার বিচারে আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতার স্ত্রী দেবীসমা। তাঁর অসম্মান হতে পারে, এরকম কোনও বাক্য আমার মুখ দিয়ে বের হবে না।

বনে সীতাকে বিসর্জন দিয়ে আসবার ভার সেই হতভাগ্য লক্ষণের ওপরই বর্তালেন রাম। সাদাসিধে সীতা রথে ওঠার মুহূর্তেও জানতেন না, তাঁর ললাটে অতঃপর কী আছে। রাম বলেছেন, সন্তানসম্ভবা স্ত্রী সীতার উচিত, শান্ত বনভূমিতে একটু বিহার করা। রাজকার্যে শ্রীরাম এতই ব্যস্ত যে স্ত্রীকে

বনবিহারে নিয়ে যাবারও মওকা পাচ্ছেন না। দায়িত্ব তাই বর্তেছে দেবর লক্ষণের ওপর। বিড়ম্বনার জ্বালায় বিবেকের কামড়ে বেদনার গাঢ়তায় লক্ষণ অস্বাভাবিক গম্বীর। যাবতীয় আবেগকে কী ভাবে যে আয়ত্তে রাখতে পারছেন, তা একমাত্র লক্ষণই জানাতে পারেন। সীতা বিস্মিত লক্ষণের অস্বাভাবিক গাম্বীর্যে। শান্ত নিরুদ্বেগ বনেও আজ কী চাঞ্চল্য। আকালের ভয়ে যেন পলায়নতৎপর বনের পশু ও পাখিরা। অদ্ভুত এক অনিশ্চিত পটভূমি তৈরি হয়েছে সেখানে।

অরণ্যের গভীরে প্রবেশ করে রথের গতিকে স্তব্ধ করলেন লক্ষণ। সেইদিন লক্ষ্মীবার কি না, জানা নেই। কিন্তু লক্ষ্মীকে বিসর্জন তো দেওয়া হচ্ছে বিলক্ষণ। রাম তাঁর দরবার-মজলিশ আলো করে আছেন। আর এখানে ভ্রাতা লক্ষণ তাঁর জীবনের সবচেয়ে কঠিন ও বেদনাদায়ক কর্মটি করবার প্রাক্কালে প্রস্তরবৎ স্থির। স্তব্ধ ঘন বনাঞ্চলও। যৎকিঞ্চিৎ আলোড়ন কেবল পাখ-পাখালির। সীতার আফশোস—তাঁর হাত আজ খালি। ওই পাখিদের কিছু দানা খাওয়াতে পারলে মন ভরে যেত।

ঝাঁকুনি দিয়ে রথ থামল। লক্ষণ রথ থেকে নেমে দাঁড়ালেন। সীতা প্রশ্ন করেন, এখানে রথ থামালে কেন, লক্ষণ ? আমরা কী বনের আরও অভ্যন্তরে যেতে পারি না ?'

যেন ঘোর-ভাঙা গলা লক্ষণের, 'আর অভ্যন্তরে যাবার প্রয়োজন দেখি না। আমি এখান থেকেই ফিরে যাব। এখানেই আপনাকে নামিয়ে দিলে চলবে।'

সীতা অবাক। ক্রমে তাঁর দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে সন্দেহের কুটিলতা। কুণ্ডলী পাকায় সেই আত্মসচেতনতা। স্বর তীক্ষ্ণ, 'তোমার উদ্দেশ্যটা কী লক্ষণ ? তোমার দাদা তো বলেছেন আমাকে বনাঞ্চল ঘুরিয়ে আনতে। আর তুমি—'

সীতার বাক্য অসমাপ্ত থাকে।

প্রবল কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন লক্ষণ। নিজের অন্তরশক্তিকে যথাসাধ্য জাগ্রত রেখে যাবতীয় ঘটনা জানালেন।

সীতা কান পেতে শুনলেন। নিজের সহ্যশক্তিকে শান দিতে দিতেই একসময় চূর্ণ হলেন। এই দুনিয়া থেকে চিরতরে নিজেকে সরিয়ে দেবার ইচ্ছা তোলপাড় করতে থাকে। তাঁর সততা, রূপ-যৌবন ও স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠ থাকবার মাশুল যে এইভাবে দিতে হবে, কল্পনা করতে পারেন নি। যে রামের নামে দুনিয়াশুদ্ধ মানুষ অমন ধন্য ধন্য করেন, এই তাঁর মানবিক রূপ!

অনেকক্ষণ সীতা ও লক্ষণের মধ্যে কোনও সাড়াশব্দ ছিল না। ছিল না কোনও আকাশ-পাতাল ভাবনাও। এক বিকট শূন্যতাই সম্বল হয়ে দাঁড়িয়েছিল ওই মুহূর্তগুলিতে।

সীতা সেদিন ওই বনেই আত্মবিসর্জন দিতে পারতেন। তিনি তা করেন নি কেবল গর্ভস্থ সন্তানদের কথা ভেবে।

পরে যখন যুগ্ম সন্তান লব ও কুশ বড় হয়ে ওঠে, সীতার সেই দায়িত্বও শেষ হয়। তাই রামের রাজসভায় আর একদফা কুৎসিত অপমানের পর সীতা এই ধরাধামই ত্যাগ করলেন।

কিছুকাল আগে আমি দক্ষিণ কলকাতার লেক কালী মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা তন্ত্রাচার্য শ্রীশ্রীহরিপদ চক্রবর্তীর জীবনী রচনার কাজে হাত দেই। মন্দিরের সেবাইত শ্রদ্ধেয় শ্রী নিতাই চন্দ্র বসুর কাছ থেকে এই তথ্য ও বিবৃতি লাভ করি। সেই তথ্যেরই একাংশে পেয়ে গেলাম তন্ত্রাচার্যের এই প্রণিধানযোগ্য উক্তি ঃ

সীতা রামের স্ত্রী। সুন্দরী। রাবণ শক্তিমান রাজা। ভীষণ ভোগী। নারীবিলাসী। রাবণ যে সীতাকে কিডন্যাপ করল, তাতে সীতার অপরাধটা কোথায় ? আর যদি অপরাধিনীই মনে করে থাকেন, তা হলে এমন সাড়ম্বরে সীতা উদ্ধারেরই বা কী তাৎপর্য রইল ? রাবণ পাপ করেছে। সে সরিবারে খুন হল। বেশ হল। কিন্তু সীতাকে বাড়িতে নিয়ে এসে ওরকম হেনস্থা বারবার করাটা কী রকম ন্যায়-নীতি, হে ? বিশেষত সীতা তখন গর্ভবতী। আমার বিশ্লেষণ হল, রাম যে কেবল সন্দেহবাতিক, তা নয়, ওই যুগটাই ছিল মেয়েদের ওপর অত্যাচারের একেবারে পূর্ণ ষোলকলা।

কিন্তু তুলনা করে দেখুন, হেলেনের সঙ্গে প্যারিসের দীর্ঘ মানসিক ও শারীরিক মিলন সত্ত্বেও ব্যাপারটা নিয়ে গ্রীক বীররা আদৌ উদ্ধারপ্রাপ্ত হেলেনকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলেন নি বা তাঁর উপযুক্ত শাস্তিও দাবি করেন নি। বরং এক দশকের ওপর পরপুরুষের সঙ্গে সহবাসের স্মৃতি ও অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হেলেন দিব্যি রাণির বৈভব ও মর্যাদা নিয়ে হিতু হলেন স্বামীর গৃহে। এটা কী পূবের সঙ্গে পশ্চিমের দৃষ্টিভঙ্গীর তারতম্যের একটা বড় নজির নয় ?

তান্ত্রিক দর্শনেও সীতার এই লাঞ্ছনা অবশ্যই অপরাধের। অপরাধ রাম ও রাবণ উপয়েরই। বৌরব, স্বায়ম্ভুর, মৃগেন্দ্র, কামিক প্রমুখ আগাম ও অঘোরশিব বিশ্লেষণ এই অপরাধকে বেয়াত করে না। তন্ত্রের আচার্যগণ 'ত্রি-রত্ন'-এর কথা বলে থাকেন। ত্রি-রত্ন হল শিব, শক্তি এবং বিন্দু। এই

তিন যেখানে পরস্পরের সহায়ক হয় না, অনুঘটক হয় না, সেখানে সম্পর্ক হয় সংকীর্ণ—পরবর্তীকালে ক্ষীণ হতে হতে যা ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়। শিব হলেন অধিষ্ঠাতা ও শক্তিমান। শক্তি ও বিন্দু শিবাশ্রিত। তাদের গাঁটছড়া যেখানে সুদৃঢ়, সেখানে সম্পর্কও হয় অবিনাভাবসম্বন্ধ। সেখানে বিচ্ছেদের তুমুল সম্ভাবনা থাকলেও বিচ্ছেদ হয় না। রাম ও সীতার মধ্যে যে সম্পর্ক, সেখানে শিব ও শক্তির বন্ধনকে আমরা সুদৃঢ় বলতে পারি না, রামেরই আচরণ ও সিদ্ধান্ত সেই সম্পর্ককে ভঙ্গুর করে তোলে। বহুজনের পুরনো সংস্কারে আঘাত লাগবে জেনেও নিজস্ব এই উপলব্ধিকে আপন করতে আমার কোনও ভয়ডর নেই।

স্ত্রীশক্তির প্রতি মহাকাব্যিক নায়কদের যে প্রয়াশ উপেক্ষা বা অনাচার, তার উৎস সন্ধান করতে করতে হাতে পেয়ে গেলাম টমাস বি. কোবার্নের রচিত একগুচ্ছ নিবন্ধ—যেখানে তিনি ষষ্ঠ শতাব্দীর 'দেবী মাহত্ম্য'-এর চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি উপসংহার টেনেছেন, 'পুরুষতান্ত্রিক দম্ভ ও ভীতি যুগপৎ কার্যকরী বিশ্বের চারটি মহাকাব্যেই।

কিন্তু পরিণামে আমরা এটাও দেখতে পাই যে ওই পৌরুষের দর্পকে অলক্ষ্যে পরিচালিত করে কিন্তু নারীরই শক্তি ও প্রভাব।' দুর্গাস্তোত্রকে বাদ দিলে বিশাল মহাভারতও তার আদি শক্তিকে হারায়। মহাকাব্যগুলিতে নারী তথা নায়িকাদের মূল্যায়ন করা হয়েছে এই ভাবে ঃ We find in the lives of these epic women characters a frequent, sometimes constant intervention of the divine, often at the cost of pain and shame ; at other times bringing comfort, reassurance and ultimate glory. But hardly attempts are being made to recognise the roles of epic women as instruments of justice, goddesses of sovereignty and mothers of warriors.'

কবিদের প্রয়াসই হল পুরুষ চরিত্রগুলির ওপর আলোকবর্ষণ। তাঁরা পাঠককে দেখাতে চান 'এচিলেসের ক্রোধ', 'ওডিসেসাসের ভ্রমণবৃত্তান্ত', 'এয়নেসের কীর্তিকলাপ', 'উত্তম বীরত্ব ও মহান দুঃখজনক শঠতা সিজফ্রাইড এবং রোনাল্ড', 'ত্রিস্টানের দ্বিচারিতা' তথা 'দুর্যোধনের পর্বতপ্রমাণ ঈর্ষা ও অহমিকা'।

এঁদের কথা লিখতে লিখতেই কবির কলমে কালি শেষ। নায়িকাদের কথা কিছু সবিস্তারে পরিবেশনের উদ্দীপনা আর কোথায় ? নাকি, নারীদের বিষয়ে

বেশি কিছু লিখতে গেলে মাথা কাটা যাবে? এমন সমস্ত পুরুষ বীরদের বিবরণীতে পর্বের পর পর্ব ঠাসা যাঁরা যেন আদতে সব দেবতা কিংবা দেবতাদের জাতিগুষ্টি—সেই ভীম, অর্জুন, যুধিষ্ঠির, রাম, বেওউলফে, কুচলিন প্রমুখ। এঁদের গুণগাথা কোথাও কোথাও এমন স্তরে পৌঁছে যায় যে তা অনেকটা জান্তব চিৎকারের সমান হয়ে ওঠে। আমরা তখন ভুলে যাই, ওঁদের এইসব ভালোমন্দ কীর্তিকলাপ, মস্ত মস্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন, বরফের মতন নীতিশুদ্ধ শীতলতা প্রাপ্তি কিংবা খেপে উঠে হতভম্ব করে দেবার হিংস্রতা...সমস্ত কিছুর মূলে রয়েছে নারী। এক-একটি নারী চরিত্র। এঁদের নিয়ে কবির শব্দ যতই কম ব্যায়িত হোক না কেন, এঁরাই কিন্তু আদত চালিকাশক্তি। এঁরাই তাঁদের পুরুষদের দম দিয়ে কার্যক্ষেত্রে নামিয়ে দেন। কেউ খতম হয়। কেউ আবার প্রতিপক্ষকে নিকেশ করে টলতে টলতে ফিরে আসে। আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হল, মহাকাব্যের কোনও নায়িকার সঙ্গেই কোনও নায়িকার মিল নেই। ঘটনার মিল বিলক্ষণ বর্তমান, কিন্তু চারিত্রিক সাদৃশ্য খুঁজতে গেলে অঙ্ক একেবারেই মিলবে না। সীতাকে অঙ্কশায়িনী করবার বাসনায় রাবণ সপরিবারে নিজেকে ধ্বংস করলেন। দ্রৌপদীকে বিবস্ত্র তথা যৌনলাঞ্ছনায় ব্রতী হতে গিয়ে দুর্যোধন তাঁর সকল ভ্রাতা ও সহায়কদের নিয়ে ভূমিশয্যা নিলেন। আর লাস্যময়ী, সদাই কাম-কামনার মূর্তিময়ী অগ্নি হেলেনকে নিয়ে পালাবার দায়ে যুবরাজ প্যারিস সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটালেন ট্রয়ের মতন উন্নত সমৃদ্ধ শক্তিশালী রাষ্ট্রের।

তিন নারীর ভূমিকায় মিল বিস্তর লভ্য হলেও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে তাঁরা এক একজন এক এক রকম। আদৌ এক ছাঁচে গড়া নয়। সীতা রাম ব্যতিত কোনও পুরুষকে স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেন না। তাঁর এমত সতীত্বচ্ছ্যুৎমার্গিতা এককথায় অপার্থিব। আবার দ্রৌপদী বিদ্যি পাঁচটি শক্তিশালী পুরুষের চাহিদা মিটিয়েও ক্লান্ত তো ননই, বরং পাণ্ডবদের বৃন্তচ্যুত ভ্রাতা কর্নের পরিচয় জানবার পর ষষ্ঠ স্বামীর সঙ্গে সম্ভাব্য মিলন-কামনায় বুঁদ হয়ে থাকেন। আর হেলেন? তাঁর চারিত্রিক মহিমাকে ব্যাখ্যা করতে গেলে একজন শক্তিমান আধুনিক কবিরও গলা বুজে আসবে নির্ঘাৎ। লেডি আগস্টা গ্রেগরির Gods and Fighting men থেকেই উদ্ধৃতি টানছি ঃ

'...Helen was in search of a competent bedmate. That caused the Trojan war with its devasting slaughter of the "Flower of Chivalry". Helen was not a victim of 'theft.' The

most bautiful, frivolous, totally and certainly unfaithful to her husband Helen left the palace herself for having free and often sex with youthful handsome, fresh-faced Paris.

...The frivolity of the bored Helen at Troy is ultimately responsible for the death of Patroclus and Achilles, of Priam and Hector and countless other warriors of gigantic stature...'

চরিত্র হিসেবে হেলেন পশ্চিমী সাহিত্য ও জীবনধারায় যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে। সম্প্রতি আমি বার্লিন থেকে প্রকাশিত একটি কাগজে (Collage) প্রকাশিত এক নিবন্ধে দেখলাম, হেলেনকে জর্মনদের পৌরাণিক বসন্তদেবী অস্টারার (Ostara) সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। হেলেনকে দেখলে ও তাঁর সান্নীধ্যে কিছুক্ষণ অতিবাহিত করলে যে কোনও পুরুষ নাকি হ্যালুসিনেট (Hallucinate) অবস্থায় চলে যেতে পারে। এ হেন রমণীরত্নকে যে পুরুষ হারেম থেকে বের করে এনে উড়াল দিতে পারেন, সেই প্যারিসের Physiognomical profile তৈরি করাটা কম বড় ব্যাপার নয়।

আয়ারল্যান্ডে হেলেন একটি বহু চর্চিত চরিত্র। আইরিশ কাব্যনায়িকা ডেরদ্রের সঙ্গে হেলেনের সাদৃশ্য খোঁজেন বহু বিশ্লেষক। ডেরদ্রেকে অনেক বলেন 'Irish Helen'. অনেকে বলেন 'Celtic Helen'. এর কারণ, হেলেনের মতন ডেরদ্রেকেরও ছিল অতুলনীয় রূপ ও সকল সম্ভাবনাকে ফরশা করে দেবার মতন মোহিনী শক্তি। ওই আইরিশ হেলেনের সঙ্গে কথোপকথনের স্মৃতি একজন স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষকেও অস্থির করে তুলত। একজন ভীরু ব্যক্তিকেও করে তুলত দুঃসাহসী। গ্রীসের হেলেন ট্রয়ের সর্বনাশকে ঘনীভূত করেন। আর কেলটিক হেলেন ডেরদ্রের জন্য তাঁর দেশের জনগণের দুঃখ-দুর্দশার আর শেষ থাকে না।

রূপাগ্নির প্রভাব যা-ই হোক, হেলেন ও ডেরদ্রেকের মানসিকতা কিন্তু একই স্তরের নয়। হেলেন নিজের রূপ ও যৌবন সম্পর্কে ছিলেন প্রচণ্ড সচেতন। দ্রৌপদীও। কিন্তু সীতা ও ডেরদ্রে নিজেদের রূপ ও যৌবন নিয়ে কখনও বাসনা ও ভাবনায় উগ্র হয়ে ওঠেন নি। তাঁদের দু'জনের জন্য দুটো রাষ্ট্র ধ্বংস হলেও সেই বিপুল পার্থিব ক্ষতির জন্য ওই দুই মহাকাব্যিক নায়িকাকে দায়ি করা যাবে না। কিন্তু দ্রৌপদীর ভূমিকা ছিল প্রত্যক্ষ। আর হেলেনের তো কথাই নেই। হেলেন একজনের পর একজন পুরুষকে অসাড় করে দিয়ে সুখ পেতেন। তাঁর ক্ষমতাবান ভারিক্কীস্বভাব স্বামীর কাছ থেকে

সতেরো দফার বায়না আদায় করে নেবার পরও পরপুরুষ প্যারিসের দিকে ঢলে পড়তে তিনি একশ' ভাগ দ্বিধামুক্ত। নিজের সনাতনী আদর্শ রক্ষার্থে সীতা যতখানি শক্ত ঠাঁই, দ্রৌপদী অতটা নন, হেলেন তো ননই। হোমারের লেখার মুখ্য গুন হল, তিনি বিশেষ বিস্তারের সঙ্গে ঘটনার পাশাপাশি চরিত্রগুলিরও সার্বিক রূপ চিত্রিত করেছেন অসাধারণ নৈপুণের সঙ্গে। সেখানে রহস্যময়তার স্থান কম। সেই তুলনায় মহাভারতে দ্রৌপদী চরিত্রে রহস্যময়তা যথেষ্ট। কৃষ্ণের সুমিষ্ট হাসির ন্যায় প্রহেলিকাময়। 'Unlike the creater of Mahabharat's Draupati Homer tries to show clearly all sides of the character Helen, allthough both the epic ladies caused devasting consequences (Epic women : East and West M. Hughes).

সকল পণ্ডিত কিন্তু একমত নন।

এইচ. জে. রোজ তাঁর সুখ্যাত গ্রন্থ 'A Handbook of Greek Mythology'-তে ব্যখ্যা করেছেন সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে ঃ 'হেলেন-প্যারিস ট্রয়ের যুদ্ধ, অনেক চরিত্র, অনেক পতন, উল্লাস ও অশ্রুজল বিসর্জন ইত্যাকার যাবতীয় ঘটনা নিচয়ের পশ্চাতে রয়েছে বাণিজ্যিক লড়াই। তৎকালে বাণিজ্যিক স্বার্থে সমুদ্রকে ব্যবহার করবার অধিকার নিয়ে সমুন্নত রাষ্ট্র ট্রয়ের সঙ্গে গ্রীসের প্রধান প্রধান রাষ্ট্রগুলির বিবাদ এক চূড়ান্ত বাঁকমুখে এসে দাঁড়িয়েছিল। গ্রীসের পকেটে ছিল হোমারের মতন প্রতিভা। ট্রয়ের তা ছিল না। গ্রীসের বিজয়গাথাকে কল্পকাহিনির মধ্য দিয়ে চিত্রিত করতে গিয়ে হোমার লিখলেন 'ইতিয়াড' ও 'ওডিসি'।

অর্থাৎ myth of Helen এক বাণিজ্যিক লড়াইয়ের হেঁয়ালিগাথা। তা হোক না এটা কল্পকাহিনি, এর মাধুর্য ও চরিত্রায়ন যে বিশ্ববাসীর কাছে কালজয়ী সম্পদ। সিস্টার মেইড হুগস তাঁর উপলব্ধিকে যে ভাবে বর্ণনা দিয়েছেন, তার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানাতে আমার দ্বিধা নেই ঃ

But without the Helen element, even it be no more than an ellusion, a dream, a nightonare, the ultimate in Maya, there had been no Iliad, possibly no Odyssey either and the Draupadi mystery of the Mahabharata or Sita-harana of Ramayana in its journey Westward would have skipped one of its most elaborate and poetic transformation.

সিস্টার বলেছেন, সীতা দ্রৌপদী ও হেলেন যেমন সশ্লিষ্ট 'আপরাধী'দের বিনাশের কারণ হয়েছেন, তেমনি সেই সূত্র ধরে এমন অনেক দীপ্ত পুরুষও শেষ হয়ে গেলেন—যাঁরা এই বিশ্বকে আরও অনেকভাবে সমৃদ্ধ করে যেতে পারতেন। উদাহরণ, রাবণ-পুত্র ইন্দ্রজিৎ, পিতামহ ভীষ্ম, ভাগ্যহীন কর্ণ, প্যারিসের জ্যেষ্ঠভ্রাতা হেক্টর। এমনও তো হতে পারেত এঁরা নিজেদের মানবিক ঐশ্বর্যের গুণে সম্পূর্ণ বিনষ্টির হাত থেকে রেহাই পেলেন। সেক্ষেত্রে অবশ্য তিনটি মহাকাব্যই ট্রাজেডির মাধুর্য হারাত। প্রতিপক্ষের কিছু কুশীলবকে যদি মহান অথবা সম্ভাবনাময় রূপে চিত্রিত না করা হয়, সংশ্লিষ্ট নায়করাই অনেকখানি লঘু হয়ে পড়বেন। তা ছাড়া তিন মহাকাব্যের মহাকবিরা হিন্দি-বাংলা সিরিয়ালের সীমাহীন অথচ অক্লেশ কাহিনি বনয়ে ব্রতী হননি—যেখানে ভিলেন মানেই আগাপাশতলা ভয়ঙ্কর চরিত্রের লোক—যাঁদের দৈবাৎও মানসিক গুনের উন্মেষ ঘটতে পারে না।

গ্রীকরা সংঘবদ্ধভাবে ট্রয় আক্রমণ করেছিল নিছক হেলেনকে গ্রীসের মাটিতে ফিরিয়ে আনবার জন্য নয়। তারা আদতে প্রচণ্ড অপমানিত বোধ করেছিল ট্রয়ের যুবরাজ প্যারিস হেলেনকে নিয়ে চম্পট দেওয়াতে। সত্যিই সেই দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের পিছনে আমরা যুগপৎ রাজনীতি ও অর্থনীতির সম্বন্ধযোগের চিহ্ন খুঁজে পাই। দ্বীপময় গ্রীসের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ট্রয়। ট্রয়ের ব্যাপক আর্থিক সমৃদ্ধি গ্রীকদের কাছে ছিল খুবই জ্বালাদায়ক। সামরিক শক্তিতে স্পার্টা ও সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধিতে এথেন্স বিশেষ গৌরবের স্থান অধিকার করে নিলেও প্রতিবেশী ট্রয় তাদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আজ হোক, কাল হোক, সংঘর্ষ-সংঘাত হতই। যেন পাথরে কোঁদা অপরূপা যক্ষিণী হেলেন হয়ে দাঁড়ালেন একটা উপলক্ষ্য মাত্র। রাজা মেনেনেউস কী জানতেন না, তাঁর বাণি হেলেন কী চরিত্রের মহিলা? যৌবনের সূচনা থেকেই হেলেন রূপবান ও বীর্যবান পুরুষের প্রতি লালায়িত। তিনি যখন একজনকে ত্যাগ করে অপর একজনের প্রতি অগ্রসর হন, তখন মনে হত পুরুষরা বুঝি তাঁর চিরুনিতে জড়িয়ে থাকা চূর্ণ কুন্তল মাত্র—যাদের অবজ্ঞাভরে দূরে নিক্ষেপ করাটা তাঁর কাছে সহজ কর্ম। যাঁর হাত ধরে তিনি পালালেন, সেই প্যারিসের প্রতি তাঁর আদৌ বুকভরা ভালবাসা ছিল না। প্যারিসেরও তা ছিল না হেলেনের প্রতি। সোজা কথায় দুরন্ত দৈহিক আকর্ষণই প্যারিস ও হেলেনকে তুলে আনে একটি পাটাতনের ওপর। এই আকর্ষণ কোনওদিন স্থায়ী ও মজবুত হয় না। রচনা করে না শক্তপোক্ত বন্ধন। হেলেনকে ট্রয়ের রাজপ্রাসাদে ঢুকিয়ে

বেদার পর প্যারিস আর তেমন খোঁজ-খবরও নিতেন না অপহৃতা গ্রীক রাণির। বাইরে চলছে যুদ্ধ ও হত্যার হুন দাপট। পরিষ্কার নিকানো অন্তঃপুরে জমাট বিষণ্ণতা। হেলেনের জীবনে তখন সবচেয়ে তিক্ত সময় বয়ে চলেছে। তাঁর ওই সময়ের সঙ্গে সীতার অশোককাননে অবস্থানের তুলনা চলে। কিন্তু সীতার অশোককাননে অবস্থানের মেয়াদ ছিল অনেক সংক্ষিপ্ত কালের। তাছাড়া সীতার মনে ছিল তাঁর স্বামী রামের প্রতি অনাবিল প্রেম ও স্মৃতি—যাদের তিনি সর্বক্ষণ সন্তর্পণে রক্ষা করতেন বলে চেরিদের কু-আলোচনা তাঁকে বিচলিত করতে পারেনি। কিন্তু হেলেনের বেলায় ব্যাপারটা ভিন্ন। তাঁর প্রেমে গভীরতা ও অনুভব দুটোই কম। অনুতাপও নেই বললে চলে। হেলেন যে ধরনের উদ্দামতার সঙ্গে আবাল্য ওতোপ্রোতভাবে জড়িত, যুদ্ধে দীর্ণ ট্রয়ের রাজপ্রাসাদের ঘেরাটোপে তার এমনই অভাব যে হেলেন তখন নিজেকে যেন এক কৃচ্ছসাধন-ক্লিষ্ট নারীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি তখন পাথরে কুঁদে-তোলা এক বন্দিনী রাজনন্দিনী। হেলেনের ওই বিষাদ ও নিঃসঙ্গতাকে তখন যিনি মমত্বের সঙ্গে অনুভব করতে পেরেছিলেন, তিনি যুবরাজ প্যারিসেরই জ্যেষ্ঠভ্রাতা হেক্টর। হেক্টর মহাবীর। রণক্ষেত্রে তিনি অনন্য। আবার তাঁরই হৃদয়ের আঙরাখায় ঢাকা রয়েছে মমত্ব, সহানুভূতি, সহমর্মীত্ব। হেলেন সেই ঐশ্বর্যের স্বাদ পেয়েছিলেন। হেক্টরের নীতিবিচার দৃঢ় ছিল ঠিকই, তবুও এক দুঃখিনী নারীর প্রতি সহানুভূতির ছেদহীন প্রবাহ মনের অগ্রভাগে প্রেমের বীজকে সহজেই পৌঁছে দিতে সক্ষম। প্রেম ও সহানুভূতির মধ্যকার দূরত্ব সর্বদাই খুব কম। তবে সেই সহানুভূতি ও পরাপরের প্রতি আচ্ছন্নতা যে শেষাবধি কামাসক্ত আলিঙ্গনে রূপান্তরিত হয়নি—এটা হোমারের লেখা থেকে স্পষ্ট।

হেলেনের ভাগ্যে জুটেছে প্রচুর ধিক্কার, গালিগালাজ. ট্রয়ের সমস্ত নর-নারী বার বার অভিশাপ দিয়েছে তাঁকে। এই ধরনের গণধিক্কার কুত্রাপি দ্রৌপদী ও সীতার প্রতি বর্ষিত হয়নি।

ই. ভি. রিউ, যিনি 'ইলিয়াড'-কে ইংরেজিতে অনুবাদও করেন, লিখেছেন ঃ

Homer paints a potgnant lonely picture of Helen in Troy. She is filled with self-distaste and regret for what she has caused by the end of the war, the Trojans have come to hate her. When Hector dies in the war, she is the third mourner at his

funcral, and she says that, of all the Trojans, Hector and priam alone were always kind to her.—'wherefore I will alike for thee and for my helpless self with grief at heart, for no longer have I anyone beside in broad Troy that is gentle to me or kind, but all men shuddeer at me.'

প্রাসাদের শীর্ষে দাঁড়িয়ে নিঃসঙ্গ হেলেন দেখেছেন, অদূরে সমুদ্রবক্ষে রয়েছে বহু উদ্ধত গ্রীক যুদ্ধজাহাজ। ছোট ছোট আলো ছিনিমিনি খেলছে নোনা জলের সংসারে। গ্রীকদের সম্মানবোধ কী মানুষের ক্ষুৎপিপাসার তীব্রতার চেয়েও বেশি ? নাকি এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে আরও অনেক বড় স্বার্থ ও কূটনীতি ? হেলেনের সুদীর্ঘ জীবনে একনিষ্ঠ প্রেম বলতে যা বেঝায়, তা কিন্তু নেই। তিনি কোচোয়ানের মতন ছিপটি ঘুরিয়ে চালনা করেছেন বহু পুরুষকে। এই বিষয়ে সীতা তো বটেই, দ্রৌপদীও হেলেনের নিকট পরাজিত। স্বামীদের নিয়ে বনবাসকালে দ্রৌপদী যথেষ্টই কষ্ট করেছেন। তিনি স্বয়ং অগ্নিকন্যা। আর তাঁর অন্তরেও দাউ দাউ করে জ্বলছিল প্রতিশোধের আগুন—যে আগুনের অমোঘ পরিণতি কুরুক্ষেত্র মহাসমর।

তিন রমণীর কারণে তিনটি মহাযুদ্ধ। তিন রমণীর মধ্যে সীতা যেন সর্বাধিক কল্যাণময়ী। দ্রৌপদীর আচরণে যত ফিকিরের সন্ধান মেলে, সীতার তো তা নেই। হেলেনের কথা তো বারবারই বলা হল। সীতার ত্যাগ ও দুর্ভাগ্যের সঙ্গে অন্য কারুর তুলনা হয় না। ওই বেদনার কথা বলতে গেলে গলার স্বর আজও নেমে আসে।

মিল খুঁজে পাই তিন নারীর জন্য ধ্বংসপ্রাপ্ত তিন বিরাট শক্তির পতনে। এ রকম সাদৃশ্য ক্বচিৎ অন্যত্র লক্ষণীয়। রাবণ যখন তাঁর অনন্য বীরপুত্র ইন্দ্রজিৎকে হারালেন, আমরাই বেদনায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি। দুর্যোধনের দর্প চূর্ণ আমাদের মনে শীতল প্রলেপ দিলেও হতভাগ্য কর্ণের রথের চাকাকে যখন মেদিনি গ্রাস করেছে, অমোঘ ভবিতব্যের দিব্য আঁধার ও এক অসহনীয় পরিণতির অনিবার্যতা আমাদের অন্তরাত্মাকে রক্তাক্ত করে তোলে। যে ভাবে রণক্ষেত্রে বীর হেক্টরকে খুন করা হল, যে অন্যায় কৌশলে তামাদি হয়ে গেলে ট্রয়ের সুদীর্ঘ বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ লড়াই, আমরা কী তা চেয়েছিলাম ? চাইনি। তবে প্রথমাবধি অনতিদূরস্থ সর্বনাশের চ্ছটা দেখতে পেয়েছি।

যুবরাজ প্যারিস যখন পরস্ত্রী হেলেনকে অপহরণ করে নিয়ে এলেন, ট্রয়ের বিবেচক মানুষরা যে সর্বনাশের বহ্নির প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন নি, তা

নয়। রাজমাতা রুক্ষ বিষণ্ণকায়া হয়ে উঠেছেন। অঢেল প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। তথাপি হেলেনকে তাঁরা পথে নামিয়ে দেননি।

সীতাকে যখন অপহরণ করে রাবণ লঙ্কায় নিয়ে এলেন, রাবণের স্ত্রী মন্দাধরী অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, এবার সর্বনাশ অনিবার্য। রাবণ এতকাল বহু অনাচার অত্যাচার করেও পার পেয়ে গেছেন, কপিলমুনি তাঁকে প্রচণ্ড প্রহার করেছিলেন, কপিবীর বালি তাঁকে লেজের সঙ্গে বেঁধে সাত সমুদ্রের নোনা জল খাইয়েছিলেন। তবুও লঙ্কেশ্বরের সার্বিক বিনাশ যেমন ঘটেনি, তেমনি তাঁর চৈতন্যেরও উদয় ঘটেনি। কিন্তু রাবণ যখন পরস্ত্রীকে অপহরণ করে এনেছেন, তখন তাঁর পাপ ষোলকলায় পূর্ণ হল। মন্দাধরী শিউরে উঠলেন। তিনি বুঝেছিলেন, এবার আর রক্ষা নেই।

দ্রৌপদীর ডাগর দেহ জুড়ে যে অসহনীয় সৌন্দর্য, সেটাই যেন অভিশাপস্বরূপ নেমে এসেছিল কুরুবংশের ওপর। দ্রৌপদীকে না পাবার একটা জ্বালা দুর্যোধনের ছিলই। তদুপরি দ্রৌপদী কর্তৃক অপমানিত হবার স্মৃতি যেন ভারী শিলনোড়ার ন্যায় বারবার তাঁকে আঘাত করত।

তাই প্রথম সুযোগেই দ্রৌপদীকে তিনি চূড়ান্ত হেনস্থা করতে চাইলেন। আমার এক অবসরপ্রাপ্ত বিচারক বন্ধু জাস্টিস কৃষ্ণকিশোর বক্সি কিন্তু বললেন, 'দ্রৌপদীর ওপর কাম চরিতার্থ করতে দুর্যোধন তেমন লালায়িত ছিলেন বলে মনে হয় না। তা হলে তো দ্রৌপদীকে টেনে নিয়ে যেতে পারতেন কোনও একটি নিভৃতকক্ষে। দুর্যোধনের মনের মধ্যে জ্বলছিল অপমানিত হবার জ্বালা। সেই অপমানের চূড়ান্ত বদলা নিতে তিনি রাজ্যের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সামনে উলঙ্গ করে দ্রৌপদীকে ঘোরাতে চেয়েছিলেন। এইরূপ অপমানের তীক্ষ্ণতা ধর্ষণের চেয়ে অধিক। আজও দেখবেন, অন্ত্যজদের মধ্যে এইরকম শাস্তি দেবার প্রথা বিদ্যমান। যে মহিলা অপরাধিনী রূপে সাব্যস্থ, তাঁকে উলঙ্গ করে সর্বজনের সম্মুখে নিয়ে যাওয়া হয়। একজন নারীর নিকট এটা ধর্ষিতা হবার চাইতেও গ্লানিদায়ক। দুর্যোধন তা জানতেন। তাই—'

জাস্টিস বক্সির ব্যাখ্যা ফেলনা নয়।

আর সেদিন যে সমস্ত বীরপুরুষগণ রাজসভা আলো করে বসেছিলেন, তাঁদের কাছে নগ্নিকা দ্রৌপদীকে পেশ করবার মধ্যে ব্যতিক্রমী পৈশাচিক উল্লাসের সম্ভাবনা ছিল বিলক্ষণ। শ্বশুর ধৃতরাষ্ট্র অবশ্য দৃষ্টিহীন। কিন্তু ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, শকুনি প্রমুখ সম্পর্কে অতিমান্য, বয়সে বৃদ্ধ, কিন্তু তখনও পুরুষোচিত শক্তিতে ভরপূর ব্যক্তিদের দৃষ্টির সন্মুকে নগ্নিকা অবস্থায় দাঁড়াবার

কথা চিন্তা করাবার চাইতে প্রাণত্যাগ করা ছিল দ্রৌপদীর নিকট অধিকতর শ্রেয়।

ইত্যাকার স্বনামধন্য ব্যক্তিত্বদের সেই ক্ষণে নীতিবোধ ও মর্মবেদনা ছিল অতীব ক্ষীণ। একটি হাতও মুষ্ঠিবদ্ধ হয়নি। হয়তো সেই বিগত যৌবনদের এক-আধজনের মধ্যে কৌতূহলের তীব্রতা ছিল—যে কৌতূহলে থাকে যুগপৎ কামনার রঙ ও ক্ষয়িষ্ণুতা।

আরও লক্ষণীয়, সেই রাজসভায় দুর্যোধনের বান্ধব কর্ণও উপস্থিত ছিলেন। ততদিনে কর্ণ জেনে গেছেন, তিনি আসলে ষষ্ঠপাণ্ডব।

দ্রৌপদীও কর্ণের পরিচয় জ্ঞাত হবার পর মনে মনে কর্ণকেও প্রিয় পুরুষরূপে কল্পনা করেছিলেন। সুতরাং বস্ত্রহরণ পর্বে কর্ণ-দ্রৌপদী কেন্দ্রীক মানসিক টানাপোড়েন কল্পনার বস্তু হয়ে ওঠে। এককথায় সেদিন রাজসভায় উপস্থিত প্রতিটি পুরুষের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ মদত কিংবা অনুমোদন ছিল দ্রৌপদীকে নগ্ন করবার প্রয়াসের পশ্চাতে। তাই কুরুক্ষেত্র মহাসমরে তাঁরা প্রত্যেকে পৃথক পৃথকভাবে শাস্তি পেয়েছেন।

কিন্তু ট্রয়ের যুদ্ধে যাঁরা নির্মমভাবে নিহত হলেন, তাঁদের বিপুল অংশেরই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দায়িত্ব ছিল না হেলেন অপহরণের পশ্চাতে। বরং তা প্রমাণ করে যে কোনও রাষ্ট্রে যখন বৃহৎ বৃহৎ পাপাচার অনুষ্ঠিত হতে থাকে, তার বিষময় প্রভাবে শেষ হয়ে যান উক্ত রাষ্ট্রের অজস্র নিরপরাধ নাগরিক। হিটলারের দম্ভ ও আকাঙ্খার বলি হয়েছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। স্ট্যালিনের সন্দেহবাতিকতায় বলি হয়েছেন কত সম্ভাবনাময় ব্যক্তিত্ব। তেজোর আত্মগৌরবের পরিণতি হিরোসিমা-নাগাসাকি। ভারতে দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনৈতিক নেতাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদতে কয়েক লক্ষ কোটি টাকা পাচার হয়ে গেল সুইসব্যাঙ্কে ; আর তার প্রভাবে এখনও ভারতীয় অর্থনীতি রুগ্ন, রক্তশূন্য।

প্যারিসের হঠকারিতা ও হেলেনের স্বৈরিনীসুলভ আচরণ জন্ম দিল গ্রীকদের প্রচণ্ড জাত্যাভিমান ও প্রতেশোধস্পৃহা—যা ট্রয়কে ভগ্নস্তূপে পরিণত করে।

ট্রয়ের শিল্পগরিমার নিদর্শন কলঙ্ক রাজপ্রাসাদ এক দশক ব্যাপি যুদ্ধের পরিণামে ভেঙ্গে চৌচির হয়ে যায়। যুদ্ধের প্রথম দিকে যে মৃদু বিষাদ ও গঞ্জনা ছিল, ক্রমে তা হৃদয় বিদারক আর্তনাদে রূপান্তরিত। সেই মর্মবেদনার বিস্তারিত বিবরণ দেবার কালে কবি হোমারের কলমও যেন অবশ হয়ে পড়ে।

ইমেনমাকা নামক যে সৌধ ছিল ট্রয়ের গৌরব, যুদ্ধদানব তাকে গ্রাস করে। প্রায়ামের পঞ্চাশটি পুত্রের সকলেই একে একে প্রাণ দিলেন রণক্ষেত্রে। প্রায় প্রতিটি হত্যা অনৈতিক। শিরা-উপশিরা ফুলিয়ে উল্লাস জানায় হানাদাররা। পাশবিক ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হল মহাবীর হেক্টর যখন বধ হলেন। গ্রীক রণতরীর একজন ন্যালা 'হ্যাবলা' খালাসীও হাত-পা ছুঁড়ে নাচতে থাকে। পরস্ত্রীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক যে কতদূর ধ্বংসাত্মক হয়ে উঠতে পারে, তার সম্যক উপলব্ধি হয়েছিল ট্রয় যুদ্ধের প্রতিটি দিনে। রাণি হেকাবি ও হেক্টরের স্ত্রী অ্যান্ড্রোমাচাকে যখন যুদ্ধজয়ী গ্রীকরা হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, মহাকাব্যের তাবৎ পাঠকরাও শোকসন্তপ্ত হয়ে পড়েন। ওই দুই অত্যন্ত মাননীয়াকে গ্রীকরা নিয়ে যাচ্ছে ক্রীতদাসী করবে বলে। এ কেবল দাসীবৃত্তি করা নয়, নিজের সর্বস্বকেই অপরের হাতে তুলে দেওয়া। দুই ভিন্ন বয়সী রমণী তখন পাথরের মতন আড়ষ্ট ও বাক্যহারা।

বেদনা ও ভয়াবহতা কেবল ট্রয়ের শিবিরে পরিদৃশ্যমান নয়। যুদ্ধের প্রথম থেকে শুরু করে মধ্যভাগ অবধি গ্রীকদের শিবিরেও শ্রুত হত নিত্য হাহাকার।

তাঁরা সকলে এসেছিলেন স্বজন-পরিজনকে ছেড়ে এক মহা শক্তিশালী রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে লড়াই করতে। সাফল্যের দ্যুতি উদয় হয়েই উধাও হয় বার বার। নিহত হলেন অ্যাচিলসের মতন বড় বীর। তিনি একসময় হেলেনের পানিপ্রার্থী হয়েছিলেন। কিন্তু সয়ম্বরসভার তৎকালেই তিনি ক্ষীণভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, হেলেনকে সামনে রেখে এক লোকঠকানো জাঁক দেখানো হচ্ছে মাত্র।

হেলেনকে নিয়ে প্যারিসের চম্পট দেবার ঘটনা চাউর হবার পর অ্যাচিলেস মোটেই আকাশ থেকে পড়েনি। হেলেনের যা স্বভাব-চরিত্র, তাতে এ রকম ঘটনা যথেষ্ট মানানসই। কিন্তু ঘটনার পশ্চাতে যা-ই থাকুক না কেন, জাত্যাভিমানের বহ্নিকে চেপে রাখা যায়নি। শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ ট্রয় বরাবর গ্রীসের চক্ষুশূল। সুতরাং ট্রয় ধ্বংসে সামিল হতে ছুটে এলেন অ্যাচিলেসও।

গ্রীকদের হানাদারির সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িত মৃত্যু ও বিচ্ছেদ বেদনাও। কিংবা যেন যুগপৎ মারতে ও মরতে উগ্রবীর হয়েই ছিলেন পক্ষের সকল বীরই। যুদ্ধ সর্বদা সৃষ্টির সঙ্গে সম্বন্ধহীন। তবুও ইতিহাসের অগ্রগতি ঘটে যে এক-একটা উচ্চলম্ফনে, হাতেনাতে প্রমাণিত যুদ্ধ তাদেরই একটি। যুদ্ধ কখনও সন্তর্পনে আসে না। আবার যুদ্ধের পশ্চাতে যথার্থ ন্যায়কে অঙ্কুরিত হতে দেখাটাও একরকম বাড়াবাড়ি। যদি ন্যায়ই শেষ কথা হয়, তা হলে

রাম কেন বালীকে অন্যায়ভাবে বধ করবেন? কেন অভিমন্যুকে এমন মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুবরণ করতে হল? বিশ্লেষণের গভীরে যত ডুব দেবেন, আশ্চর্যান্বিত হবার উপাদান ততই এসে যাবে। তখনই মনে হয় ন্যায়-নীতি নিয়ে এমত কাঙালপনা দেখানো ও কাতোরক্তি শোনানো তথা আকুল হয়ে ভাবতে বসাটা অনুচিত। কারণ, এই মহাকাব্যগুলি আসলে অমেয় শক্তিমান কবিদের কালজয়ী সৃষ্টি। সেখানে বীররস ও করুণরসের সমমিশেল রয়েছে কিনা, তা নির্ণয়ের বৃহৎ দায়িত্ব অনস্বীকার্য।

গ্রীকপক্ষের এক মহাবীর পেট্রোক্লাসের মৃত্যুও কম মর্মভেদী ঘটনা নয়। মারা গেলেন সংখ্যাতীত গ্রীক সেনা ও যুদ্ধের একটা পর্যায়ে তো মনে হয়েছিল, যুদ্ধের রাশ আর গ্রীক মহাবীরদের আয়ত্তাধীনে নেই। কেবল যুদ্ধ নয়, সমানতালে চলছিল এমন সমস্ত ষড়যন্ত, যাদের বিবরণকে কোনও ক্রমে ধান ভানতে শিবের গীত বলা চলে না। ওই মহারণের সময়েই ভিক্টর অগমেমন প্রাণ হারালেন হারেমে তাঁর স্ত্রী ক্লাইট্রেমনেস্তার ষড়যন্ত্রে। ক্লাইট্রেমনেস্তা কে? তিনি আবার স্বয়ং হেলেনের ভগ্নী।

ন্যায় ও বিধি মানতে নারাজ, এরকম সকলেরই যে বিনাশ ঘটেছে, এ কথা বলা যাবে না। অন্যায় করেও অনেকে পার পেয়েছেন ; আবার অনেক নিরপরাধ ঘটনার বৃত্তে অনুবৃত্তে শেষ হয়ে গেছেন। অভিমন্যুর মৃত্যুসংবাদ পাবার পর শুভদ্রার যে হাহাকার, তা প্রকৃতই ছ্যাঁকা দিয়ে যায় সংবেদনশীল পাঠককে। তখন মনে হয় 'যথা ধর্ম, তথা জয়'—এই বাণীটিও সর্বোৎকৃষ্ট নয় এবং এখানেও রয়েছে নিষ্ফল বীজের বপন। আসলে একটা বিশাল কর্মপর্বে ন্যায় ও অন্যায় উভয়ই পারস্পরিক সংঘাতে রক্তাক্ত হয়ে থাকে। কোনও মহতের সাময়িক স্খলন কষায় ঠেকলেও তাকে স্বীকার করে নিতে হবে। কে কতটা মহৎ, কার ভিতর কতখানি দেবত্ব পরিস্ফুট—এই নিয়ে যদি জল মাপতে বসেন, তা হলে আপনি কোথাও ধর্মের পরিচ্ছন্ন নিষ্কন্টক অবয়ব দেখতে পাবেন না। সোনায় যেমন খাত থাকে, তেমনি প্রতিটি চরিত্রেই থাকে ভালো-মন্দের মিশেল। কাউকেই অতি মন্দ আখ্যা দিয়ে ভোকাট্টা করে দিতে পারেন না। মহাকাব্যের অসাধারণ স্রষ্টারা তাই কখনও একেবারে মসৃণ পথ ধরে নিজেদের কাহিনিকে প্রসারিত করেন নি। ঘটনার ঘনঘটা যেমন আছে, তেমনি রয়েছে একই চরিত্রের মধ্যে ভালো ও মন্দের টালমাটাল পরিস্থিতি।

বিস্ময়ের যা কারণ, তা হল তিনটি মহাকাব্যের কাহিনিবনয়ে ও তিন নারীর প্রভাবে তিনিটি মহাশক্তির বিনাশে অদ্ভুত সাদৃশ্য। অথচ, তিনটি

মহাকাব্যেরই রচয়িতারা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিত্ব এবং মহাকালের ইতিহাসে তিনটি পৃথক সময়ে তাঁদের আবির্ভাব। কী ভাবে এটা সম্ভব হল, তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে আজও সমান বিস্ময়। তিন মহাকাব্যকে বিশ্লেষণ করতে বসে প্রফেসর আর অ্যান্টনি তাঁর 'Rama and the Bards' গ্রন্থে শেষাবধি লিকলেন,

There can be little doubt that in some way the destinies of these three women—Sita, Draupadi and Helen—, so different in their geographical and social settings, are closely linked in some far-off deeply held conviction of the race that the gods were determined to destory martial prowess on the earth. These women are the instruments of this annihilation in their three distinctive cultures : Indian, Graeco-Trojan and Gaelic.

The reason for this hostility between the gods and heroes is outside the scope of this study. That there is here some transcendent order to which the human reality is subordinated there can be no doubt and this pattern which transcends human judgement and values is at the core of the epic-vision.'

তিন মহাকাব্যের সাদৃশ্য দেখে মনে হবে যেন প্রায় একই সময়বৃত্তে অবস্থানরত তিন অর্ন্তদৃষ্টিসম্পন্ন মহাকবি নিজ নিজ কাব্যরচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। তিন কবিরই মানসভূবনে এমন তিন রমণী—যাঁরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মদগর্বী পুরুষের দাপট ও গৌরবকে হয় ক্ষুণ্ণ করবেন নতুবা চূর্ণ করবেন। কিন্তু প্রথমাবধি নারীর চরিত্র ও কার্যাবলী যে সম্পূর্ণ পৃথক এবং কোনও বিচারেই একজন অপরজনের গুনাবলীর সত্বাধিকারিণী হননি, তা আমি বার বার উল্লেখ করেছি। সীতার পতিপ্রেম যে উচ্চতায় উন্মোচিত, সেই নিঃশর্ত শুদ্ধতা দ্রৌপদীর নিকট অপরিহরণীয় হয়ে ওঠেনি কবির কোনও মূর্ত বা বিমূর্ত নির্মাণে। কিন্তু তাই বলে কোনও রসগ্রাহী যদি দ্রৌপদীকে হেলেনের পাশে এনে দাঁড় করাতে চান, সেটা হবে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। অপপ্রভাব সৃষ্টি করাতে হেলেন অনেকদূর এগিয়ে। প্রেম, লালসা, কামপূর্তি ইত্যাদির খেলায় হেলেন তো বহুবর্ণ ছলাকলা দেখিয়েছেন। সীতা ও দ্রৌপদীর মতন প্রতিশোধস্পৃহার বারুদ তিনি সংগ্রহ করবেন কেন ও কোথা থেকে?

প্রসঙ্গক্রমে আমরা চলে যেতে পারি মহাভারতের উদ্যোগপর্বে। সেখানে আমরা দেখছি যে পাঁচ ভাই একত্রিত হয়ে বসেছেন কৃষ্ণের সন্মুখে। অদূরে

বিপুল সংগ্রামের পটভূমি প্রস্তুত। যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে আর কালক্ষয় অনুচিত। সেই সময়ও জ্যেষ্ঠপাণ্ডব যুধিষ্ঠির যুদ্ধের দিকে নিষেধের তর্জনী তুলতে পারলেই অধিক স্বস্তি পাবেন। অর্জুনও দ্বিধা জড়িত। একমাত্র ভীম রাগে ফুটছেন। অধিকাংশ পাণ্ডব কৃষ্ণের কাছে যেন আবেদন রাখছেন, 'আপনি একটু বিবেচনা করে দেখুন, কোনওভাবে যুদ্ধ এড়ানো যায় কি না? হয়তো এখনও চেষ্টা করলে ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্যোধনের সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসা যায়।'

চিন্তিত কৃষ্ণ বললেন, 'সমঝোতায় আসাটা খুব কঠিন। তবে, একেবারে অসম্ভব নয়। আমি চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

ঠিক সেই মুহূর্তে সেখানে প্রবেশ করলেন দ্রৌপদী। তাঁর দুই চক্ষুতে যুগপৎ আর্তি ও অগ্নি। কৃষ্ণের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে আছেন রুক্ষ দৃষ্টিতে, কোথায় হারিয়ে গেছে তাঁর ভিনটেজ ওয়াইনসম কমনীয়তা। তারপর হুড়মুড় করে মুখ থেকে বেরিয়ে এল প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ ও অসহিষ্ণু বাক্যস্রোত, 'এ আপনারা কী ধরনের শলাপরামর্শ করছেন! মধুসূদন আপনিও যে অমন নরম হয়ে যেতে পারেন, বিশ্বাস করা মুশকিল। দুর্যোধনের জঘন্য আচরণের কথা মনে এলে আমার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। এত অপমান, অত্যাচারের পরও সেই দুর্যোধনের কাছে পঞ্চপাণ্ডব যখন মাত্র পাঁচখানা গ্রাম দাবি করল, দাম্ভিক ও ততোধিক শয়তান দুর্যোধন জানাল, সূচাগ্র মেদিনীও সে পাণ্ডবদের দেবে না বিনা যুদ্ধে! আর এখানে আপনারা এখনও সেই বাঁকা শিং মোষের মতন লোকটার সঙ্গে সমঝোতা স্থাপনের কথা ভাবতে পারছেন! মধুসূদন, আমার প্রতি, আমার স্বামীদের প্রতি আপনার স্নেহ ও প্রীতি জগদ্বিখ্যাত। সেই আপনার নিকট আমার আর্তি—সন্ধি নয়, ক্ষমা নয়, আত্মীয়তার প্রশ্নও নয়; সম্পর্ক এখানে শত্রুতার। ভয়ঙ্কর শত্রুতা—যেখানে যুদ্ধ অবধারিত। আমি নারী হলেও সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধের জন্য আমার দেহের রক্ত চনমনিয়ে উঠছে। হৃদয় ফালা-ফালা হয়ে যায় নিজের সেই ইজ্জত হারাবার কথা স্মরণে এলে। প্রতিশোধ নেওয়া ছাড়া অন্য কোনও পন্থার কথা মনে আনবেন না। এই যুদ্ধের মধ্যেই থাকবে ন্যায়ের স্থাপত্য। থাকবে ক্ষত্রিয়দের কল্যাণ।'

দ্রৌপদী তখন বুঝি একচক্ষু নাগিনী। কুরুবংশের সমূল বিনাশ ব্যতীত অন্য কিছু ভাবতে পারছেন না। কৃষ্ণ কিন্তু খুশি। তাঁর নিশানাতে এই পাঞ্চালীই ছিলেন। এঁরই মানসিক ঘনিষ্ঠতা তিনি পেয়েছেন। কৃষ্ণ তাঁর কূটনীতি ও

পারদর্শিতার সাফল্যকেই প্রত্যক্ষ করছেন ক্রোধে অগ্নিশর্মা দ্রৌপদীর মধ্যে। দ্রৌপদীর মুখ থেকে সমানে বেরিয়ে আসছিল আক্রোশপ্রসূত বিবিধ কটক্তি। দ্রৌপদী একথাও বললেন, '... আপনি যদি ওই সময় ত্রাতারূপে আবির্ভূত না হতেন, কী অবস্থা হত শেষ অবধি আমার ? দুঃশাসন আমার চুল ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে রাজসভায় নিয়ে এল। দুর্যোধন তার উন্মুক্ত উরু দেখিয়ে আমাকে সেখানে এনে স্থাপিত করতে চাইল। এর অর্থ প্রত্যেক নারী ও পুরুষ বোঝে। তারপর সকলের দৃষ্টির সামনে—পিতৃসম বৃদ্ধদের দৃষ্টির সামনেও—আমাকে নগ্ন করবার কী উল্লাসঘন প্রয়াস !

আমার পঞ্চস্বামী সেদিন নিষ্প্রাণ পুতুল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ! আজও যদি সেই অর্জুন, সেই ভীম দুর্যোধন-দুঃশাসনের সঙ্গে সন্ধি করবার উদ্যোগ নেয়, আমি আমার বৃদ্ধ পিতার আশ্রয়ে চলে যাব। আমার ভ্রাতারা তখন তাঁদের ভগ্নীর লাঞ্ছনার বিহিত করতে কৌরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন। পাণ্ডবরা নিজেদের ক্লিব প্রমাণিত করতে দর্শকের ভূমিকা পালন করে যাক।... গত তেরো বছর ধরে আমি আমার এই ভেতরের আগুনকে জ্বালিয়ে রেখেছি। আজ ভীমের মতন শক্ত মনের মানুষ শান্তি স্থাপনের কথা বলছে দেখে আমি বিস্ময়ে পাথর হয়ে যেতে চাই...'।

দ্রৌপদীর এই আক্রমণাত্মক রূপকে উপেক্ষা করবার সাধ্য কারুর ছিল না। আহত বাঘিনীর মতন দ্রৌপদীর সেই তেজ অনিবার্য করে তোলে কুরুক্ষেত্রের মহাসমরকে।

কৃষ্ণ কথা দিলেন, 'পাঞ্চালি, তোমার সঙ্গে যারা যারা কুৎসিত অমানবিক কাজ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে করেছে, তাদের সকলের বিনাশ ঘটবে। আবার এত বড় একটা ঘটনা ঘটে যাবার পর কেউই কিন্তু নির্ঝঞ্ঝাটে জীবনের বাকি দিনগুলি কাটাতে পারবে না।

পাণ্ডবজননী কুন্তিও চেয়েছিলেন, যুদ্ধ হোক। আরোপিত নয়, প্রকৃতই বহু দোষ ও অপরাধের ভারবাহী দুর্যোধনের বিনাশ একান্ত কাম্য। তবে কুন্তি দ্রৌপদীর মতন অমন অগ্নিবর্ষী হয়ে ওঠেন নি। সীতা রাবণবধের জন্য রামকে উত্তেজিত করবার সুযোগ পান নি। সুযোগ পেলেও দ্রৌপদীর ন্যায় মরিয়া হয়ে উঠতেন কি না, সন্দেহ। বিশেষত দ্রৌপদী যে ভাষায় তাঁর স্বামীদেরও ধিক্কার দিয়েছেন সীতার মুখ থেকে তার একাংশও নির্গত হত না নিশ্চিত। রাবণ তাঁকে অপহরণ করেছেন—এই ভাবনাটাই সীতাকে বড় দুর্বল করে রেখেছিল, যদিও সেই ঘটনার পিছনে তাঁর বিবেকবোধের পীড়িত হবার যুক্তিসম্মত কোনও কারণই ছিল না।

আর হেলেন ?

তাঁর সেই অধিকারই থাকবার কথা নয়। ট্রয়ের প্রতি ভ্রূকুটি হানার কোনও যুক্তি তাঁর কাছে নেই। যদি যুদ্ধে ট্রয়ের জয় হত, তাদের প্রতিরক্ষা কাঠামোকে গ্রীকরা চূর্ণ করতে না পারত, হেলেনের মনে ক্ষত সৃষ্টি হবার হেতুও খুঁজে পাওয়া যেত না।

শ্রীরামের প্রতি সীতার অনুরাগ, ইজ্জত হারাবার জন্য দ্রৌপদীর ক্ষোভ ও উষ্ণতা হেলেনের অন্তরে অলভ্যা। তাঁর যা সৃষ্টি হয়েছিল, সেটা হল একাকীত্ব। হেলেন যখন দেখলেন, যাঁর সঙ্গে তিনি পালিয়ে এসেছেন সেই প্যারিসের আর তাঁর প্রতি তেমন অনুরাগ নেই, তাঁর অন্তর হাহাকারে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। হেলেন দণ্ড এভাবেই পেলেন।

গ্রীকদের ছিল দুরন্ত জাত্যাভিমান ও ট্রয়ের প্রতি বিপুল ঈর্ষা। হেলেন অপহরণ একটা উপলক্ষ মাত্র। দুরন্ত ও উন্নত ট্রয়ের সঙ্গে আজ হোক, কাল হোক, যুদ্ধ লাগতই। যুদ্ধের প্রথম পর্বে হেলেন কিন্তু বহুবার চেষ্টা করেছেন প্যারিসকে রণক্ষেত্রে পাঠাতে। তিনি অন্তত দেখতে চেয়েছিলেন, যার আকর্ষণে তিনি ঘর-সংসার ছেড়ে পালালেন, সেই মানুষটি যথেষ্ট সাহসী ও বীর।

কিন্তু হেলেনের কাছ থেকে প্রেরণা নিতে প্যারিস তখন নারাজ। তাঁর আরও কিছু চারিত্রিক দুর্বলতা প্রত্যক্ষ করলেন হেলেন। শেষের দিকে হেলেন প্যারিসকে ঘৃণা করতে শুরু করেন তাঁর কাপুরুষতার জন্য।

She had shame for the cowardice of Paris.

সেই সময় হেলেনের একক উপলব্ধি—হায়, রমণচরিতার্থতা ছাড়া আমার আর কিছু কী পাওনা ছিল না ট্রোজান রাজপুত্র প্যারিসের কাছ থেকে ? এই ধরনের অত্যন্ত স্থূল প্রত্যাশা নিয়ে একটি নারী কী তার জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারে ? জীবনকে সার্থকতায় স্থাপিত করতে গেলে যে পটভূমিকা রচনার দরকার, নিজ দোষে হেলেন তা নষ্ট করেন। ফলে হতাশা ও গ্লানি কণ্টাকিত পরিণতির পথে অগ্রগতি, যদিও কুশলী কবি আপন প্রতিভাবলে পাঠকের কৌতূহল ও আগ্রহের বৃত্তটিকে আকর্ষণীয় রাখতে পেরেছেন শেষ পংক্তি অবধি।

হেলেনের তৎকালীন উন্মোচনে এসে যাচ্ছে তাঁর স্বামী—যে স্বামীকে তিনি ত্যাগ করে এসেছেন। সেই স্বামী বীর, জাতির যশ ও কীর্তি যাঁর স্কন্ধের ওপর রক্ষিত।

হেলেন ওই সময় সুস্থ, সন্দর পারিবারিক জীবন যে কেমন ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠতে পারে, তা অনুভব করতে পারছেন প্যারিসের দাদা হেক্টর ও তাঁর স্ত্রী অ্যানড্রোম্যাচিকে দেখে। তাঁদের একটিমাত্র সন্তান। পুত্র সন্তান। বয়সে শিশু। অ্যানড্রোম্যাচি তাঁকে কোলে নিয়ে প্রাসাদ ছেড়ে নেমে এলেন পথে। এই পথ সোজা চলে গেছে রণক্ষেত্রের দিকে। আজকের যুদ্ধে ট্রয়ের সেনাপতি হেক্টর। স্বামীকে একবার বিদায় দেবার পরও অ্যানড্রোম্যাচি শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে আবার ছুটে বেরিয়ে এসেছেন দুর্গবৎ প্রাসাদ থেকে। কারণ তাঁর অন্তরে তখন বিপুল আলোড়ন—হেক্টর বোধহয় আর ফিরে আসবেন না। কবি এখানে পাকা জহুরী। কাহিনীর কোন অংশ পাঠককে সম্মোহিত করে রাখে, তা তিনি বোঝেন। মানুষের মনে স্থায়ী ছাপ রাখে ট্র্যাজেডি। এবং ট্র্যাজিক হিরোই আসল হিরো। হেক্টর পিছন ফিরে দেখলেন, শিশুপুত্র ক্রোড়ে ব্যাকুলচিত্তে অ্যানড্রোম্যাচি প্রায় ছুটে আসছেন তাঁর দিকে। সকলেই যেন অনুভব করতে পারছেন, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে এটাই অন্তিম সাক্ষাৎ। শিশুপুত্রও বুঝি বুঝতে পারছে, তার বীর বাবা আর ফিরে আসবেন না। কোনও এক অদৃশ্য পুরুষের বিশাল চক্ষু থেকে দু'ফোঁটা হিরের জল গড়িয়ে নামছে যেন।

অনুরূপ অবচেতন স্পর্শ ছিল মহাভারতে—যখন তরুণ অভিমন্যু রণক্ষেত্রে অগ্রসর হবার পূর্বে বিদায় নিতে এসেছেন তাঁর তরুণী ভার্যা উত্তরার নিকট। সেই যে আশঙ্কা, সেই যে বেদনা, তা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দেয় অন্য সমস্ত অনুভূতিকে। পাঠকের অন্তরাত্মায় ঘনিয়ে ওঠে অশ্রুত হাহাকারে। এই যে বেদনাবোধ, সেটাই ধুইয়ে দেয় আমাদের ক্লেদ, বিস্তর বর্জ্যপদার্থ এবং পাপ।

যখন অশ্বত্থমার হাতে দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র নিহত হল এবং অশ্বত্থমার রক্তাক্ত হস্তে সেই পাঁচটি শিশুর মুণ্ড দেখতে পেলেন উরুভঙ্গ দুর্যোধন, তখন দুর্যোধনের মতন কঠিন হৃদয় প্রতিশোধস্পৃহ ব্যক্তিও যে ভাবে বুকফাটা হাহাকারে নিজেকে চূর্ণ করতে চান, তার চেয়ে বড় অনুরণন আর কী হতে পারে ?

নিরপরাধ সীতাকে যখন গহন অরণ্যে একাকী ফেলে রেখে লক্ষণকে ফিরে যেতে হচ্ছে, তখন তাঁদের দু'জনের মনের অবস্থাটা একবার চিন্তা করে দেখুন। কী আগুনের মধ্য দিয়ে লক্ষণকে তখন পেরিয়ে আসতে হচ্ছে ! ক্ষীণ অগুরুর গন্ধের মতন একটা বেদনাবোধ তখন আচ্ছন্ন রাখে পাঠককে। নারীর

সবচেয়ে বড় অহঙ্কার—সে মা হবার যোগ্যতা রাখে। আবার নারীর সবচেয়ে বড় অসহায়তা—সে যখন মা হতে চলেছে, তাবৎ প্রকৃতি ও পুরুষ যেন তাকে সুরক্ষা দেয়।

আর গর্ভবতী সীতা সেই সময়ে পেলেন সবচেয়ে বড় আঘাত তাঁর পুরুষের কাছ থেকে। এবং লক্ষণের বেদনাও তখন মর্মান্তিক, যেহেতু ন্যায়-অন্যায়ের ভেদরেখা জানা থাকা সত্ত্বেও তিনি সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে মুখর হয়ে উঠতে পারছেন না।

আমার কয়েকজন বামপন্থী বন্ধু বললেন, 'সীতার শাস্তিপ্রাপ্তি ছিল অনিবার্য, কারণ বুর্জোয়ামানস নারীদের ওপর নির্যাতনের পক্ষপাতী।'

অশোক রুদ্রও ১৩৬৭-এ 'পরিচয়' পত্রিকায় লিখেছিলেন, 'মানুষ শুধুমাত্র একটি psychological being নয়, সে একটা সামাজিক জীবও বটে। জীবনের সমস্যার সব মূলই তার নিজের মনে... এ তত্ত্ব বুর্জোয়া মানসের পলায়নপরতার অন্যতম প্রধান ভিত্তি হয়ে এসেছে।'

এই ব্যাখ্যাকে আমার মনে হয়েছে সরলীকরণের নিদর্শন। অন্তর ও বাহির—এই দুটিকে অন্যোন্যনিরপেক্ষ দুটি পৃথক বস্তু হিসেবে মেনে নেওয়ার মধ্যে যে ভ্রান্তি রয়েছে—তাকে মতুয়ারি বুদ্ধির অভিপ্রকাশ বলা চলে। বাহির ও অন্তর নিয়েই একটা মানুষ। বাহিরের ঘটনা ও অন্তরের প্রতিক্রিয়া উভয়ই সম গুরুত্বের এবং প্রথমাবধি সার্থক সাহিত্যে উভয়ের সমগুরুত্ব। যেখানে বাহিরের ঘটনার প্রবল বিক্রম, সেখানেও পাঠককে তাঁর অনুভবে নিয়ে আসতে হবে সংশ্লিষ্ট ঘটনার সঙ্গে যুক্ত কুশীলবের মানসিক প্রতিক্রিয়াকে। আমার রচিত একাধিক গল্পে আমি কেবলমাত্র ঘটনাকেই চিত্রিত করেছি; কিন্তু সুধী বিশ্লেষকরা লিখলেন, 'ওই নির্মোহ রচনার ফলে পাত্র-পাত্রীর মানসিক অভিঘাত তীব্রভাবে অনুভূত হয়েছে।' লক্ষণ বা সীতার বিলাপ দীর্ঘ না হওয়ায় আমরা আরও নিবিড়ভাবে তাঁদের বেদনাকে স্পর্শ করতে পেরেছি।

তবে সীতা ও হেলেনের তুলনায় দ্রৌপদী অনেক বেশি সোচ্চার। আবার তাঁর চরিত্রে রহস্যময়তাও অনেক বেশি থাকায় আমরা দ্রৌপদীকে নিয়ে খুব বেশি মাথাও ঘামাই। যেন একটা কঠিন অঙ্ক মেলাবার চেষ্টা করি। সীতা ও হেলেনকে যেমন চটপট ছকে ফেলে চিত্রিত করা সম্ভব, দ্রৌপদীর বেলায় কর্মটি সেরকম তরল নয়। দ্রৌপদীকে প্রকাশ করতে গেলে প্রতীক গড়ে তুলতে হয় এবং তা হবে subtle and suggestive use of highly

metaphorical language-এ। এখানে যে অনুভব, তার মধ্যে দিব্যি মানানসই হয়ে উঠতে পারে হালের আধুনিকতা। জেম্‌স জায়েসের মতন লেখক দ্রৌপদীকে নিয়ে উপন্যাস লিখতে পারতেন তাঁর নিজস্ব ন্যাচারালিজমকে অক্ষুণ্ণ রেখে। লেখক বা শিল্পী দক্ষতায় অসামান্য না হলে দ্রৌপদীকে কেন্দ্রবিন্দু করে কাহিনির বিস্তারে অসমর্থ হবেন। এর ভষারীতিও হবে স্বতন্ত্র।

দ্রৌপদীর জন্ম অলৌকিক। বস্তুত তাঁর বাবাও নেই, মাও নেই। আবির্ভাবের মুহূর্ত থেকে তিনি ভরন্ত যুবতী। অন্তরে রয়েছে নিষ্কাশিত জীবনানুভব। কুন্তি যেমন একজনের পর একজন দেবতার সঙ্গে সঙ্গম করে তাঁর এক-একটি পুত্রকে জন্ম দিয়েছেন, দ্রৌপদীর জন্ম কিন্তু সেই উপায়ে হয়নি। তিনি সরাসরি বেরিয়ে এসেছেন প্রজ্জ্বলিত অগ্নি থেকে। সুতরাং অগ্নি দ্রৌপদীর যুগপৎ পিতা ও মাতা। দ্রৌপদীকে নির্মাণ করতে কী কী দরকার হয়েছিল ভিয়েনে, তার হদিশ পঞ্চপাণ্ডবের একজনও রাখতেন বলে মনে হয় না। একমাত্র যিনি দ্রৌপদীর আভ্যন্তরীণ বিষয়ও নিজের মধ্যে নিয়ে আসতে সমর্থ হতেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণ।

দ্রৌপদীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্ক কীরূপ ছিল?

নির্ণয়ে অধিক নিরীক্ষার প্রয়োজন নেই। তাঁরা ছিলেন একে অপরের বন্ধু ও বান্ধবী। আজকের দিনে অবিবাহিতা অথবা বিবাহিতা যে কোনও তরুণীর যেমন পুরুষ বন্ধু থাকতে পারে, মহাভারতীয় যুগের সামাজিক কাঠামোতে তা ছিল খুব স্বাভাবিক। বুদ্ধিমতী দ্রৌপদী বিস্তর হিসেব করেই কৃষ্ণ হেন বান্ধব জোগাড় করে নিয়েছিলেন। সেই নির্বাচন কতটা সনাতন, কতটা আধুনিক—তা নিয়ে অধিক মাথা ঘামানোর অবকাশ এখানে কম। নারী ও পুরুষের বহুকৌণিক জটিলতা ও অন্তর্জীবনের জোয়ার-ভাটা থাকতেও পারে, নাও পারে।

আসল ঘটনা এই যে দ্রৌপদী কৃষ্ণকেই বেশি বিশ্বাস করতেন তথা কৃষ্ণের ওপরই তাঁর নির্ভরতা ছিল সর্বাধিক। দ্রৌপদীর জীবনপর্যটন কুত্রাপি নিরাসক্তিতে আক্রান্ত হয় নি। আর রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ শুধুমাত্র পাঞ্চালীকেই 'সখী' ডাকে আপ্লুত করেন। এইগুলি কথামালা। এদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে এক-একজন এক-একদিকে ধাবিত হতেই পারে। Dehumanized চরিত্র চিত্রণও যদি হয়, আসাড় বলে উড়িয়ে দেব না। কেউ যদি বলেন 'নারী ও নদীর জল, বিচারের প্রেক্ষিতে সবসময় এদের বাঁধাধরা ঘাট নাও থাকতে পারে; আমি বলব, 'যথার্থ, যথার্থ।'

দ্রৌপদী শ্রীময়ী। তিনি যাঁদের সঙ্গে থাকবেন, তাঁদের শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে। কবির কলমে কী ঘনঘটা দ্রৌপদীর রূপবর্ণনায়। সোনার মতন গোধূলিতে গিয়ে দাঁড়ালে ওই মূর্তি যে কোনও পুরুষকে আদ্যন্ত রোমান্টিক করে তোলায় সমর্থ। দক্ষিণী এই কন্যার গায়ের রং কালো, কিন্তু তনুর গঠন প্রথম দর্শনেই একজন পুরুষের হৃদয়ে যে আলোড়ন তোলে, সেই প্রলোভন কিন্তু কুত্রাপি ক্ষণস্থায়ী হয় না। বিশ্ববীক্ষায় সমৃদ্ধ যুধিষ্ঠির পর্যন্ত কবুল করেছেন, 'দ্রৌপদীর রূপকে আমি যদি বর্ণনা করতে বসি, সকল উপমা শেষ হয়ে যাবে। সে কখনও প্রসন্না দেবী, কখনও নীরবে উদ্যত হৃদয়কে দীর্ণ করতে। অসামান্যের দ্যোতনা।' দ্রৌপদী যখন খুন্‌সুটি করেন, সংশ্লিষ্ট পুরুষের জীবনে সেটা এক অনবদ্য অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে। এহেন দ্রৌপদী যে অন্য অনেক নারীর চোখে কুটো হয়ে থাকবেন, সেটা তো স্বাভাবিক।

যাঁরা সেলুলয়েডে জীবন, ঘটনা ও প্রতিকৃতি নির্মাণে অভিজ্ঞ বা অভিলাষী, দ্রৌপদী তাঁদের কাছে আদর্শ উপাদান। গরুদা পুরাণে দ্রৌপদীচর্চা গুরুত্ব পেয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, দ্রৌপদী হলেন ভারতীদেবীর অন্য রূপ। পূর্ববর্তী জীবনে তিনি বায়ু দেবতার প্রেয়সী ছিলেন। নারদপুরাণ আবার নিয়ে এসেছে ভিন্ন পরিচিতি। সেখানে বলা হয়েছে, দ্রৌপদীর নির্মাণ পাঁচজন অনন্যা নারীর সংমিশ্রণে। এঁরা হলেন ধর্মের ঘরণী শ্যামলা, বায়ুর সোহাগিনী ভারতী, ইন্দ্রের স্ত্রী শচী, অশ্বিনীর সহধর্মিনী ঊষা এবং শিবের স্ত্রী পার্বতী। দ্রৌপদীরূপে আবির্ভূতা হবার পর্বে এই মর্ত্যে তাঁকে আরও কয়েকবার জন্মগ্রহণ করতে হয়েছে। ইন্দ্রশাসিত স্বর্গ ও দেব-দেবী শাসিত পৃথিবীর কল্যাণেই তাঁর বারংবার আবির্ভাব। তাঁর প্রথম ধরাধামে আগমন অগ্নী দেবতার জীবনসঙ্গিনী সহারূপে। সেই ভূমিকা পালনের পর তাঁর রূপান্তর ঘটে পরমা সুন্দরী বেদবতীতে। এই সেই বেদবতী—যাঁর রূপে আকৃষ্ট হয়ে লঙ্কেশ্বর রাবণ প্রায় উন্মাদ হয়ে যান। রাবণ কর্তৃক লাঞ্ছিত হয়ে বেদবতী রাবণকে অভিশাপ দেন এবং সেই অভিশাপকে ফলবতী করতেই পরবর্তী জীবনে তিনি আবির্ভূতা হন সীতা রূপে। এই রচনার প্রথম পর্বে আমি এর উল্লেখ করেছি। এইভাবে দ্রৌপদীকে চর্চার মধ্য দিয়েই আমরা প্রমাণ পেলাম যে রামায়ণ ও মহাভারত—এই দুই মহাকাব্যের মধ্যে রয়েছে সেতুবন্ধন। অনুরূপ বন্ধন কী ভারতীয় দুই মহাকাব্যের সঙ্গে দুই গ্রীক মহাকাব্যেরও রয়ে গেছে? নচেৎ কাহিনীর এইরূপ সাদৃশ্য যে অতীব আশ্চর্যজনক ঘটনা। পরে সেই সন্ধানেও মগ্ন হবার ইচ্ছে থাকল।

যাই হোক, দ্রৌপদীই তাঁর এক পূর্বজন্মে সীতা হয়ে এসেছিলেন ও রাবণ ধ্বংসের মুখ্য হেতু হয়ে থাকলেন।

মঞ্চ থেকে সীতার প্রস্থানের পর এলেন দময়ন্তী। দ্রৌপদীর আর একটি পূর্বজন্ম। সেখানে তিনি নল রাজার স্ত্রী। নল রাজার মধ্যে কয়েকজন দেবতার শক্তি ও উদ্দীপনা সংহত ছিল। তিনি ধর্ম, বায়ু এবং ইন্দ্রের গুণাবলীর মূর্ত আধার। পঞ্চপাণ্ডবের পাঁচরকম গুন ও শক্তি দ্রৌপদী যেমন উপভোগ করেছেন, রাজার নলের কাছ থেকেও দময়ন্তীরূপে লাভ করেছিলেন একই স্বাদ। দময়ন্তী তাঁর কন্যা নলয়নীর মধ্যে নিজের এই দাবিগুলিকে প্রবিষ্ট করান। ওইগুলির সন্ধান করতে করতে নলয়নী শেষাবধি বিবাহ করেন মুনি প্রবর মৌদ্গল্লকে। নারীজীবনের এতগুলি স্তর পার করবার পর পঞ্চম জন্মে তিনি হয়ে এলেন দ্রৌপদী। স্ত্রীশক্তির প্রবল বিচ্ছুরণ। তাঁর মধ্যে তখন বহু দেবীর বৈশিষ্ট্য ক্রীয়াশীল। এই দেবীরা হলেন কালী, পার্বতী, শচী, শ্যামঅমলা, ভারতী, ঊষা, শ্রী এবং সহা। আটজন দেবীর গুণাগুন নিয়ে দ্রৌপদী। তিনি হেলেনের মতন স্খলিত মদালসা ভঙ্গিমায় পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা না করেও সর্বাধিক আকর্ষণীয়া। আবার সীতার ন্যায় নির্জীব ও স্বামীপ্রেমে একেবারে থিতিয়ে থাকেন নি সমস্ত রকমের অবিচার মুখ বুজে সহ্য করে। তাঁর মধ্যে ব্যাবিলনের দেবী ইশ্‌তার বা নিন-লিলের ন্যায় দ্বৈতসত্তা নতুন মাত্রায় উদ্‌ভাসিত। অবশ্য ইশ্‌তার যেমন প্রায় প্রকাশ্যে নিজের দুরন্ত যৌনবাসনার কথা জানাতেন, দ্রৌপদী তা কদাচ সরাসরি প্রকাশ করেন নি। সেই প্রকাশের পথে অন্তরায় ছিল ভারতীয় রমণীর কোমলত্ব। একটি সুক্তে ইশ্‌তার যে রূপ বর্ণনা আমরা পাই, তার সঙ্গে দ্রৌপদীর যৌবনঘন রূপের সাদৃশ্য অনস্বীকার্য। 'তাঁর দুই চক্ষুতে এমন মদিবতা যে তা যুগপৎ কাম ও সৌন্দর্যকে পরিবর্ধিত করে।' অন্য একটি সুক্তে আরও লক্ষণীয় উত্তরণ, 'এই যে নারী—যিনি দেবীও—যিনি একাধারে জননী, অন্যদিকে লাস্যময়ী। প্রলুব্ধ দেবতারাও ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না, কী ভাবে তাঁর সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসা যায়। এঁর মন বড় গভীর। বাইরের মনও গভীর, ভেতরের মন তো অতলান্ত।'

ইশতার উপমাকে টেনে আনবার কারণ, দ্রৌপদী যতটা মোহময়ী, ততটাই ব্যক্তিত্বসম্পন্না। সেই অনন্যা নারীর বৈশিষ্ট্যগুলিকে পরতে পরতে মেলে ধরবার চেষ্টা করেছেন শ্রীমতী কমলা সুব্রমনিয়ম তাঁর 'মহাভারত' গ্রন্থে, 'Draupadi was a multifaceted personality ; she could

be fiery and angry when the situation called for it, but she still had a compassionate nature. She knew all the servants in the palace by name and they affectionately called her 'Bahurani'. She encouraged people to face life with the same inner strength that she did

For example, after Abhimanyu's death, she consoled his grieving widow Uttara, by reminding her of the cause for which Abhimanyu gave his life. She encouraged Uttara to gather her strength for the sake of her and Abhimanyu's child, whom she was carrying at the time.

After the war Draupadi looked after Gandhari with respect and affection even though Gandhari's sons had wronged her in so many ways.'

প্রত্যেক পরিণত বয়স্ক মানুষ যখন শেষ বারের মতন এই পৃথিবী থেকে পা তুলে নিচ্ছেন, তখন দেখা যাবে তাঁর জীবনে রয়েছে চারটি পর্ব—উন্মেষ পর্ব, অন্বেষণ পর্ব, উত্তরণ পর্ব এবং পরিণতি পর্ব।

অবশ্য যারা উন্মাদ কিংবা রুচিবিগর্হিত উৎকট আলস্যে ও অকর্মন্যে জড়িত, তাঁদের জীবনে এই ধরনের পর্বগুলি আসে না।

এইগুলি আবার সবই সংসারবন্ধনে আবদ্ধ জীবদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যিনি কম বয়সে অথবা যৌবনেই ঈশ্বর সন্ধানে সংরার ত্যাগ করেন, তাঁদের জীবনপর্ব ও জীবনদর্শন ভিন্ন।

পাণ্ডবদের প্রত্যেকে সংসারবদ্ধ। নিজেদের অধিকার, আদর্শ এবং স্বাধীন স্বরক্ষেপণের পরিসর তৈরি করতে করতেই তাঁরা উক্ত চারটি পর্ব পেরিয়ে এলেন।

স্বামীদের সঙ্গে সঙ্গে দ্রৌপদীও শেষ পর্বে এসে দাঁড়ালেন। সামনে-পিছনে কোথাও আর পঙ্গু অন্ধকার নেই। মাপমতন সবই ঠিকঠাক। উত্তরাধিকারীরা দায়িত্ব গ্রহণে প্রস্তুত। তাঁদেরও প্রত্যেকের নিজস্ব সত্তা গঠিত। বহু আমূলভেদী দুঃখ যন্ত্রণা ঘটনাগুলিকে পিছনে ফেলে রেখে দ্রৌপদী এখন তাঁর পঞ্চস্বামীর অনুগামিনী।

কোথায় যাবেন তাঁর পঞ্চস্বামী ?

তাঁরা যাবেন মহাপ্রস্থানের পথে। মর জগতে জীবনের কাঁসরঘণ্টা অনেক বাজান হয়েছে। এবার স্বচেষ্টায় স্বর্গধামে শেষ অবধি পৌঁছন যায় কিনা, দেখা

যাক। এই মহাযাত্রায় নিঃসম্পর্কের মতন কেউ থাকবেন না। একে অপরের সঙ্গে নিগূঢ়বন্ধনে অবদ্ধ থাকবার চেষ্টা করা হবে। তথাপি কেউ যদি পথিমধ্যে শেষ হয়ে যান, তাঁর হেতুও নির্ধারিত হবে যুক্তির আলোকে।

মহাপ্রস্থানের পথে প্রথম বিচ্ছিন্ন হলেন কিন্তু দ্রৌপদী। দ্রৌপদী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছেন দেখে সবচেয়ে বেশি বিচলিত হলেন ভীম। অন্যরাও নাড়া খেলেন। কেবল স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থায় রয়েছেন যুধিষ্ঠির। তিনিই তো সেই ব্যক্তি—যিনি সত্যের আলোকবর্তিকা দেখতে পেরেছেন। এ যেন সেই উপলব্ধি 'The raging Ocean that covered everything was engulfed in the total darkness and then God commanded 'Let there be light, and the light appeared.'

ব্যাকুল চিত্তে ভীম যুধিষ্ঠিরের মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, 'দ্রৌপদী কেন শেষ অবধি আমাদের সঙ্গে যেতে পারল না? আমি জানি, ও জীবনে কোনও পাপকর্ম করেনি।'

যুধিষ্ঠির গম্ভীর গলায় উত্তর দিলেন, 'পাপ সর্বদা যে কর্মের মধ্য দিয়েই সম্পন্ন হয়, তা নয়। পাপ লালিত হয় ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গীর জালেও।

দ্রৌপদী প্রত্যক্ষভাবে পাপকর্মে লিপ্ত হয় নাই। কিন্তু ওর মনে পাপের মেঘ সঞ্চারিত। সে আমাদের পাঁচ জনকেই স্বামীরূপে বরণ করেছে। কিন্তু নিজের প্রেম ও সোহাগকে পাঁচটি সমানভাবে ভাগ করেনি। অর্জুনের প্রতিই সে বেশি আকৃষ্ট ছিল। অর্জুন তার কাছ থেকে যে পরিমাণ সোহাগ পেয়েছে, আমরা বাকি চার ভাই তা পাইনি।'

বিচিত্র সাদৃশ্য : মাতৃআরাধনার আদিরূপ

চারটি মহাকাব্যের মধ্যে সাদৃশ্যের ঝলকানি অনস্বীকার্য হলেও এর হেতু নির্ধারণে তেমনতর যুক্তি অদ্যপি দানা বাঁধেনি। তাত্ত্বিকরা বলেন, মানুষের জীবনে গল্পের সংখ্যা সীমিত। একথা অবিস্মরণীয় গল্পলেখক মপাজাও বলে গেছেন। ফলে কাহিনি বিস্তারিত হতে হতে এমন একটি জায়গায় গিয়ে উপস্থিত হতেই পারে, যেখানকার শাখা-প্রশাখা অন্য এক বা একাধিক রচনার আখ্যানভাগের সঙ্গে বিলক্ষণ সাদৃশ্য লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। তাহলে একজন লেখকের সঙ্গে অন্য একজন লেখকের পার্থক্য নির্ণিত হতে পারে কী ভাবে ? এরও একটা উত্তর আছে। সেটা হল এই যে, একজন লেখকের সঙ্গে অন্য একজন লেখকের প্রভেদ নির্ণিত হতে পারে দুইটি বিষয়ের বিচারে। প্রথমত, সেই দুই লেখকের জীবন দর্শন ; দ্বিতীয়ত, উক্ত দুই চিয়িতার রচনাশৈলীর তারতম্য। জীবনদর্শনের অন্বেষণ পদ্ধতি আবার একই ধরণের হয় না। এক-একজন এক-একটি দিক ধরে অগ্রসর হয়ে থাকেন। যেমন প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক সি. ডে. লুইস বলতেন, একজন লেখক বা কবির সত্তাকে আমি খুঁজে পাই, যখন তিনি তাঁর রচনায় কোনও মৃত্যুপ্রসঙ্গে অনুপ্রবেশ করেন। 'New objects, new ideas, new doles of behaviour breed new images which in their turn necessiate new style... But it is none the less true that like webster, we are much possessed by death ; and it is also true, and important, that our poets see death not in his personal, religious ways, as a hideous storm of terror but in generalised psychological turns, as the death will, the worm is the rose of modern civilisation ; and this obsession with the death will make certain kinds of image predominate in their verse, just as the pervasive fear of war in the last decade filled in with metaphors of spies, frontiers, exiles, bloodsheeds.'

মৃত্যুর ধারাবাহিক উপস্থিতি চারটি মহাকাব্যেই। ইন্দ্রজিতের মৃত্যু, ভীষ্ম ও অভিমন্যুর মৃত্যু, হেক্টরের মৃত্যু—এইগুলিতেই মহাকবিদের জীবনদর্শন পরিস্ফুট। কাহিনির সাদৃশ্য তেমন কোনও বিবেচ্য বিষয় রূপে প্রতিভাত হয় না।

আমি বরং সাদৃশ্য খুঁজি ভিন্ন ভিন্ন যুগে চরিত ওই মহাকাব্যিয় আবহে দেবী আরাধনার প্রাধান্য এই প্রেক্ষিতে ভারতের সঙ্গে গ্রীস ও মিশরের, গ্রীস ও মিশরের সঙ্গে রোমের, রোমের সঙ্গে ব্যাবিলনের গভীর যোগসূত্র কতটা অস্পষ্ট বা কতটা স্পষ্ট। আর্যরা যে আদিতে একটি ভূখণ্ডেই বসবাস করত, এই মিল ও কাব্যিক সাধনা সেটাই প্রমাণ করে। এই সাদৃশ্য ভাষাতেও। সংস্কৃতের সঙ্গে গ্রীক ও ল্যাটিনের যে মিল, বিদগ্ধ ভাষাবিদগণ কবেই তা প্রমাণ করে গেছেন। আমার আর এখানে কী বলার আছে? প্রচণ্ড কৌতূহল হয়, আর্যপ্রাধান্য শুরু হবার আগে যে সুসভ্য জনগোষ্ঠী এই পৃথিবীর বিভিন্ন নদীপ্রান্তে যে সভ্যতাগুলির জন্ম দিয়েছিলেন, তাঁদের মাতৃআরাধনার স্বরূপ কী ছিল? তখনও ভারতের মানসতরঙ্গের সঙ্গে মিশর ও ব্যাবিলনের মানসভ্যতার সাদৃশ্য স্পষ্টতরভাবে অনুভব করা যায়।

আর্যযুগকে আমরা ধরতে পারি ঋগ্বেদের মধ্য দিয়ে। তখন মাতৃতন্ত্র। স্বমহিমায় বিকশিত দেবী অদিতি। কিন্তু তিনি শুধু মাতা নন, তিনি পিতাও, পুত্রও। ঋগ্বেদের ১ মণ্ডলের ৮৯ সুক্তের ১০ শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ

আদিতির্দ্যোরদিতিরন্তরিক্ষমদিতি মার্তা স পিতা সপুত্রঃ।
বিশ্বে দেবা অদিতি ঃ পঞ্চজনা অদিতি র্জাতমদিতি র্জনিত্বম্।

'দেবী অদিতিই আকাশ মেঘ অন্তরীক্ষ ; তিনিই একাধারে মাতা ও পিতা, তৎসহ তিনিই পুত্র ও কন্যা ; তিনিই সব দেবতার সার ; তাঁর মধ্যেই মূর্ত পঞ্চলোক, জন্ম-মৃত্যু।

দেবী অদিতি রহস্যময়ী। নারীর যে মরমিয়া রহস্য মানব ইতিহাসের জাদু-ছক্কা, তা তাঁর মধ্য থেকেই প্রথম সূচিত হয়। নারীচরিত্রের ব্যাখ্যায় তাই অদিতি চলে আসেন।

সুদূর ওয়েস্ট ইন্ডিসে এমন একজন আদি দেবীর সন্ধান আমরা পাচ্ছি, যাঁর সঙ্গে দেবী অদিতির সাদৃশ্য লক্ষণীয়। তিনি উয়ারা-হি-লু। ক্যারিরিয়ান পুরাণে লেখা আছে ঃ সৃষ্টির প্রথম পর্বে মইসো নাম্নী এক শক্তিময়ী রমণী ছিলেন। তখনও পৃথিবী তার আকার লাভ করেনি। জল নেই. আলো নেই। চতুর্দিকে নিকষ অন্ধকার। মইসো তখন দেখালেন, স্ত্রীশক্তি কী করতে পারে। তিনি একটি প্রস্তরখণ্ড নিজ উদরে স্থাপন করলেন। সেই উদর থেকে নির্গত হয় কাদাগোলা জল। ক্রমে জল স্বচ্ছ স্ফটিকবৎ হয়ে আসে। প্রবহমান জল স্থানে স্থানে সঞ্চিত হতে থাকে। জল থাকবার জন্যই মৃত্তিকার সৃষ্টি। এই ভাবেই পৃথিবীর উৎপত্তি।

মইসো অতঃপর জীব সৃষ্টির কাজে মগ্ন হলেন। তিনি যে সমস্ত মানুষ প্রথমে নির্মাণ করেন, তাদের দেহ প্রস্তরের ন্যায়। সেই পাথুরে মানুষদের মধ্যে যিনি প্রথম, তাঁর নাম দরুকবইতেরে। এই দরুকবইতেরেই সাক্ষাৎ দেবী উয়ারা-হি-উ-লুকে বিয়ে করেন। তাঁরাই হয়ে ওঠেন বিশ্বজগৎ ও প্রাণী জগতের স্রষ্টা। সেই সৃষ্টিকে লালন-পালন করা, অনাসৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা করা এ সমস্ত দায়-দায়িত্বই নিজের কাঁধে তুলে নিলেন দেবী উয়ারা-হি-উ-লু।

দেবীদের সন্ধানে বের হলে দেবী ইলাকে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি দিতেই হবে। ইলাও ঋগ্বেদের যুগে নারীশক্তির অন্যতমা প্রতিভূ হয়ে উঠেছিলেন। সেমিটিক ভাষায় 'ইল' শব্দের অর্থ হল যিনি দেবত্ব অর্জন করেছেন। বেদে বলা হয়েছে, মনু যে ভূমিতে নিজ কর্ম সম্পন্ন করছিলেন, সেই ভূমির মালিকানা ছিল দেবী ইলার—যে কারণে উক্ত ভূভাগকে বলা হত ইলাবর্ত। তাই ভারতবর্ষের প্রাচীনতম নাম ইলাবর্তবর্ষ। দেবী ইলা শিক্ষিকা। তাঁর শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে প্রাচীন ভারতবর্ষে বহু প্রজ্ঞাবান ঋষি মানবসেবায় নিজেদের ব্রতী করেন।

এ কথা অনেকাংশেই প্রমাণিত যে ভারতের অসাধারণ ঋষিদের কেউ কেউ এ দেশ থেকে ভিন দেশে পাড়ি জমান। তাঁদের বিদ্যার আলোকে আলোকিত হয়ে ওঠে সেই সমস্ত ভূখণ্ডের অধিবাসীরাও। এ রকম এক দেশ মেসোপটেমিয়া। মেসোপটেমিয়ার একটি ভূখণ্ডের আগে নাম ছিল সুমা। পরে তা পরিবর্তিত হয়ে এলম নামে পরিচিতি অর্জন করে। এলম শব্দটি এসেছে ইলম থেকে। আর্য সভ্যতার আদি ও মধ্যপর্বে ভারতবর্ষের সঙ্গে এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের কয়েকটি দেশের সাংস্কৃতিক যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল। গ্রীক, লাতিন, মিশরীয় ভাষাতেও আমরা বেদের বিভিন্ন শব্দকে দেখতে পাই। এ কারণেই লাতিন থেকে যার উৎপত্তি, সেই ইংরেজিতে রয়েছে 'এলেজি' (Elegy) শব্দ—যা 'ইল্' থেকে এসেছে।

ইত্যাকার দেবী-চর্চার মধ্য দিয়ে আমরা এরকম একটা সিদ্ধান্তে আসবার কথা ভাবতে পারি, যেখানে রামায়ণ মহাভারতের ন্যায় অত্যন্ত সজীব সংস্কৃত সাহিত্য গ্রীসেও প্রভাব বিস্তার করে, ফলে গ্রীক ভাষায় রচিত হতে পারল ইলিয়াড ও ওসিডি—যাদের কাহিনি ও চরিত্রায়নের সঙ্গে রামায়ণ ও মহাভারতের বহু মিল, যদিও প্রথমেই আমি বলেছি—মানব জীবনে নিছক কাহিনির সংখ্যা অপ্রতুল এবং একটির সঙ্গে অপরটির সাদৃশ্য স্বাভাবিক ঘটনা। প্রাচীন গ্রীসও ছিল ভারতের মতন মাতৃসাধনার দেশ। অথবা, ভারতের মাতৃপূজার বিভিন্ন ধরণ একরকম যেন পাচার করা হয়েছিল গ্রীসে।

যেমন ভারতে আমরা মা ষষ্ঠীর পূজো করি সন্তান লাভের আশায়। গ্রীসেও পরে দেখা গেল অনুরূপ এক দেবীর আবির্ভাব। তাঁর নাম ঈলিওনালা। এই দেবীকে তুষ্ট করতে পারলে ঘরের নারী গর্ভবতী হন ও নির্বিঘ্নে সন্তান প্রসব করেন। তবে মা ষষ্ঠীর তুলনায় ঈলিওনালা অনেক বেশি মেজাজী। পান থেকে চুন খসলেই রেগে টং।

এক দেবীর মধ্যে অন্য অনেক দেবীর লীন হয়ে যাবার দৃষ্টান্ত আমরা যুগপৎ ভারতবর্ষ ও ব্যাবিলনের মধ্যে দেখতে পাই। যেমন ধরুন, আমাদের মা দুর্গা। দুর্গার সঙ্গে মিশে গিয়েছেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের বেশ কয়েকজন পূজিতা দেবী। উদাহরণ—কাত্যাজাতির দেবী দুর্গাতে নীল হয়ে যাওয়ায় দুর্গার আর একটি নাম হল কাত্যায়নী। কুশিক জনগোষ্ঠীর মাতৃদেবী মিশে গেলেন দুর্গায়। তখন দুর্গার আর একটি নাম হয়ে গেল কৌশিকি।

ব্যাবিলনে দুর্গার সমকক্ষ দেবী রূপে মান্যতা পেতেন ইশতা। ইশতা দফায় দফায় নানা পরিবর্তন ও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন। একসময় তাঁর পরিচিতি ছিল ইনান্না নামে। ব্যাবিলনের শ্রেষ্ঠ রাজা হাম্মুরাবি দেবী ইনান্নার পূজারি ছিলেন। পরে আসিরিয়াদের প্রাধান্যের কালে ইনান্না লীন হয়ে যান ইশতায়। মাতৃপূজার বিভিন্ন সূত্র ধরে অগ্রসর হওয়াটা সহজ নয়। শুধুমাত্র নাম নিয়েই কত হিমশিম খেতে হয়। অরবেলা নামক স্থানে উপুড় হওয়া নীল আকাশের তলায় ইশতায়ের একটি দুর্দান্ত মন্দির নির্মিত হয়েছিল। সেখানে দাঁড়িয়ে মধুর ছন্দে যে প্রার্থনা করা হত, তা এই প্রকারের ঃ

তুমি মা, আমাদের আতঙ্ক দূর করবে।
অপহৃতা নারীর মর্যাদা তোমারই হাতে।
ফসলের সুরক্ষা তোমাতেই ন্যস্ত।
তোমার কোপে অপরাধী ধ্বস্ত।
বিজ্ঞজন তোমার সন্তান
একত্রিত হলে যুক্তি-মুক্তি প্রমাণ।

থমকে যেতে হয় 'আপহৃতা নারী' এই শব্দে এসে। অর্থাৎ সেই সমস্ত দিনে কী ভারতবর্ষ, কী গ্রীস, কী ব্যাবিলন, কী মিশর সুন্দরী নারীরা বলবানদের দ্বারা অপহৃতা হতেন। আবার দেবীর কৃপায় তাঁদের উদ্ধারও করা হত যুদ্ধ হানাদারি ইত্যাদির মধ্য দিয়ে। সুতরাং রামায়ণ, মহাভারত,

ইলিলাড ও ওডিসির কাহিনি বনয়ের কেন্দ্রে যে নারীঅপহরণের ঘটনা থাকবে, তা খুব স্বাভাবিক।

হেলেনের চরিত্রের সঙ্গে সীতার ও দ্রৌপদীর চরিত্রের অনেক প্রভেদ। এর কারণ, ভারতে যে ধরনের যৌনসংযমকে কঠিন থেকে কঠিনতর করবার প্রবণতা দেখতে পাই, গ্রীসে তার অভাব ছিল অনস্বীকার্য। গ্রীস অনেক বেশি সুমেরীয় চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত ছিল। ব্যাবিলনের দেবী ইশতা বলতেন, নারীর অধিকার আছে স্বৈরিণী হয়ে ওঠার। কিন্তু কোনও পুরুষের অধিকার নেই ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও রমণীকে অধিকার করবার। ইশতা নিজের সম্পর্কেই এই ধরনের উক্তি করেছেন, 'আমি যখন অবসরে পানপাত্র তুলে নেই, অনুরক্ত পুরুষরা আরও প্রলোভিত হয়ে ওঠে এবং আমার কাছে তা বিশেষ উপভোগ্য।... আমি প্রেমিকা তো অবশ্যই, নিজেকে বারবণিতা করে তুলতেও আপত্তি নেই।'

ইশতার পাথরে খোদিত প্রতিকৃতিতে তাঁর যোনির বিস্তার বিস্ময়কর এবং তিনি নিজের বস্ত্রকে উত্তোলন করত আপন যোনির প্রতি ইঙ্গিত করছেন।

ব্যাবিলনের বাসিন্দারা বিশ্বাস করত, দেবী ইশতাই নির্দেশ করে গেছেন, কাম কী উপায়ে জাগরিত হবে ও কী পন্থায় তার নিষ্পত্তি ঘটবে। মহিলাদের জন্যই পুরুষ। মহিলাদের বাসনা জাগ্রত হলে তবেই পুরুষদের জন্য মহিলা।

এই তত্ত্ব ও দর্শন জোরালো ছিল বলেই হোমার হেলেনকে ওইভাবে জীবন্ত করে তুলতে পেরেছিলেন।

রামায়ণ যে সময়ে রচিত হয়েছিল, তখন ভারতীয় সমাজে চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা খুব প্রবল হয়ে ওঠে। সংযম ছাড়া যে সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ সাধিত হতে পারে না, এই বিশ্বাসকে প্রোথিত করবার একটা চেষ্টা জোরদার হয়ে উঠেছিল। সেই সংযম, ত্যাগ ও বন্ধনের ভিত্তি অদ্যপি অনেকটা কার্যকরী। 'দয়া' ও 'দমন' দুটোই খুব জরুরি। এই শিক্ষা দেওয়া হত শিশু বয়স থেকেই।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'শুধু বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে নয়, সমাজের সঙ্গেও শিশুকে সত্য সম্বন্ধে যুক্ত হয়ে ওঠবার জন্য বিস্তর সাধনা করতে হয়—তাকে অনেক রকম আবদার থামাতে হয়, অনেক রাগ কমাতে হয়—নিজেকে অনেক রকম করে বাঁধতে হয় এবং অনেকের সাথে বাঁধতে হয়। যখন এই বন্ধনগলি মানা তার পক্ষে সহজ হয় তখন সমাজের মধ্যে বাস করা তার পক্ষে আনন্দের

হয়ে ওঠে—তখনই তার সামাজিক শক্তি সেই সকল বিচিত্র নিয়ম বন্ধনের সাহায্যেই বাধামুক্ত হয়ে স্থিতিলাভ করে।'

চারটি মহাকাব্যের তিন নায়িকা—সীতা, দ্রৌপদী ও হেলেনের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনার পথ ধরে আমরা অনেক দূর-দূরান্ত ভ্রমণ করেছি। গভীরেও দিয়েছি ডুব। তবুও মনে হয়, আরও কিছু হাতছানি রয়েছে লেখকের দিকে। যেমন চার মহাকাব্যের মধ্যে দৈবের প্রাধান্য কতটা। রামায়ণ-এ দৈবের চেয়ে ঘটনা ও তার প্রভাব নিয়েই অধিক আলোকপাত। রাবণের নারী দুর্বলতা সুবিদিত। পূর্বজন্মেও সীতা রাবণের দ্বারা লাঞ্ছিতা হয়েছিলেন। সুতরাং রাবণের পতনকে দৈব বলা যায় না। মহাভারতেও দুর্যোধন একেপর পর এক যে সমস্ত অন্যায় করে যাচ্ছিলেন, তাতে কুরুক্ষেত্র মহাসমরকে নিয়তির অবদান বলা যায় না। অন্ততঃ বাল্মীকি বা ব্যাসদেব কখনও নিয়তি নিয়তি রব তোলেন নি। নিয়তির খুব প্রাধান্য কিন্তু গ্রীক সাহিত্যে। ওডিসি রচনাপর্বে মহাকবি হোমার নিয়তির অনিবার্যতা সম্পর্কে যা বলেছিলেন, নীচে তার ইংরেজি অনুবাদ তুলে ধরছি ঃ

"Lo, he thinks that he shall never suffer evil in time to come, while the Gods give him happiness, and his limbs move lightly.

But when, again, the blessed Gods have wrought for him sorrow, even so he bears it, as he must with a steddfast heart, for the spirit of man upon the earth is even so as their day ; that comes upon them from the father of Gods and men."

তিন শীর্ষ নামের নায়িকার চারিত্রিক গঠনও একেবারে আলাদা। সংকট যখন ঘুনীভূত হয়েছে, ওই প্রভেদ আরও স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। তাঁদের মানসিকতা ও নীতিবোধেও বিস্তর ফারাক। দ্রৌপদী যে ভাবে তাঁর পাঁচ স্বামীকে সামলেছেন, সীতার নিকট তা অকল্পনরীয়। আবার হেলেন যেটা অবলীলায় করে বসতে পারেন, দ্রৌপদীর বিচারে তা অনেকসময়ই কলঙ্কজ দৃষ্টান্ত। সীতা যেমন মনমরা, দ্রৌপদী তা নন—তিনি প্রতিশোধস্পৃহায় সদা জ্বলন্ত। আর হেলেন তো মনপছন্দ প্রেমিকের খোঁজ মিললেই যেন হাতে চাঁদ পেয়ে যান। এই নিয়ে অধিক বিশ্লেষণ অনাবশ্যক। সৃষ্টির নিয়মই হল প্রভেদ

ও বৈষম্যকে অটুট রাখা, তা নিয়ে চিন্তাবিদরা যতই ভারাক্রান্ত অথবা নিস্তেজ হয়ে পড়ুন না কেন মানুষের দেহে রক্তের চরিত্র তো এক নয়। O, A, B এবং AB—এই চার রকম বিভাগ হয়েছে। মনস্তত্ব ও নৃতত্ত্বের খুব নামী গবেষক ক্রেস্টকিমার বলেছেন, 'পুরুষ ও মহিলাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে নিয়ে দীর্ঘদিন বিচার করবার পর আমি তাদের দুটো ভাগে ভাগ করতে পেরেছি। সেইগুলি হল এই রকমের ঃ

(ক) প্রথম ধরনের মানুষ হয়ে থাকে Cycloid temperament-এর। এরা বেশ সামাজিক, আনন্দময়, বন্ধুত্বপূর্ণ। কিন্তু বেশ আত্মসচেতন ও স্পর্শকাতর। সেখানে ঘা লাগলে সহজে তা মন থেকে মুছে ফেলতে পারেন না। এঁদের নেতৃত্ব দেবার বেশ গুন থাকে। থাকে জেদও—লক্ষপূরণের দিকে এগিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। দ্রৌপদীকে আমরা Cycloid প্রকৃতির ছকে ফেলতে পারি।

(খ) দ্বিতীয় ছাঁচের ব্যক্তিত্বরা Schizoid temperament-এর। এঁরা খুব স্বাধীনচেতা, অনেক সময় স্বেচ্ছাচারী ও সাহসী। কিন্তু বিরুদ্ধ পরিস্থিতিতে পড়লে তারাই কেমন অসামাজিক, গম্ভীর ও বিষণ্ণ। হেলেনকে আমরা এই দলে ফেলতে পারি।

রামচন্দ্র সীতাকে যেভাবে শাস্তি দিয়েছিলেন, তাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, ওই সময়ে ভারতীয় সমাজে পুরুষতন্ত্রের চাপে নারীরা যথেষ্ট বিপন্ন অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। তবে মেয়েরা বেশ কিছু স্বাধীনতা অবশ্যই ভোগ করতেন ; যেমন জীবন-সঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কন্যার অভিমতই সর্বাধিক প্রাধান্য পেত।

মহাভারত রচিত হয়েছিল রামায়ণ রচনার অনেক কাল পরে। তাই তখন আবার পরিস্থিতির অনেকটা বদল ঘটেছে। স্ত্রীস্বাধীনতার বীজমন্ত্রটি তখন বেশ পুষ্ট। কন্যার অমতে তাকে পাত্রস্থ করা যেত না। কুমারী অবস্থাতেই নারীর যৌনস্বাধীনতা ছিল স্বীকৃত ব্যাপার। কুন্তী, সত্যবতী, দ্রৌপদী এঁরা সকলেই এই স্বাধীনতার বাতাবরণে স্ব স্ব মহিমায় ভাস্বর।

পুরুষ নারীর মধ্যে মর্যাদার তারতম্য ছিল অনেক কম। বৃহদারণ্যাকে লেখা আছে যে প্রজাপতি ব্রহ্মা বলছেন যে সৃষ্টির মহিমা ও তাৎপর্যকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পুরুষ ও নারীকে সমান স্বাধীনতা দিতে হবে। এইজন্যই স্বয়ং প্রজাপতি নিজেকেই দ্বি-খণ্ডিত করে জায়া ও পতির সম্পর্ক সৃষ্টি করলেন।

এই দুই খণ্ডের যে কোনও একটিকে আঘাত করলে বা অপমানিত করলে অপর খণ্ডেরও কল্যাণ ব্যাহত হবে। ফলে সার্বিকভাবে সমাজও আহত হবে।

'স ইমমেবাত্মনং দ্বেধাপাতয়ং ততঃ পতিশ্চ পত্নীকা ভবতাম্।'

ঋগ্বেদেও রয়েছে এমত নির্দেশ ঃ

'উতধানে মো অস্তুতঃ পুমাইতিব্রবেপানঃ।
সবৈবদেয় ইৎসমঃ।'

স্বামী ও স্ত্রী উভয় মিলে একটি অখণ্ড বন্ধন রচনা করেছে। তাদের উভয়ের গুরুত্ব সমান। মর্যাদাকেও তাই দিতে হবে নিরঙ্কুশ সমতা।

এই সমতা দ্রৌপদী সোচ্চারে দাবী করতে পেরেছিলেন।

হেলেন তো প্রাপ্ত অধিকারকেও অতিক্রম করে যান।

কিন্তু সীতা সেই অর্ধাংশের মর্যাদা পাননি।

গ্রন্থ ঋণ

১. রাজশেখর বসু কর্তৃক ১৯৫৭ সনে রচিত মহাভারত।
২. ১৯৮৩ সনে ভারতীয় বিদ্যাভবন, মুম্বাই থেকে প্রকাশিত কমলা সুব্রামনিয়ামের "The Ramayana".
৩. Max Muller কর্তৃক রচিত ও ইংরেজিতে অনুদিত গ্রন্থ "Sacred Books of the East".
৪. Lady Augusta রচিত "Gods and Fighting Men".
৫. Samuel Buttler অনুদিত "ওডিসি'।
৬. E. V. Rien অনুদিত "The Iliad".
৭. সুখময় ভট্টাচার্য রচিত 'মহাভারতের সমাজ"।
৮. ডি. পি. ভোরা লিখিত "Evolution of Morals in the Epics [Ramayana and Mahabharata].
৯. Sister Maeve Hughes রচিত "Epic Women East and West".
১০. Encyclopaedia of Religion & Ethics, Vol. VII.
১১. Emili Durkheim রচিত "Elementary forms of Religious life".
১২. ডঃ ধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী সম্পাদিত "ভারতাত্মা মুনি ঋষিগণ"।

শেখর সেনগুপ্ত ঃ জন্ম ১৫ই এপ্রিল, ১৯৪৪ বরিশালের গৈলা গ্রামে। মেধাবী। ইতিহাস ও অর্থনীতিতে এম.এ. রয়েছে ব্যবহার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা। স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার প্রাক্তন ফ্যাকালটি। শিক্ষকতা ও অধ্যাপনার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। সামান্য কিছুদিন সিভিল সার্ভিসেও ছিলেন। ১৯৬৭ সনে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ায় যোগ দেন এবং ২০০২ সালে পদস্থ আধিকারিক হিসেবে অবসর নেন।

প্রথম শ্রেণির সমস্ত পত্র-পত্রিকায় লিখেছেন, লিখছেন। ইতিহাস তাঁর অন্যতম অনুরাগের বিষয়। তিনি লিখেছেন 'বিপ্লব দেশে দেশে', 'গ্রেট ডিক্টেটর', 'সেরা জীবনী সমগ্র', 'জানবাজার থেকে দক্ষিণেশ্বর' ও 'এই আমি মাতাহারি'।

তিন মহাকাব্যের তিন মহামানবী 'হেলেন সীতা দ্রৌপদী' এই মহাগ্রন্থটি তাঁর অতি সাম্প্রতিক গবেষণার ফসল। অতি সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ কলমের ছোঁয়ায় তিনি অসামান্য রূপ দিয়েছেন তিন নারীর।

অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন মডার্ন কলাম দীর্ঘ ত্রিশ বছর অপেক্ষা করেছে এই তিন নারীর ভিতর-বাহির-অন্তরের সুখ দুঃখ বেদনাকে তুলে ধরতে। শেখরবাবু উপযুক্ত সহায়তা দিয়েছেন—বাস্তবায়িত করেছেন!